কুমারী, না বিধবা ?

স্বভাব-সতী এবং সমাজ-কালিমা প্রণেতা
শ্রীপ্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।
হাওড়া, কাসুন্দে।

কলিকাতা।
১০ নং, শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট, পিপলস্ প্রেসে,
শ্রীদীননাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

"উন্নত পতাকা"।

মাম্‌লা মাহাত্ম।

বঙ্গদেশে ১২৯০ সাল ফুরাইল। জলময়ী ভাগিরথী, শস্যময়ী কমলাকে বক্ষে লইয়া ঘোরতর বেগে সাগরের পথে ছুটিতেছেন। ভাগিরথীর, নিচ-গা। দুর্নাম চিরকাল আছে, কমলা, সংসর্গ দোষে পতিতা। কিন্তু কমলার দোষ দিতেও পারা যায় না। দেবদেবীরা শ্রদ্ধা ভক্তির বশ। কিন্তু ভারতে তো চমৎকার শ্রদ্ধা।

তন্তুবায় পুত্র, ভগ্ন চালায় তাঁর সেই প্রপিতামহের আমলের জীর্ণ তাঁত খানি খাটাইয়া একাকি ঝুনুঝুনু করিতেছেন, তাই দেখিয়াই কি কমলা, কলীর অমরাবতী, মাঞ্চেষ্টরের, কাণ্ড কারখানা ভুলিবেন? না বিশ্বকর্ম্মার পূর্ব্ব খাতিরে তাঁর বংশধরগণের হাতুড়ির ঠুকঠাক্ শুনিতে আসিবেন। দপত্নী-তনয়গণের প্রতি একেইতো তাঁর বিষদৃষ্টি, তাতে আবার শারদার বাক্-সর্ব্বস্ব বর পুত্রগণের চেলারা পর্য্যন্ত অস্থি দগ্ধ করিতেছে, তাই বলি কমলার অপরাধ কি! তিনি তিষ্ঠিতে পারেন কই। ঐ দেখুন এক দল স্কুল-বালক ভাগিরথী তীরে, নবনগরীর বাঁধা ঘাটে বসিয়া, রাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক এবং সমাজনৈতিক প্রসঙ্গ লইয়া কাণ ঝালাপালা করিতেছে। হায়। যখন বাশের কোঁড়াগুলি দ্রুতবেগে উর্দ্ধে উঠিতে থাকে, তখন মনে হয় যে ইহারা চন্দ্র সূর্য্য ভেদ না করিয়া ফিরিবে না কিন্তু কিছু দিন পরেই পুপোষ্য বেষ্টিত গরীব কেরাণী বাবুর মত ডালপালার ভারে মাথা হেট করিয়া ধুলায় লুটাইতে থাকে।

এই বালক দলের মধ্যে জীবনধন বাবুই প্রধান, বয়ঃক্রম বিংশতি উত্তীর্ণ হয়েছে। ইংরাজির রসাস্বাদনে আশ মিটে না বলিয়াই এক [illegible] ক্লাশে তিন চারি বৎসর কাটাইয়াছেন। সেই জীবনধন, গঙ্গা বাঁধিতে সকলকে

পরাস্ত করিয়া প্রতিপন্ন করিলেন যে, বঙ্গ-সমাজ দ্রুতবেগে উন্নতির দিকে ছুটিয়াছে। লোক সকলের সঙ্গে মুখে সদালাপ করে—পিতা পুত্র পরস্পর স্বাধীন, কেহ কাহারও তোয়াক্কা রাখে না। স্ত্রীলোকেরাও আইন-কানুন শিখিতেছে। কেবল বীরভূম আদি রাঢ় অঞ্চলের অন্ধকার ঘুচিলেই সমগ্র বঙ্গদেশ ভূ-স্বর্গ হইবে।

ন্যায়ের ছাত্র রামশর্ম্মা বীরভূমবাসী লোক, তিনি বিদ্রূপ ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবুজি! উন্নতির পথে কি ডাইনী আছে? এ কথায় সকলেই হাসিল, রাম বলিলেন, যদি ডাইনীতেত দৃষ্টি দেয় নাই, তবে অম্বুরি তামাক্ অপেক্ষা চুরুটের গন্ধ ভাল লাগে কেন? সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হয় কেন? সে দিনের রামলীলা মেলার কাণ্ড দেখিয়া আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি, আমরা দিশাহারা হইয়া আলেয়ার আলোকে ভূত প্রেতের দেশের দিকে ছুটিয়াছি। তাই বলি যে, আমাদের পোষাক পরিবর্ত্তন করা উচিত।

রামশর্ম্মার এই রূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সে দিন রামলীলার মেলায়, জগুবস্থ, সুন্দরী গোয়ালিনীর, আঁচলের গাট কাটিয়া মদের দোকানে প্রবেশ করিল। সুন্দরী তারে দেখে নাই, কেবল টাকা দুইটা চোরে নিয়াছে বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। পোলিস প্রহরী একটী নির্দ্দোষী লোককে ধরিয়া আনিল। তার অপরাধ এই যে, তার কাপড়ে চারিটী টাকা বাঁধা আছে। কিন্তু এথানে দুটী টাকা চুরি! সুবোধ প্রহরী, দুইটী টাকা আপনার পাকড়িতে বাঁধিয়া বাকী দুইটী দেখাইল। সুন্দরী, টাকা দেখিয়াই চোর চিনিল, আবার চারি পাঁচ জন পরোপকারী লোক উপযাচক হইয়া সাক্ষ্য দিল, হাঁ এই বেটাই বটে, আমরাও চিনিয়াছি। পরদিন, ধর্ম্মাবতার ন্যায় বিচারে উহাকে বিশ বেতের হুকুম দিলেন। প্রহরী চোরকে লইয়া ডাক্তারখানায় যাইতেছে, পথের মধ্যে সে একটা স্ত্রীলোকের সঙ্গে রঙ্গরসে মাতিল, সেই সুযোগে চোর পলাইল। পরে প্রহরী, যখন দেখিল চোর নাই, সে আর তার সন্ধানে গেল না, জনাকীর্ণ বাজার হইতে একটা মুটেকে ধরিয়া আনিল, তাহার দ্বারা ডাক্তারখানার কাজ শেষ করিয়া অবশেষে যৎকালে দণ্ডস্থলে আনিয়া, সপাসপ শব্দে বেত জুড়িল, তখন সেই হতভাগোর চিৎকারে গগন ভেদ হইতে লাগিল।

দোহাই সাহেব! চাকরি চাই না, আধুলি ফিরে ন্যাও।

দোহাই সাহেব! আমি চাকরি করিব না।

কিন্তু তার এ কথা শুনে কে? আর তারে চিনেই বা কে? যিনি বেতের হুকুম দিয়াছেন, তিনি এখানে নাই, ক্ষুদ্র-হুজুর পঞ্চাশ হাত দূরে, চেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজে চক্ষু দিয়াছেন। এঁর প্রতিই দণ্ড দর্শনের ভার ছিল।

অভাগা মুটেকে কি বলিয়া ভুলাইয়াছে, তা জানা গেল না সে আর এ দিকে ফিরিল না, পর দিনেই এদেশ ত্যাগ করিয়াছে। জীবন বাবু স্বচক্ষে এই ঘটনা দেখিয়াছেন, তাই হাসিয়া বলিলেন, নির্ব্বোধ ঠাকুর; সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এরূপ ঘটনা প্রায় হয়। এ গুলি সুলক্ষণ। যে দেশে সাক্ষ্য দিবার লোক মিলিবে না বলিয়া, স্বয়ং ধর্ম্মরাজ এবং চন্দ্র সূর্য্য অ" দেবতা দলিলে সাক্ষী হইতেন, যে দেশে এই ভয়ে লোক সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিত, সেই দেশের লোক উপচায়ক হইয়া সাক্ষ্য দিতেছে, ইহা কি অল্প গৌরবের কথা। তবে শঠতা প্রবঞ্চনা সামান্য পরিমাণে বাড়িয়াছে বটে, ভিখারী এবং সাধু সন্ন্যাসীরা তাহার মূল। সভ্যদেশে এ সকল উৎপাৎ নাই। ইহাদিগের নিরাকরণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, অদ্য সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, অন্য সময়ে ইহার প্রতিবিধান করা যাইবে। ইহার পরেই সকলেই প্রস্থান করিল।

নবনগরীর ঘাটের দুই পার্শ্বের সৌধমালা, বসু বাবুদের কীর্ত্তি-কলাপের সাক্ষ্য দিতেছে। এগুলি দেবালয় এবং অতিথিশালা। সময়ে সময়ে সাধু সন্ন্যাসীরা এখানে আসিয়া থাকেন। বসু বংশে পুরুষ নাই, অবিরা বিধবা দক্ষিণা দাসী, উত্তরাধিকারিনী সুত্রে বিষয় ভোগ করেন। জীবন বাবু এই দক্ষিণার ভ্রাতুষ্পুত্র, দক্ষিণাই তারে প্রতিপালন করিয়াছেন। আর একটী বালিকাও দক্ষিণার পালিতা, তার নাম জলবালা। দেবতা ব্রাহ্মণের প্রতি দক্ষিণার অতিশয় শ্রদ্ধা ভক্তি, তিনি বার ব্রত এবং পুণ্য ধর্ম্ম লইয়াই থাকেন। সংপ্রতি এদেশে জনরব হয় যে, অতিথিশালায় একজন সিদ্ধ পুরুষ আসিয়াছেন। তাঁর কৃপায় অনেকেই উৎকট রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছে। একদিন অতি প্রত্যুষে, দক্ষিণা দাসী জলবালাকে সঙ্গে লইয়া সন্ন্যাসীর

কুটীরদ্বারে আসিয়া দেখা দিলেন, সন্ন্যাসী মুদিত নয়নে কুম্ভক অভ্যাস করিতেছেন, ভূমি ছাড়িয়া অর্দ্ধ হস্তের উপর শূন্যে আসন উঠিয়াছে। সন্ন্যাসীর বয়ক্রম বিংশতি বর্ষের উর্দ্ধ নয়, নধর গঠন, সুশ্রী, এবং প্রশান্ত মূর্ত্তী। পঞ্চদশ বর্ষীয়া চঞ্চল-স্বভাব জলবালা, "ওমা; দেখ দেখ;" বলিয়া কলরব করিবামাত্র, যোগী চাহিয়া দেখিলেন। দক্ষিণা প্রণামের উপক্রম করায়, তিনি নিবারণ করিয়া বলিলেন, মা; আমি প্রণামের যোগ্য নহি। আমি হীনমতি বালক, এখনও আমার গুরুদীক্ষা হয় নাই। আপনি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারিণী বিধবা; আপনি আমার পূজ্যা। কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছেন, তাই বলুন। দক্ষিণা বুঝিলেন, সন্ন্যাসী বঞ্চনা করিতেছেন, তাতেই বলিলেন, প্রভো; আপনার অগোচর কিছুই নাই, আমাকে ভুলাইতে পারিবেন না। আমার এই জলবালার মঙ্গল করুন। যোগী স্থির নেত্রে জলবালার বদন নিরীক্ষণ করিবামাত্র, ভ্রু আকুঞ্চিত হইল, বদন মণ্ডলে রক্তিমা আভা আসিল। হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া বলিলেন "মা; যে মহাপুরুষ জলবালাকে নদী গর্ত্ত হইতে তুলিয়া প্রাণ দিয়াছেন, আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, তিনিই উহার মঙ্গল করিবেন!" আমার সাধ্য কি।

দক্ষিণা বলিলেন "বাবা, ওর যে পূর্ব্ব কথা মনে নাই। কি জাতি, কার কন্যা, এসমস্ত নাজানিলে যে বিবাহ হয় না।"

যোগী উত্তর দিলেন—'জলবালা কুমারী নয়, উহার বিবাহ হইয়াছিল, এবং সৎকুলোদ্ভবা কায়স্থ কন্যা। জলমগ্নে অজ্ঞান হওয়াতেই স্মরণশক্তির লোপ হইয়াছে। তাতে মঙ্গল বই অমঙ্গল নয়। ঈশ্বর উহার সংসারের মায়া ঘুচাইয়াছেন, এখন নির্ব্বিঘ্নে ইষ্টসাধন করিতে পারিবে। মা, ঐটি আমার হয় নাই বলিয়াই আমি লালায়িত, ঐ জন্যই এখনও আমার দীক্ষা হয় নাই। মনঃসংযমের জন্য গুরুর আজ্ঞায় এখানে আসন করিয়াছি। এরূপ কথায় দক্ষিণা কান দিতে চাহে না, তিনি বলিলেন, বাবা, আমার জলবালার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন, উহাকে আপনার পায়ে ফেলিয়া দিলাম। জলবালাও যোগীর পা দুটী ধরিল। জলবালার স্পর্শে যোগীরাজ যেন চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হলেন, মুখ বিকৃত করিয়া রক্ত চক্ষে বলিলেন, কি পাপ! এই কথাটি বলিবামাত্র জলবালা, পা ছাড়িয়া দিয়া অন্তরে দাঁড়াইল এবং অভি-

মানে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, মা! আমাদের কি ঈশ্বর নাই? তুমি কি জাননা যে, ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও মঙ্গলামঙ্গলের হাত নাই। জলবালার চক্ষে জল আসিল। আবার বলিলেন মা, যদি ঈশ্বরের এইরূপ অবিচার হয়, তবে মানুষের উপাসনায় ফল কি?

প্রথম দর্শনে জলবালা যোগীকে দেবতার ন্যায় ভাবিয়াছিল, জন্মান্ধ ব্যক্তি, হঠাৎ চক্ষু পাইলে, যেমন তার জগৎ দেখিয়া শীঘ্র আশা মিটে না, জলবালাও যোগীকে সেইরূপ দেখিতেছিল, কিন্তু তার অশ্রদ্ধায় তেমনি মর্ম্মাহত হইল, দক্ষিণাকে লইয়া তৎক্ষণাৎ গৃহাভিমুখে চলিল। জলবালার হৃদয়ে, ঘৃণালজ্জা রাগদুঃখ এত প্রবল হইয়াছিল যে যোগীর প্রতিমূর্ত্তিকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল।

বিধাতা, অশুভক্ষণে এই বিশ্বসংসার পত্তন করিয়াছেন। তাঁর সকল সন্তানই নির্জ্জলা সুখের জন্য লালায়িত। কিন্তু সে ধন তাঁর ভাণ্ডারে নাই। সুবোধ সন্তানেরা দেখিয়া শুনিয়া, সংসার-ত্যাগী উদাসীন হয়েছেন। আমরা অবোধ বলিয়াই তাঁরে প্রতি নিয়ত গালী দিয়া থাকি। আবার সময় পাইলে নিজের ক্ষমতা চালাইতে কসুর করিনা, কিন্তু তিনি আমাদের মঙ্গল সাধনের জন্য বিব্রত, রাগ নাই, বিরক্তি নাই, কেবল দিবা নিশি দয়া ঢালিতেছেন, সেকথা আমরা এক দিনের জন্যও ভাবিনা, কেবল ঝগড়া করিবার জন্য ছল খুঁজিয়া বেড়াই। তাই বলি যে, বিধাতার সুখ্যাতির কপাল নয়। আমাদের দক্ষিণা দাসীকে তিনি অতুল ধন সম্পত্তি দিয়াছেন, কিন্তু পুত্র কন্যা দিলেন না। দক্ষিণার মন উঠিলনা, সে তাঁর মঙ্গল উদ্দেশ্য বুঝিলনা। দেব দ্বারে মাথা কুটিল, কত উপসনা করিল, কিছুতেই কিছু হইলনা। সে বিধাতার লিখন মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল, জীবনধনকে পুত্র রূপে প্রতিপালন করিয়া, বৃদ্ধ বিধাতাকে অপ্রতিভ করিতেগেল; কিন্তু সে যখন দেখিল জীবন ধনের গুণে, বন্ধ্যা নারীরা পুত্র কামনা ত্যাগ করিল, মৃতবৎসার শোক শৈথিল্য হইল, পুত্রবতীরা, মুখ বাঁকাইয়া শিশুর মুখে স্তন দিতেছে তখন অবাধ্য দক্ষিণা বুঝিলেন, বিধাতা তারে ভাগ্যবতী করিবেন বলিয়াই অপুত্রা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাও ক্ষণিক! কিছু দিন পরে যখন ব্রহ্মচারী মহাপুরুষ জলবালাকে উহার হস্তে সমর্পণ করিলেন, তখন আবার আশার কুহকে মুগ্ধা

হইল। জীবন ধন বিদকুটে পানার মত, তাহার হৃদয় সরসীর স্বচ্ছ সলীল ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, এখন এই জলবালা অন্তরে শিকড় নামাইয়া কচুর দলের ন্যায় সর্ব্বোপরি স্থান অধিকার করিল। কেহবা বলিতে পারেন যে, জলবালার অন্তরের স্নেহ রাশি তুষারের ন্যায় জমাট ছিল, দক্ষিণার আদরে গলীয়া যাওয়ায় দক্ষিণাই তাহাতে ডুবিয়া রহিলেন।

জলবালার গুণের পরিচয় এই যে, লোকে ইহাকে দেখিলেই বুঝিতো যে, ভদ্র কুলোদ্ভবা হিন্দুবালা। বিধাতা তার গুণের অনুরূপ রূপও দিয়াছেন। জলবালা দিবা নিশি প্রফুল্ল থাকিত, মিষ্ট কথায় সকলকে আনন্দিত করিত; এখনও লজ্জা ভয় সম্যকরূপে শিখেনাই। দক্ষিণার পুথি শুনিবার বড় সাধ বলিয়া জলবালাকে লেখা পড়া শিখাইয়াছে, সমস্ত সংবাদ পত্র গুলি আনিয়া দেয়। দক্ষিণার আনন্দের সীমা নাই। তিনি জলবালার মুখে পুথি শুনিবার সময়ে, উহাকে স্নেহভরে তোতা পাখী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ওদিকে তাঁহার পালিত বন্য-বিড়াল, জীবন বাবু অন্তঃপুর প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া, ম্যাও ম্যাও শব্দে বক্তৃতা যুড়িলেন। আমরা বহু কষ্টে সেই অপরিস্ফুট ভাষার ভাবার্থ সংগ্রহ করিয়াছি।

"পিশি-মা! ভারতের দুঃখ দেখিয়া বুক ফাটিয়া যায়। ভারতের উপর বিধাতার বিষম কোপ। আমরা বিলাত-ফেরত পণ্ডিতগণের মুখে শুনিয়াছি যে এই বঙ্গ বালিকারাই বিধাতার রাগ বাড়াইতেছে। এরা তাঁর দয়ার দানকে অশ্রদ্ধা করে, আপনাদের ন্যায় দাবি বুঝিয়া লয়না। ইহারা স্বচক্ষে দেখিতেছে যে, ন্যায়পরায়ন ঈশ্বর পশু পক্ষিকে পর্য্যন্ত স্বাধীন অধিকার দিয়াছেন, তারা ইচ্ছামত যোড়া মিলাইয়া পরম সুখে, ঈশ্বরের গুঢ় অভিপ্রায় সাধন করে। দাম্পত্য সম্বন্ধে ইহাদের পিতা মাতার কোন হাত নাই, তথাপি এই অবাধ্য নারীকুল শাস্ত্র সংহিতার কুহকে ভুলিয়া ঈশ্বরকে অমান্য করিতেছে। হায়! একি বলিবার কথা; যে নিষ্ঠুর চণ্ডাল নরাধম, অজ্ঞান বালিকাকে ভুলাইয়া তার পতি হইয়াছে, সে পরম শত্রু, কিন্তু সে বৃদ্ধ হউক, অন্ধ হউক, বা অযোগ্য হউক তথাপি এই পাপীনীরা তাহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিবে, তাদের চক্ষে এই মহাপাতকীটাই পরমেশ্বর, যে তাদের দুর্দ্দশা করিল সেইই পরমেশ্বর ইহাতে সেই আসল পরমেশ্বরের রাগ হইবেনা তো কি! অবোধ বালিকা

একবার ভাবেনা যে, আমরা সকলেই সেই ঈশ্বরের সন্তান, সে সম্বন্ধ ধ পিতা মাতা ভাই ভগ্নীর সামিল। তবে কে তাহাকে দান করিল? ভাই, ভগ্নী দান করিবে এরূপ আইন কোথাও নাই। বিধাতা, চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতেছেন, বাল্য-বিবাহ বিবাহই নয়, এটা একরূপ ব্যভিচার। এই পাপিনীদের পাপেই আমরা নিস্তেজ এবং দুর্ব্বল। এই জন্যই আমরা সভ্য সমাজে মুখ দেখাইতে পারিনা।

দক্ষিণা অধোবদনে, "থাম্ থাম্" করিতেছেন, তাঁর তোতা পাখী, তাঁর বুকের ভিতরে মুখ লুকাইল। জীবন বাবু, দাসীবর্গকে প্রশংসা করিতে করিতে বাহিরে গেলেন। দাসীরা কাজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন, সুতরাং জীবনের বিশ্বাস যে, উহারাই বক্তৃতার মর্ম্ম বুঝিয়াছে।

আমরা বলিতে পারি যে, জীবনের এরূপ বক্তৃতার অধিকার আছে। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সত্যবীর। তাঁর জন্মদাতা পিতা, এই দোষে দোষী বলিয়া, তার মুখ দর্শন করেন না। তিনি ক্ষমা গুণের আধার বলিয়াই এতকাল তার লালন পালন সহ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু ক্ষুদ্র বালিকার সহিত বিবাহ দেওয়াতেই তাঁর কপাল ভাঙ্গিল, আইনমতে তারে ত্যজ্য-পিতা করিয়া সম্বন্ধ ছেদ করিয়াছেন। জননীর অন্য দোষ নাই বটে, কিন্তু তিনি ঐ পতিত-পতিরসংসর্গে পতিতা।

উদার-চেতা জীবনের দয়াও অসীম। পরিণিতা ভার্য্যা, যুবতী হইলেই নিজে তার বৈধ বিবাহের উদ্যোগ করিবেন, এরূপ কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। অবোধ জলবালা জীবনের শুভ-উদ্দেশ্য বুঝিতনা, ভয়ে কাঁপিত, জীবকে দেখীলেই গৃহের মধ্যে লুকাইত। তাই বলিয়া কি জীবন তারে উপেক্ষা করিবেনা? তবে আর নিঃস্বার্থ উপকার কি? ভূকৈলাশের সেই যোগী পুরুষ সমাধি ভঙ্গের জন্য কাঁদিয়াছিলেন বলিয়া কি, পর-উপকারী মহাত্মারা তারে ছাড়িয়াছিলেন? তাঁরা, তারে অনাহারে বিজন বনে পড়িয়া থাকিতে দিবেন কেন? তখনই তার রাজ-ভোগের বন্দোবস্ত করিলেন। জীবন বাবু স্বাধীনতা পিযুষ লইয়া, জলবালার পাছে পাছে ফিরিতে লাগিলেন, কাণ না দিলে, গায়ে ছড়াইয়া দেন।

যাগীর সহিত সাক্ষাৎ অবধি, জলবালা সর্ব্বদা অন্যমনস্কা থাকিত, সাত ডাকে উত্তর দিতনা। অকাল-জাত অঙ্কুরে সলিল-সিঞ্চনের ন্যায়, দক্ষিণার শান্তনা বাক্যে কোন কাজ হইত না। একদিন অপরাহ্নে, দক্ষিণার, আগ্রহে, জলবালা সংবাদ পত্রখানি পড়িতে বসিলেন, সে কাগজে, বিধবা সংক্রান্ত প্রবন্ধ ছিল।

বিধবার প্রতি ভ্রাতৃ জায়ার গঞ্জনা, —
কিসের ভাবনা তোর কেন দিবানিশি,
বসে থাক বৃক্ষমূলে অন্যমনা হ'য়ে।
দাঁড়া হাত দাঁড়া পা, সদা হাসি খুশি—
তবুও দেখনা কেন ঘরকন্না চেয়ে।
এক দিকে ছেলে কাঁদে অন্য দিকে স্বামী
কতবা দেখিব একা সব গেল বয়ে॥
তোদের ঠাকুর গরু তোদের সংসার।
সুখের ভাগিনী তুই শশুরের মেয়ে।
ঘুঁটে দধি গোবর সকলি তোর হাত
নইলে নয় নিই তাই দুধ টুকু দুয়ে।
রাশি রাশি শাক পাত মোচা থোড় কলা,
সব তোর, আমি মরি আঁশ কাঁটা খেয়ে।
সোনা দানা নাই বলে কাঁদে তোর ভাই
কড়ের াড় বন পুষে লক্ষ্মী গেল ছেড়ে।
ধর্ম্ম খেগো লোক তবু কত কথা কয়।
অন্য মেয়ে হ'লে দিতো কোন্‌কালে তেড়ে।
দেখুক এখন লোক বহিনীর গুন।
এর চেয়ে দাসী ভাল কাজকরে কেড়ে।
আসুক বলিব, আজ দেখাইব রঙ্গ।
শেজ্ পাড়া মালাগাঁথা সব থাক্ পড়ে।
গা ধোওয়া হ'লনা, আরো বাকী চুল বাঁধা,
দেখিস্ তখন ভাই কত মাথা কোঁড়ে।

বড় অমঙ্গল বিধবার মুখ দেখা,
সকালে উঠি না তাই থাকি ঘাড় মুড়ে ॥
এমনি খলতা তোর, জেনে শুনে তবু
ছুতালতা করিয়া থাকিস দ্বার যুড়ে ॥
কি করি সকল সই শাশুড়ীর তরে।
লুকাইয়া থাই পাছে তোর দৃষ্টি পড়ে।
বড় চক্ষুলজ্জা বলে চেপে রাখি কথা
ভয় পায় খোকা কোলে যেতে মাথা নাড়ে।
না বলিলে নয় তাই বলিবো এবার।
বন যদি চাও, দেও মোর আশা ছেড়ে।
যতদিন বেঁচে আছে শশুর শাশুড়ী
করে স্বাও যত পার দেখি কত বাড়।
তার পর বুঝা যাবে হবো নাকো বড়ী,
ঝাড় ছাড়াইয়া তোর ফেলিবো চৌপাড় ॥

বিধবা সজল নয়নে উত্তর দিল।

এ দোষ আমার নয় বুঝে দেখ দিদি।
অমঙ্গল-মাখা মুখ দিল পোড়া বিধি।
প্রাতৃজায়া বিধবার তিক্ত উত্তর না শুনিয়াই দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।
বিধবা আবার কর যোড়ে উর্দ্ধনেত্রে আরম্ভ করিয়াছে।
হে বিভো. করুণা সিন্ধু পতিত পাবন।
লোকে বলে তুমি নাথ স্বায়পরায়ণ।
নিয়ম মঙ্গলময় দয়ার আধার।
জনমের আগে স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার।
অকারণে অবিচারে নাই তব দান।
যার যেই প্রয়োজন সমান সমান ॥

বায়ু সাগরেতে পক্ষী সন্তরণে রত।
এইহেতু বক্ষ তার তরণীর মত ॥
বন্ধ্যা বক্ষে ক্ষীর নাই, নিত্য দেখি চক্ষে
তবে কেন পক্ষপাৎ বিধবার পক্ষে।
প্রখর তপন ধুমে, তৃণ নাই মরুভূমে
নাহি তথা মেঘের সঞ্চার।
নাহি জানে কোন জ্বালা, দিবানিশি করে খেলা,
রচি মরিচিকা চমৎকার।
বিধবা প্রকৃত মরু, তবে কেন আশাতরু
অঙ্কুরিত হৃদয়ে আমার।
কেনবা প্রকৃতি সতী, যোগায়েন নিতি নিতি,
লুপ্ত দেহে গুপ্ত উপচার ॥
কেন হ'ল স্থূল উরু, কেন পয়োধর গুরু,
অন্তর্দাহে জ্বলে যায় প্রাণ।
ক্ষমা কর [redacted] ধরি, যাতনা সহিতে নারি,
ফিরে নাও প্রকৃতির দান।
জাননা কি অন্তর্যামি, সৃষ্টিছাড়া বালা আমি,
কিছুতেই নাই অবিকার।
তবে পুনঃ কি বিচারে, টানিয়া আন সংসারে,
কেন দেও যাতনা অপার।

এই পর্য্যন্ত পড়িয়াই, জলবালার কণ্ঠরোধ হইল, কাগজ ফেলিয়া দেখিলেন, দক্ষিণা দাসীও অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, উভয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কথা কহিতে পারিলেন না, এই সময়ে, আমাদিগের জীবন বাবু হাস্যবদনে উপস্থিত। পূর্ব্ব দিনে জীবনের অত্যাচারে, জলবালা প্রাণত্যাগের সংকল্প করিয়াছিল; দক্ষিণা সেই কারণে, জীবনের অন্তঃপুর প্রবেশ নিষেধ করেন, কিন্তু সে, সে কথা গ্রাহ্য না করিয়া আবার আসিয়াছে। জলবালা, তাহাকে দেখিয়াই, ঘন ঘন দক্ষিণার দিকে চাহিতে লাগিল। দক্ষিণা, জলবালার মুখ মণ্ডল দেখিয়া, অমঙ্গলের আশঙ্কা করিলেন, আর জীবনের ভাবভঙ্গিতে

তাঁর রাগ এবং ঘৃণা হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ দ্বারবান দ্বারা জীবনকে বাহির করিয়া দিলেন। এতদিনের পর অনর্থের সূত্রপাৎ হইল। পূর্ব্বকালে বীর-পুরুষেরা বৈর-নির্য্যাতন জন্য শক্তি আরাধনা করিতেন, এক্ষণে সেই শক্তি দেবী, আইন রূপে বিরাজিতা। এ সাধনে গুরুর অভাব নাই, যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্য দক্ষিণার লোভে শত শত গুরু উপযাচক। বীরেন্দ্র, জীবন বাবু গুরুর উদ্দেশে চলিলেন; এদিকে দক্ষিণা, জলবালাকে লইয়া মহা বিব্রত হলেন, জলবালার জ্বর হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমাদের নবনগরী একটী সবডিবিজন। ধর্ম্মাসনে নররূপী ধর্ম্মাবতার উপবিষ্ট। ধর্ম্মের দ্বিতীয় নাম যম, এজন্য কেহ কেহ খাঁটি-যম বলে। সাধারণ লোকে হুজুর বলিয়াই জানে। সুদূর উত্তর দেশে জেলার সিংহাসনে ত্রিদশ নাথ ইন্দ্রদেব বিরাজিত। উচ্চতম আদালতে ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বর আদি দেবতারাও আছেন, কিন্তু সে সকল স্থান সাধারণের অগম্য, লোকে তাঁদের দর্শন পায়না কেবল এই হুজুরের সঙ্গেই আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, ইনিই আমাদের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। হুজুরের অনুচর উপচরেরা পুলিসবেশে রাজ্য শাসন করে, তাদের কৃপায় চতুর্বর্গ, অকৃপায় নরকবাস। এক্ষণে নরকের পরিবর্ত্তে জেলখানা হইয়াছে। সে কালের বেদজ্ঞ মুনি ঋষিরা যাগ যজ্ঞ করিয়া কালভয় নিবারণ করিতেন, এখনকার আইনজ্ঞ উকিল মোক্তারেরা সেই কাজ করেন, উচ্চ দেবতারা এদের মারফতেই সাধারণের শোক-সন্তাপ বিমোচন করেন। কিন্তু সে ভাগ্য সকলের হয় না, ইহাতে বেশী পয়সা চাই।

হুজুরের বিলক্ষণ যশ-ভাগ্য আছে। সংপ্রতি একটি চমৎকার মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। রামনাপিত, এবং তার স্ত্রী, অমলা একযোগে তাদের কন্যা কামিনীকে হত্যা করিয়াছে। রাম মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিল "হা আমরা কামিনীকে কাটিয়াছি। অমলা বলিল আমি, কামিনীকে ধরিয়াছিলাম, আমার স্বামী তার গলায় ছুরি দেয়। ইহাতে প্রশ্ন হইল, কেন খুন করিয়াছ? অমলা বলিল, "কি বলিতে হবে তা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। রাম, স্ত্রীকে ধমক দিয়া বলিল "এক কথা একশ-বার বলিয়া দিলেও কি মনে থাকে না? কামিনী যে দ্বিচারিণী ছিল। অমলা তখনই বলিল, হাঁ হাঁ ঐ কথাই বটে। দেশী বিলাতী এক একজন হাকিম আছেন, তাঁরা পুলিস সাগরের পক্ষে মন্দরগিরি, এই সুত্রে মন্থন করিয়া কত হলাহল তুলিতেন, কিন্তু আমাদের হুজুরের সে দোষ নাই, ইনি মৈনাক পাহাড়, ডুবিয়া ডুবিয়া কাজ শেষ করেন বলিয়াই এত সুখ্যাতি। নিরপরাধে অপরাধীর কাঠরায় দাঁড়াইলাম বলিয়া প্রায় কেহ আক্ষেপ করিতে পারে না।

মা চণ্ডিকা, হুজুরের হস্তে অক্ষয় বেত্র দণ্ড, এবং সন্দেশের, একাধি-পত্তি দিয়াছেন, তাতে উচ্চ দেবতারা হস্তক্ষেপন করিতে পারেন না, সেই সঙ্গে সঙ্গে ফাঁশির রজ্জু গাছটীও হুজুরের হাতে থাকিলে, এই দণ্ডেই, কন্যা-ঘাতকদের পুরা প্রায়শ্চিত্ত হইত ; কিন্তু এখন ইহাতে নানা সন্দেহ। একে স্থূলোদর জজ, তাতে আবার নির্ব্বোধ জুরি, ইহাতে সুবিচারের আশা কোথায় এই ভাবিয়াই বোধ হয় হুজুর বলিলেন, এ মোকদ্দমায় আরও প্রমাণ সংগ্রহ করা চাই।

প্রভুভদ্র পোলিসদল, যো হুকুম বলিয়া সেলাম ঠুকিল, এবং জয়রাম শব্দে গ্রামে পড়িয়া, পরদিনেই, নর অস্থিপুঞ্জ কেশগুচ্ছ আদি ষোড়শোপচারের বিবিধ প্রমাণ থরে থরে সাজাইয়া দিল। কামিনীর, কণিষ্ঠা ভাগিনী বলিল এ গুলি আমার দিদিব পাঁজর, ও গুলি তার দাঁত, আর সে গুলি তার চুল, আমি সমস্তই চিনিয়াছি, একজন প্রতিবেশী বলিল "আমি স্বচক্ষে দেখেছি রাম কামিনীর গলায ছুরি দিয়াছে, এবং তাহাতেই অমলার আঙ্গুল কাটিয়া গিয়াছে। ডাক্তার বাবু বলিলেন, আঙ্গুলে অস্ত্র চিহ্ন আছে সত্য। তখনই মোকদ্দমাটী দায়রায় অর্পণ হইল।

একমাস পরে দায়রায় আদালতে জুরি মহোদয়েরা প্রমাণের তরঙ্গে হাবুডুবু খাচ্চেন, বিচক্ষণ জজ বাহাদুর বন্দী দম্পতিকে এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ কর্চ্ছেন, এমন সময়ে একটী ষষ্ঠদশ বর্ষীযা যুবতী, আদালতে উপস্থিত হইয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। অমলা ব্যগ্রভাবে বলিল, মা! তুমি কেন এসেছো! প্রাণ নিয়ে পলাও, ওরা তোমাকে দেখিলেই ফাঁসী দিবে-- তুমি কি লুকাইয়া থাকিবে না? যুবতী যাইতে চাহে না, কেবল জজের দিকে তাকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। জজের ইঙ্গিতে দারোগা যুবতীর নিকটে আসিবা মাত্র, অমলা চীৎকার শব্দে কাঁদিয়া উঠিল, এবং বলিল, দোহাই সাহেব! উহাকে ছাড়িয়া দেও—ও আমার মেয়ে নয়, ও আমাদের কামিনী নয়, ও—কে তা আমরা জানি না, দুখিনীর বাছাকে ফাঁসী দিও না।" জজ সাহেবের আগ্রহ বাড়িল, তিনি যুবতীকে আনিয়া সবিশেষ জিজ্ঞাসা করায় বুঝিতে পারিলেন যে কামিনী দুই মাস পূর্ব্বে খুন হয়েছে, যাহার অস্থি পুঞ্জ হইত হুজুরে উপস্থিত, যার জন্য তার মাতা পিতা দুই মাস হাজতে

মৃতকল্প, সেই কামিনী সশরীরে উপস্থিত। সকলেই "কামিনী কামিনী" শব্দ করায় মহা গোল হইল। একা অমলা, কয়জনকে থামাইতে সে দারোগার পায়ে ধরিয়া যোড়হাতে মিনতি করিল। দারগা অমলার কথা নির্ভর করিয়া বলিল, ইহার সূক্ষ্ম বিচার করুন, কামিনী এক্ষণে মা বাপকে বাঁচাইবার জন্য মিথ্যা কথা বলিতেছে, নতুবা ও অবশ্যই মরিয়াছে, আমাদের সাক্ষী মিথ্যা বলিবার লোক নয়। জজ সাহেব মোকদ্দমাটী ডিশমিষ করিলেন। পুলিস দল রাগে গর গর হইয়া বলিল, দায়বায় সুবিচারের আশা নাই।

পাঠক! ক্ষমা করুন। আমরা প্রসঙ্গের অনুরোধে বহু দূরে আসিয়াছি। যে সময়ে হুজুরের বাসায় সন্ধ্যার পরে, রাম আপনার দোষ স্বীকার করিতেছিল, সেই সময়ে দারোগা মহাশয়, হুজুরের কর্ণমূলে বলিলেন, দক্ষিণাদাসী চাঁদার বহিতে সহি করে নাই, সে পাঁচ শত টাকা দিতে স্বীকার নয়। হুজুরের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, ক্রোধে আত্ম বিস্মরণ হইয়া, বলিয়া ফেলিলেন, দক্ষিণার কি কোন মোকদ্দমা উপস্থিত নাই?

সুচতুর দারগা এই সুযোগে, উত্তর দিলেন—মোকদ্দমা উপস্থিত নাই বটে, কিন্তু বিলম্বও নাই। দক্ষিণা তার পোষ্য পুত্র, জীবনকে তাড়াইয়া দিয়াছে, জীবন নালিষ করিতে উদ্যত হইয়াছে, কিন্তু হুজুরের বিনানুমতি আমরা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারি না।

হুজুর এক্ষণে আত্ম সম্বরণ করিয়াছেন; সাবধানে উত্তর দিলেন—সাবধান, আইন বহির্ভূত কাজ না হয়।

হুজুরের উপদেশে দারগা বাবু আইন দেবীর ধ্যান করিলেন। দেবী অন্তরে আবির্ভাব হইয়াই বলিলেন "বৎস; চিন্তা কি; যখন আমাকে হস্তগত করিয়াছ, তখন আর কোন ভয় নাই। আমি কামরূপিণী, আমি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের তাল বেতাল, আমিই উপন্যাসের সিদ্ধিব ঝুলি, আমিই আবার আইনরূপে তোমাদের অধীন।"

দেবীর আশ্বাসে দারগার মহা আনন্দ হইল। পরদিন জীবনের জীবন রহস্য শুনিলেন, সে এই প্রকারঃ—

দক্ষিণা পৌষ্য পুত্র গ্রহণ মানসে জীবনকে প্রতিপালন করেন,

যাগ যজ্ঞের দিনস্থির করিবার জন্য গ্রামের ব্রাহ্মণেরা সমবেত হইয়াছিলেন; ব্রাহ্মণদের সঙ্গে জীবনের যেরূপ সদ্ভাব পূর্ব্বেই সে পরিচয় দেওয়া হয়েছে; এই সময়ে বিদ্যানিধি ঠাকুর তার শোধ লইলেন, তিনি বলিলেন, "জীবন কৃতদাস পুরুষ ইনি পৌষ্য পুত্র হইতে পারেন কিনা তা পুথি না দেখিয়া বলিতে পারি না।" জীবন কিছুতেই পশ্চাৎ-পদ নহেন, তাদের সঙ্গে ঘোর তর্ক বিতর্ক করিয়া বলিলেন, তিনি তাঁর জন্মদাতাকে ত্যজ্য পিতা করিয়াছেন, সুতরাং তাঁর কৃত কার্য্যের জন্য তিনি আইনমতে বাধ্য নহেন, কেননা বিবাহকালে তিনি নিজে নাবালগ ছিলেন। বিদ্যানিধি মহাশয় বিখ্যাত স্মার্ত্ত, তিনি তিথিতত্ত্ব আদি সকল তত্ত্বই জানেন, কিন্তু ত্যজ্য পিতা তত্ত্ব তাঁর পড়া ছিল না, তিনি বিচারে অপ্রতিভ হলেন। তথাপি দক্ষিণার প্রতিতি হইল না, তিনি বিষন্ন বদনে, সার্ব্বভৌম দাদার শরণ লইলেন। সার্ব্বভৌম বিশেষ তৈলবট লইয়া, নিজে অনুকুল মত দিলেন, আবার নবদ্বীপ হইতে সুব্যবস্থা আনিবার জন্ত প্রভুত অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক সেই দিকে যাত্রা করিলেন। কাজে কাজেই কাল বিলম্ব হইল, কিন্তু এই বাজে কাজের অনুরোধে জীবনের বীর হৃদয় স্থির থাকিবে কেন? তিনি জলবালার উপর অত্যাচার করিলেন। এ পর্য্যন্ত তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে তিনিই পাকা পোষ্য পুত্র।

তিওর বাগদীরা স্নান পানের উপকার বুঝে না, পুষ্করণীর জল ঘোলা না করিলে মাছ ধরা হয় না। জমিদারের ঘরে মামলা মোকদ্দমা না বাধিলে অনেক আমলা তিষ্ঠিতে পারে না। দক্ষিণা দাসীর কারকুন, সর্ব্বনবিশ দত্ত সেই ধাতুর লোক, জীবনের প্রতি তার দারুণ স্নেহ। তার কৌশলেই জীবন এখন পর্য্যন্ত, বাহির বাড়ীতে রাত্রি-যাপন করেন। দত্তজর এই একটী চমৎকার গুণ যে তিনি নিজের স্বার্থ দ্বৈপায়ণ হ্রদে ডুবাইয়া সকলেরই মনোরঞ্জন করিতে পারেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দক্ষিণা দাসীর অন্তঃপুরে।

সন্ধ্যার সময়, দক্ষিণার অন্তঃপুরে সকলেরই বিষন্নভাব। মঙ্গলসূচক সঙ্খ-ধ্বনি নাই, কাহারও মুখে হাসি নাই, বৃদ্ধা দাসী গুন্ গুন্ স্বরে রোদন রাগিণী ভাঁজিতেছে, আর দোক্তা তামাক্ পোড়াইয়া গুড়া করিতেছে, দ্বিতীয় দাসী জিজ্ঞাসিল, "মাশি! জলবালা কেমন আছে? রক্ষা পাবে কি?" বৃদ্ধা উত্তর দিল—না—রক্ষা পাবে না—তবে কিনা আবোল হ'য়ে রইলো এই বড় দুঃখে। এত ডাক্তার এত বৈদ্য, এত খরচপত্র, কিন্তু কেউ কথা কহাইতে পারিল না তা মরুক, ধর্ম্ম আছেন। দ্বিতীয়া আবার জিজ্ঞাসিল, কি মাশি কি হয়েছে? বৃদ্ধা উত্তর দিল জলবালা দেবতা ছিল, বাঁচিবে না তা আগেই জানিতো, তাই তার হাতের বালাগাছটী আমাকে দিতে চায়। তাই বলি, যদি অবোল হইয়া মরিয়া যায়—জলবালাকে আমি বড় ভাল বাসি অনেক যত্ন করেছি কিন্তু আর শ্রদ্ধা হয় না এখন সেই বৈদ্যটা এসেছে, সে সমস্ত রাত্রি থাক্‌বে আমি আর যাবোনা আমার মাথাধরেছে, গিন্নি তার যথাসর্ব্বস্ব পাবেন, তিনিই সেবা করুন।

এদিকে দক্ষিণা দাসী জলবালার শয্যায় বসিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন, এবং বৈদ্যকে বলিতেছেন, জলবালা ডাক্তারের ঔষধি খায় না বলিয়াই রোগ বাড়িয়াছে, কিন্তু এখন তো অজ্ঞান অবোল। বৈদ্য উত্তর দিলেন মা আমি প্রথমেই ডাক্তারি শিক্ষা করিয়া ইংরাজিমতে চিকিৎসা করিতাম, তার পরে বৈদ্য হইয়াছি। জলবালার রোগ সাংঘাতিক, এঅবস্থার ঔষধি দিলেই বিপরীত ফল হয়।

এই সময়ে জলবালা, "যোগী যোগী" বলিয়া হাঁসিয়া উঠিল। বৈদ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি ডাক্তারি ঔষধ দিয়াছেন? নাহ'লে প্রলাপ হয় কেন।" দক্ষিণা, বদন অবনত করিলেন, এদিকে প্রলাপের প্রস্রবণ উঠিল। অরাম্মুর যেন প্রকৃতির বাদ্যো পুলিসের জমাদার।

সে পীড়ন করিয়া বালিকার অন্তরের কথা বাহির করিতেছে! জল-বালার প্রলাপ এইরূপ, যোগী ঠাকুর! স্ত্রীলোক কি এতই অপদার্থ! স্ত্রীলোক কি ইন্দ্রিয় দমন করিতে জানে না! জগতে কি যোগিনী নাই! আমার মায়ের চেয়ে তপস্বিনী সংসারে কে আছে! আমি এই মায়ের কন্যা! ইত্যাদি নানা কথা শুনিয়া বৈদ্য, দক্ষিণাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! আপনার জলবালা কি বিধবা?

দক্ষিণা কি উত্তর দিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময়ে দাসীদের কলরব শুনিয়া ফিরিয়া দেখিলেন সেই যোগীরাজ সম্মুখে উপস্থিত। দক্ষিণার আহ্লাদের সীমা রহিল না, গলায় অঞ্চল জড়াইয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। এবং করুণস্বরে বলিলেন, বাবা! এতদিনের পরে দুঃখিনীর উপরে দয়া হয়েছে কি! আপনার কোপে পড়িয়াই বাছা আমার শর্য্যা ধরা হয়েছে, আপনি ওর প্রাণ দিউন। আমি আপনাকে সোণার রুদ্রাক্ষ মালা দিবো।

বৈদ্য বলিলেন মা! আপনি কারে স্তব করিতেছেন, আপনার যোগীরাজ যে ঘুমে অচেতন, উনি জাগ্রত নয়, ওঁর বাহ্যজ্ঞান নাই। বৈদ্যের এ কথা কেহই বুঝিল না। নিদ্রিত মনুষ্য চলিয়া বেড়ায়, কি রূপেই বা বিশ্বাস হয়। কিন্তু যোগীর ভাবভঙ্গি দেখিয়া, দক্ষিণার মনে সন্দেহ হইল। বৈদ্য তাহা বুঝিয়া আবার বলিলেন মা! ইহাকেই নিশি ভূত বলে। কিন্তু আমরা বেশ জানি যে, ইহা গাঢ় নিদ্রা ভিন্ন আর কিছুই নয়। এদেশে নিশি-ভূত সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প আছে। সংপ্রতি একজনা মানুষকে নিদ্রা হইতে তুলিয়া নিয়া শ্মশানের বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষে ঝুলিয়াছিল, এখন পর্য্যন্ত রোজা (ওঝা) তার ঝাড়ান ঝোড়ান করিতেছে। সেই নিশি ভূতের নাম শুনিয়া সকলের মুখ শুকাইল। দাসীরা পলাইয়া গেল। বৃদ্ধা দাসী পলাইবার সময় বলিয়া গেল, বালা দুগাছি আমাকে না দিলে ধর্ম্ম থাকিবে না। এ সময়ে জলবালা নিস্তব্ধ ছিল।

এদিকে যোগীবর, শয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া, মুখ ফিরাইয়া, রোগিনীর শরীর পরীক্ষা করিলেন, এবং কণামাত্র ঔষধি বাহির করিয়া জিহ্বাগ্রে দিলেন। ঔষধির আশ্চর্য্য প্রভাব! ক্ষণকাল পরেই বালিকার জীবন চিহ্ন হইল। সে চাহিয়া দেখিল, কথা কহিল, এবং খাইতে চাহিল। চতুর বৈদ্য-

বাজ, যোগীর সেই ঔষধির কিয়দংশ সংগ্রহ করিয়া বলিলেন মা ! ভয় নাই। ইহাই প্রকৃত পারাভস্ম। জলবালা সামান্য দুগ্ধ পান করিয়া বলিলেন মা ! আবার কি ফিরিলাম ! দক্ষিণা, উত্তর দিলেন, বাছা ! তোমার প্রাণদাতা যোগী ঠাকুরকে প্রণাম কর। বাপার কৃপা হয়েছে।

দাসীরা আসিয়া যুটিল, তাদের ভয় ভাঙ্গিয়াছে। একজন ধিক্রূপ ভঙ্গিতে বলিল, কবিরাজ মহাশয় ! এখনও কি ঘুম আছে? দক্ষিণাও একটু হাসি-লেন। বৈদ্যের তাহা সহ্য হইল না, তিনি একটু গুঁড়া বাহির করিয়া যোগীর নাসিকাতলে ধরিলেন। যোগীর চমক ভাঙ্গিল, তিনি এদিক ওদিক চাহিয়া, ক্ষিপ্তের ন্যায়, "কে আমার সর্ব্বনাশ করিল, কে আমারে এখানে আনিল। হায় ! কেন আমি জলবালার মুখ দেখিলাম, আমার কি গতি হবে" এইরূপ বলিতে বলিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে বাহিরের দিকে ছুটিলেন। দক্ষিণার মনস্তাপের সীমা রহিল না, কিন্তু যোগীকে ফিরাইতে পারিলেন না, তিনি আবার জলবালাকে লইয়া বিব্রত হইলেন। সে বলিতে লাগিল মা ! আমি বাঁচিয়া তোমার কি উপকার করিব। আমার যে মরণই মঙ্গল। যে আমারে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে তাহার দ্বারা কি বাঁচাইতে হয়? দক্ষিণা তাহাকে শান্তনা করিতেছেন, এমন সময়ে বাড়ীর বাহিরে "পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো ডাকু চোট্টা ইত্যাদি কোলাহলধ্বনি দক্ষিণার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। এক্ষণে রাত্রি দুই প্রহর, তিনি তার লোকজনকে ডাকাডাকি করি-লেন। তারা অনেকক্ষণ পরে, চক্ষু মুছিতে মুছিতে আসিয়া একবার বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিল, এবং বিকট চীৎকার ছাড়িল। অবশেষে শঙ্কর সর্দ্দার বলিল, মাঠাকুরুণ আমি থাকিতে কোন চিন্তা নাই। এখানে মানুষের গোল হয় নাই। একটা নিশিভূত ঐরূপে চিৎকার করে, আমি ধুলাপড়া দিতেছি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নবনগরীর ডেপুটি বাবু, ক্ষণ-জন্মা-পুরুষ, এবং স্বনাম-ধন্য-লোক। এঁর পিতা কিঙ্কর দাসের নামে, এবং উপাধিতে হীনতার চিহ্ন আছে বলিয়া, ইনি জগদ্দল রায় বাহাদুর নাম গ্রহণ করিয়াছেন। অপরাহ্ন তৃতীয় প্রহরের সময় দাসীর কলরবে, হুজুরের কাঁচা নিদ্রা ভাঙ্গিল। প্রাণ ভরিয়া সুধাপান করিয়া চুরূটের ধূম্রধ্বজা তুলিয়া দরবারে বার দিলেন। আমলা মোক্তার মামলাদার আদিতে আদালত পরিপূর্ণ হইল। হুজুরের প্রতাপে, বর্ষাকালের কোকীলের মত সকলেই নিস্তব্ধ, দেখিতে দেখিতে যেন হাবা বোবার হাট বসিয়া গেল। চক্ষুর ইঙ্গিত অঙ্গুলি সঞ্চালন আদি শঙ্কেতে শত শত টাকার বেচা কেনা হইতেছে। হুজুর দেখিলেন, দুইটা হতভাগা, অপরাধীর কাঠরায় খাড়া আছে। রাজপথে মারামারি করা অপরাধে, পুলিশ এই দুইজনকে ধরিয়া আনিয়াছে। ইহাদের নাম, রাম এবং শ্যাম। রামের মাথা কাটিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত। সে বলিল হুজুর! শ্যাম আমাকে পিছে হইতে লাঠি মারিয়াছে, আমি মূর্চ্ছা হয়ে পড়িয়াছিলাম। আমি মারি নাই, ঝগড়া করি নাই, উহাকে দেখি নাই। হুজুর বলিলেন, পড়িয়া গিয়াছিলে বলিয়াই মারিতে পার নাই, না হ'লে কি ছাড়িতে। তোমার নিজের কথাতেই তুমি ধরা পড়িয়াছ। আমি অবিচার করিতে পারি না, দুজনের দশ দশ টাকা জরিমানা হইল। তার পর একজন গাঁজা খোর ব্রাহ্মণের মোকদ্দমা উঠিল। গাঁজাখোরকে, একজন মাতাল কামড়াইয়াছে, তার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত। গাঁজাখোর মাতালকে পশু বলেন, ইহাতেই সে দন্তাঘাতে তার উত্তর দিয়াছে। মাতালের পঁচিশ টাকা জরিমানা হইল। আমলারা টাকা গনিয়া লইল। গাঁজাখোর ভাবিয়াছিল, সে কিছু টাকা পাইবে, কিন্তু তাহা হইল না দেখিয়া সে বলিল হুজুর। আপনিও কি শুঁড়ীর দোকান খুলিয়াছেন? আমি কি আপনার মদের পিপা! মাতাল বেটা আমার রক্তপান করিল, আর আপনি টাকা গুলি নিলেন। ইহার পরেই আমাদের যোগীরাজ অপরাধীর কাঠরায়

দাঁড়াইলেন। স্বয়ং জীবন বাবু হলপ করিয়া এজাহায় দিলেন, এই ভণ্ড উদাসীন, গভীর রজনীতে তাঁর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া চুরি করিতেছিল। তিনি উহাকে ধরিয়াছেন। জীবন আরও বলিলেন যে, এই চুরিতে দক্ষিণা দাসীর সম্পূর্ণ যোগ আছে। তিনি বয়প্রাপ্ত হইয়া বিষয় অধিকার করিয়াছেন, দক্ষিণা, বিষয় নষ্ট করায় তাঁর সঙ্গে মনান্তর হয়েছে। তিনি একটা পালক কন্যার মায়াতে পড়িয়া, এই সন্ন্যাসীর দ্বারা মূল্যবান সম্পত্তিগুলি স্থানান্তর করিতে ছিলেন।

দক্ষিণার চরিত্র, হুজুরের অবিদিত নাই। সে যখন চাঁদা দেয় নাই, হুজুরের অপমান করেছে, তখন তার অসাধ্য কি? তার সকল কাজেই অপরাধ।

এদিকে অভাগা যোগী সরল ভাবে সকল কথাই সত্য বলিল। বেলওয়ারি কাচকে সকলেই স্বচ্ছ বলে, কিন্তু বক্র চক্ষে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিলে, তাহাতেই আবার নানাবিধ রং দেখিতে পাওয়া যায়। হুজুর, সন্ন্যাসীর এজাহারে দক্ষিণার কলঙ্ক স্পষ্টই দেখিলেন। অভাগিনী বিধবার উপর গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির হইল।

নিশ্চিন্তপুরের কুলান্তক রায় এখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দক্ষিণা দাসীর চির শত্রু। দক্ষিণার দোষেই শত্রুতার সূত্রপাত হয়। রায় মহাশয় বলেন, তাঁদের জমিদারি পরস্পর সংলগ্ন। দক্ষিণা স্ত্রীলোক, প্রজাপালন জানে না, বাজে আদায় উঠাইয়া, প্রজাপুঞ্জকে পাপে ডুবাইল। তারা সঙ্গতিপন্ন হয়েছে, জমিদারকে ডরায় না। তিনি তাঁর প্রজাদের নিকট বাজে আদায় করিলেই তারা দক্ষিণার গ্রামে উঠিয়া যায়। বিধাতা পুরুষ যে, জমিদারকে এই ভূখণ্ড টুকু বিক্রয় করিয়াছেন, একথা প্রজারা ভুলিয়া গিয়াছে। সেই কুলান্তক রায় আজি আহ্লাদে অধীর হইয়া জীবন বাবুকে কোলে লইলেন। আর বলিলেন, বাপুহে! তুমি আমার অন্য পর নও, নিকট কুটুম্ব। তোমার পিতামহ আমাদের বাড়ীতে বিবাহ করিয়াছিলেন। তোমার দুঃখের কথা শুনিয়া বড় কাতর হয়েছি। রাধাকান্ত দেবের মন্দিরে, তোমার জন্য স্বস্ত্যয়ন করিয়াছি। আমি পরের জন্য প্রাণপণ করি, আর তুমি আমার ঘরের ছেলে। আঃ মাগী কি পাপিষ্ঠা।

জীবন আদরে গলিয়া গেল। গদ গদ স্বরে বলিল, আপনি আমার পিতা, আমি শরণাগত হলেম। আমার হাতে টাকা নাই বলিয়াই, এইরূপ করিতেছে, আমি পাকা পোষ্যপুত্র।

ভয় কি বাবু! দুই দিনে জমিদারি দখল করিবো, সে ব্যভিচারিণীকে দূর করিয়া দিবো। রায় মহাশয়ের এই কথায় জীবন মহা কুণ্ঠিত হইল। সতীর চরিত্রে কলঙ্ক দিতে সে এখনও শিখে নাই।

রায় মহাশয়ে সঙ্গে, গোস্বামী ঠাকুর ছিলেন। তিনি সময় বুঝিয়া বলিলেন, জীবন বাবু!

বৈষ্ণব প্রধান, পরম ভাগবত, কুলাঙ্গক রায় আপনার সহায় হলেন। আপনি কি এঁর ক্ষমতা জানেন না। যে রাধাকান্ত দেব শ্রীমতী রাধিকার কলঙ্কের বোঝা, জটিল কুটিলার ঘাড়ে চাপাইয়াছেন, তিনি পাতালের বলীরাজকে বঞ্চনা করে কর্ত্তার গৃহে বাঁধা পড়েছেন। প্রতিদিন এক মোণ তণ্ডুল ধ্বংশ কর্চ্ছেন। যদি তাঁব কৃপায় একটা সামান্য সতী নারী অসতী না হয়, তবে আর তাঁর মাহাত্ম্য কি; আমরাও যদি সাধারণ লোকের মত পাপ প্রতারণায় ডরাবো, তবে এই মালা জপ করি কেন? অসংখ্য অতিথি সেবায় কি ফল; বাপুহে! আমরা বৈষ্ণব, আমাদিগকে পাপের ভয় দেখাইও না। দিনান্তে একবার হরিনাম করিলে, শতকোটী জন্মের মহাপাপ ধ্বংশ হয়, আমরা দিবানিশি জপ করি, আমাদের পাপ কাটান দিলেও প্রতিদিন এত ফাজিল পাওনা হয়, পুরুষানুক্রমে পায়ের উপর পা দিয়া মনের সাধে মহাপাতক করিলেও ফুরাবে না। আর পরকালে গোলোকধাম কেহই ছাড়াবে না। তথাপি আমরা অকারণে পাপ করি না।

জীবন মোকদ্দমার দায়ে বিব্রত, ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ব তাঁর কাণে গেল কিনা সন্দেহ। তিনি বলিলেন, ইংরাজের আইন বড় কঠিন। মিথ্যা কথা ধরা পড়িলে নিস্তার নাই।

গোসাঞী, হা হা শব্দে হাসিয়া বলিলেন, বিধর্ম্মী ইংরাজের আইন মানিলে কি হিন্দুর হিন্দুয়ানি থাকে;

এই কর্ত্তা বাবুর বংশে আদ্যরস মহাব্রত আছে। আদ্যরস করিতে হইলে সপত্নীর উপরে কন্যা দিতে হয়। তার চেয়ে কন্যার মৃত্যু ভাল।

আমাদের এই কর্ত্তার কন্যাদান উপস্থিত হইলে, আমরা পণ দিয়া কুলীন পুত্র খরিদ করিয়া আনিলাম, তার পর আবার একটী কুলীন কন্যা খরিদ করিয়া তাহার বিবাহ দিলাম, তাতেই তার কুলক্রীয়া সম্পন্ন হইল। অবশেষে সেই পাত্রে কর্ত্তা বাবুর কন্যাকে সম্প্রদান করা হয়েছে। এখন সেই কুলীন কন্যাটী জীবিত থাকিলে কন্যাটীকে চিরজীবন দগ্ধ হইতে হয়। তবে আর খরিদ করায় ফল কি!

জীবন ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কন্যাটীর কি গতি হইল? গোসাঞী বলিলেন সে কি বাপু! আমরা বৈষ্ণব, আমরা কি সেই নিরপরাধা বালিকার অসদ্গতি করিতে পারি। দুই সহস্র টাকা খরচ করিয়া, তাহাকে প্রয়াগের ত্রিধারার পথে বৈকুণ্ঠ ধামে পাঠাইয়াছি, সে এই ভব যন্ত্রণা এড়াইয়াছে।

কিন্তু প্রভু রাধাকান্ত দেবের কৃপায় সে কথা কাক পক্ষীতে টের পায় নাই। একেই বলে, "যদি কৃষ্ণ পদে ভক্তি, কা চিন্তা মরণে রণে।"

গোষ্ঠী পতিরা যে, কুলব্রত পালনের জন্য, এইরূপে বালিকা বলিদান দেন, এ কথা জীবন বাবু পূর্ব্বেও শুনিয়াছেন, তখন ইহাদিগকে বড় ঘৃণা করিতেন, কিন্তু সাধু সমাগমের এমনি গুণ যে, দুই দণ্ডে মন পরিবর্ত্তন হইল। কিন্তু তিনি খাটি হিন্দু হইলেন কি না, সে কথা এখনও বলিতে পারি না, কেননা এই বিপদের সময়েও তিনি দুই একবার জলবালার বৈধব্য-যন্ত্রণা ভাবিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন।

সুচতুর কুলান্তক, জীবনকে, আপন বাড়ীতে আনিলেন। তাঁহার অনূঢ়া কন্যা হেমলতা পরমাসুন্দরী, তাহার সহিত জীবনের বিবাহ দিবার প্রসঙ্গও তুলিলেন। হেমলতার বয়ক্রম দ্বাদশ উত্তীর্ণ হয়েছে। জীবন জলবালার সৌন্দর্য্য ফাঁশে গলা জড়াইয়াছেন, কিন্তু নূতন তৃণ পাইলে বৃষভরাজ কি দড়ি ছেঁড়াছিঁড়ি করে না? জীবন আদ্যরসে উৎকৃষ্ট পাত্র। কুলান্তক ইহাকে ছাড়িবেন না, তবে তার পূর্ব্ব পত্নীর সদ্গতি না করিলে অধর্ম্ম হয়, এই জন্যই কিছু বিলম্ব হইতেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জগতে বাঙ্গালীর ন্যায় সুখী কোন জাতিই নয়। ইংরাজরাজ তাদের এই সুখ সৌভাগ্যের হেতু। গোয়ালার গোধনের ন্যায় ইংরাজের প্রজাই সর্ব্বস্বধন। এরা প্রজাকে সন্তানের অপেক্ষা স্নেহ করেন। যুদ্ধ বিগ্রহের কথা দূরে থাকুক পাছে প্রজার ননির শরীর গলিয়া যায় এজন্য বন্দুক বারূদ স্পর্শ করিতে দেন না। ক্ষেপা শিয়ালে তাড়া করিলে, তাঁরা বুক দিয়া রক্ষা করেন। প্রজাকে কিছুই করিতে হয় না। গাভি দুগ্ধ দেয়, গাভি-নন্দনেরা প্রাণপণে চাষ করে, তথাপি তারা কেন কুঁড়া বই আর কিছুই পায় না, কিন্তু বাঙ্গালীরা অন্নের স্বাদ জানে। বিধাতা, আরব দেশীয় উষ্ট্রের ন্যায়, নিকৃষ্ট পরিশ্রমের জন্যই যে ভারতবাসীকে সৃজন করিয়াছেন, তা তাঁরা বেশ বুঝেন। তবে কতকগুলি অদূর-দর্শী নিষ্ঠুর, স্কুল কলেজ আদি নানা উৎপাৎ ঘটাইয়া, ইহাদের ঘাড়ে বিষম বোঝা চাপাইতেছেন। কিন্তু প্রকৃত হিতৈষি বন্ধুরা সে কথা শুনিবেন কেন?

তাঁরা মনের সাধে আলালের দুলাল সাজাইবার চেষ্টায় আছেন। চিকণ বস্ত্র, কাচের খেলানা, নানাবিধ বিলাস দিব্য ঘরে ঘরে সাজাইয়া দিলেন। সাত সমুদ্র পার হইতে দেব দুর্লভ সুধা আনিতে লাগিলেন, কিন্তু তাতে কুলায় না, গরীব দুঃখীরা পায় না। সুতরাং হিতৈষির হৃদয়ে বাজিল। তাঁরা খোলাভাঁটির প্রস্রবণ খুলিলেন, সুধার স্রোত বহিতে লাগিল। আজি আবাল বৃদ্ধ বণিতা, ঊর্দ্ধ বাহু হইয়া নৃত্য করিতেছে, তাদের আনন্দের সীমা নাই।

নব নগরীর বসুবংশ ঘোর শাক্ত। দুর্গোৎসবের নবমীর বলীদানের পর কাদামাটির আমোদ এদের কুলাচার। বোধ হয় পূর্ব্বকালে রণোন্মত্ত আর্য্য-বীরগণ শক্তি সাধনে কোনরূপ আমোদ করিতেন, এই আমোদটা এখন বীরত্বের অভাবে কাদামাটি নাম লইয়া মাটি হইয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি আবার কপাল ফিরিয়াছে। সর্ব্ব-শক্তি-প্রদায়িনী সুরাদেবী, ভক্তের ভক্তিতে

গলিয়া ক্রুদ্ধ হলেন। জাহ্নবী একটী গিরি-শিখর আশ্রয় করিয়া আসিয়াছিলেন, একটী স্রোতেই আবদ্ধা আছেন। কিন্তু দ্রবময়ী সুরা, অসংখ্য খোলাভাঁটি হইতে শত শত মুখে বাহির হইতেছেন, দেশ প্লাবিত করিলেন। মা-জাহ্নবী এই অপমানে পৃথিবী ত্যাগ করিতেছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাঁর পুরাতন এগ্রিমেণ্ট বাহির করিয়া, বিপাকে ফেলিয়াছেন, আরো দ্বাদশ বৎসর কাল, তাঁরে পৃথিবীতে থাকিতে হইবে। তিনি নাচার হইয়া ক্ষীণ কলেবর ধরিয়া কালী ঘাটের পথে বাদাবনে লুকাইতেছেন।

পূর্ব্বকালে বীরত্বের দরুণ মত্ততা ছিল, এখন না হয় মত্ততার দরুণ বীরত্ব এই একটু সামান্য প্রভেদ, কিন্তু আমোদ যোল আনা। এবৎসরে নব নগরীর ভক্তেরা, খোলাভাটিতে শক্তি আরাধনা, করিতেছেন, এমন সময়ে দক্ষিণাদাসীর বাড়ীতে নবমীর বলীদানের বাজনা উঠিল। ভক্তেরা ভাবিলেন রণ বাদ্য। তৎক্ষণাৎ সেই শক্তি সঞ্চারিনী মহামারীকে, বগলে লইয়া সকলেই বীরবেশে বাহির হলেন। গ্রামের ভীরু কাপুরুষেরা দ্বার রুদ্ধ করিল, বীরেরা সেই পশু-ভাবাপন্ন গুলোকে লক্ষ্য করিলেন না। তাঁরা দক্ষিণার বাড়ীতে উপস্থিত। এই সময়ে দুইটা গাড়ি-টানা মহিষকে ধরিয়া টানাটানি হইতেছিল। এতক্ষণের পর সমকক্ষ যোদ্ধা মিলিল, এই ভাবিয়াই যেন সেই বীরের দল প্রথমত মল্লযুদ্ধ, পরে অসংখ্য খড়্গাঘাতে মহিষযুগলকে বিনাশ করিয়া বিজয় আহ্লাদে শত্রুর রক্তে বিভূষিত হইলেন। বিজিত বৈরির সর্ব্বস্ব হরণ না করিলে অঙ্গহীন হয়। এই জন্যই যেন, মহিষ এবং ছাগলের স্বভাব এবং স্বর, বিজেতাগণ আত্মসাৎ করিয়া বিজয়ম্নানে চলিলেন।

এদিকে জমিদার রায় মহাশয়ের বাড়ীতেও দুর্গোৎসব আছে কিন্তু তাঁরা গোস্বামী শিষ্য পশু বলীদান করেন না। তবে শোণিত-লোলুপা ভগবতীকে ভুলাইবার জন্য জবাফুল এবং রক্তচন্দন দেখাইতে হয়। কিন্তু গোস্বামী প্রভুরা ভুলিবার পাত্র নহেন, তারা বলেন প্রকৃতিদেবী বৈষ্ণব-ধর্ম্ম লোপ করার জন্যই জবাফুলে রক্ত মাখাইয়া রাখিয়াছেন, নতুবা এমন রং কোথায় পাবেন? এই স্পর্শ দোষ খালনের জন্য রায় বাবুরা প্রতি বৎসর নবমীতে, গঙ্গাস্নান করিয়া গুরুদেবকে যৎকিঞ্চিৎ রজত-মূল্য দক্ষীণা দিয়া শুদ্ধ হন। ঘটনা ক্রমে ইহারা স্নান করিয়া ফিরিয়াছেন, পথে বসু বাবুদের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

বন্ধু বাবুদের দলস্থ একটী যুবক নয়নে নীল চশমা লাগাইয়া প্রভুর এই অপরূপ মূর্ত্তি দেখিতেছিল, এমন সময় শিষ্য হরিদাস প্রভুর দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, ভোঁ ভোঁ রবে রামশিঙ্গা বাজাইল। রামশিঙ্গাটা কুঞ্জর শুণ্ডের মত উর্দ্ধে সঞ্চালিত হইয়া, চশমাধারীর নয়নে ধাঁধাঁ লাগাইল। তিনি ভাবিলেন বৈষ্ণবদের সুমতি হয়েছে, তারা বলি দিবার জন্য কুঞ্জর আনিতেছে। আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, দ্রুতবেগে যাইয়া গোসাঞীকে জড়াইয়া ধরিলেন। এদিকে প্রভুর হৃদয়ে নবনারী কুঞ্জর জাগিতেছে, তিনি ব্যগ্রভাবে বলিলেন "রে পাপিষ্ঠ! শীঘ্র ছাড় শীঘ্র ছাড়, নতুবা লীলা অঙ্গহীন হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে, বৎসাসুরের কথা লেখা আছে. এখানে ভীষণ বৃষাসুর তার কাঁধে চাপিয়াছে, ইহাতেই বোধ হয় ঐরূপ কথা বলিলেন।

এদিকে তার দেহের সেই রক্ত-কর্দ্দম প্রভুর ঘামে গলিয়া কুঞ্চিত দীঘল লোমের সঙ্গে জড়াইয়া গেল। প্রভু সহজে ছাড়াইতে পারেন না, মহা বিব্রত হলেন। ভক্তেরা চারিদিকে ছাড় ছাড় শব্দে গোল করিতেছে, কেহ বা দুই এক ঘা দিতেছে।

চশমাধারী, তখনও ভগ্নস্বরে বলিতেছেন, কেন বাবা! তোমরা কি বলিদান দিবে না? আচ্ছা, তোমাদের জানোয়ার ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

ভক্তবৃন্দ, রাধে! রাধে! বলিতে বলিতে কাণে হাত দিলেন। বন্ধু বাবুর এতক্ষণের পর চৈতন্য হইল। তিনি প্রভুর বদন নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, হাঁ বাবা! আমারি ভুল হয়েছে, এটা হাতী নয়।

বৈষ্ণবদল, বিষম বিপদ হইতে গুরুদেবকে উদ্ধার করিয়া অন্য পথে পলাইল। শাক্ত-দল গঙ্গায় নামিল। এই স্থলেই এ অঙ্কের শেষ হইবার কথা, কিন্তু ঠিক এই সময়ে দুই জনা বরকন্দাজ, দক্ষিণার বাড়ীতে সিধা পার্ব্বনির মোট বাঁধিয়া চৌকিদারের মাথায় তুলিয়া দিতেছিল। তারা স্বকর্ণে এই গোলযোগের শব্দ শুনিল। ইহাদের এই মহৎ গুণ যে, প্রাণান্তেও রাজকার্য্যে অবহেলা করে না। তারা উর্দ্ধশ্বাসে থানায় যাইয়া সংবাদ দিল। দুই দলে শত শত লোক লাঠি তলোয়ার লইয়া ঘোরতর দাঙ্গা হেঙ্গামা করিয়াছে কয়েকটা খুন জখম হইয়াছে, আমরা পূর্ব্ব পুণ্যবলে প্রাণ নিয়ে আসিয়াছি।

দারগা বাবু, তিলমাত্র বিলম্ব করিলেন না, রণক্ষেত্রের উদ্দেশে চলিলেন। তাঁর দ্রুতবেগ দেখিয়া, অজ্ঞ লোকেরা তর্ক বিতর্ক করিয়া বলিল, তাড়িত-যোগে এক ঘণ্টায় সাত দিনের পথে খবর পাঠান যায়, আবার বুঝি তাড়িতের পাল্কী হয়েছে। যাইবার কালে কূলান্ধক রায়ের গোমস্তার সঙ্গে, দারগার দৈবাৎ সাক্ষাৎ হয়। এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে, হতভাগিনী দক্ষিণা সেই চাঁদার দরুণ হুজুরের বিষনয়নে পড়েন। সেই জন্য পাছে লোকে সন্দেহ করে, এই ভয়ে দারগা বাবু গোমস্তার সঙ্গে মুখ তুলিয়া কথা কহিলেন না, তাঁর বিশ্বাসী মোসাহেব, গোমস্তার গলায় হাত দিয়া অনেক দূরে লইয়া যাইয়া তাড়াইয়া দিলেন।

দারগা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, চারি জনা চৌকিদার দাঁড়াইয়া আছে, কোন কথা না বলিয়া সেই গুলোকে প্রহার জুড়িলেন। তারাও কি বলিতেছিল, কিন্তু চর্ম্ম-পাদুকার চট-চটা শব্দে, সে কথা কেহ শুনিতে পাইল না। দারগা বজ্র-গর্জ্জনে বলিলেন, খুনের লাশ কোথায়? জখমীরা কোথায়? তোরাই সে সমস্ত গোপন করিযাছিস্। এই জন্তই থানায় সংবাদ দিস্ নাই। শীঘ্র আসামী হাজির চাই। অভাগারা গ্রামে কোন দুর্ঘটনা হয় নাই একথা বলিবার সময় পাইল না। তারা, আপাততঃ এই সুযোগে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য, বরকন্দাজ কয়জনকে লইয়া আসামী ধরিতে ছুটিল। অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে অন্য অন্য চৌকিদারেরা দারগার ইঙ্গিতে, চল্লিশ পঞ্চাশ খানা, বাঁশের খাদি জড় করিল। এগুলি ঘাটে মাঠে এবং মড়া শ্মশানে পড়িয়া মাটি হইতেছিল। এদেশে উপাধির প্রভাবে বৃত্তিশূন্য লোকেও রাজা, এবং রায় বাহাদুর হয়, আজি দারগা বাবু, এই জীর্ণ বাঁশ-গুলার গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য দাঙ্গার লাঠি, উপাধি দিলেন।

এদিকে শান্তিরক্ষক মহাশয়ের পদার্পণে গ্রাম নিস্তব্ধ। কেবল সেই দারগার বজ্র গর্জ্জনের উত্তর দিবার জন্য, গ্রাম সিংহেরা খেউ খেউ করিতেছে। নতুবা আর কাহারো সাড়া শব্দ নাই, সকলেরই সদর দ্বার বন্ধ। কিন্তু তাই বলিয়া কি বরকন্দাজ চৌকিদারেরা রিক্তহস্তে ফিরিতে পারে? অভাগা কৃষক কয়জনাকে মাঠে গ্রেপ্তার করিল। ভদ্র-লোকের মধ্যে গাঁজাখোরদিগের অসীম সাহস, বাহাদুরি তাদের জীবন-

সর্ব্বস্ব। তারা কি লুকাইয়া থাকিতে পারে, অম্লান মুখে হাত কড়ি পরিল। আর গুলিখোর দুই তিন জনা মৌতাতের দায়ে ধরা দিল। কিন্তু খোলা-ভাঁটীর দরজা বন্ধ আছে, বীরপুরুষ একজনও গ্রেপ্তার হইল না। দারগা বাবু এ পর্য্যন্ত বে-আইনী কার্য্য কিছুই করেন নাই, তথাপি দুইজন ইংরাজি-নবিশ উদ্ধত যুবক সহসা সম্মুখে আসিয়া তাঁর কার্য্য কলাপের ছল ধরিয়া তর্ক করিতে লাগিল। খবরের কাগজে লিখিবো, আদালতে আমরা সাক্ষ্য দিবো ইত্যাদি কথা বলিয়া নানা ভয় দেখাইল। কিন্তু বিধাতা এত অন্যায় সহিবেন কেন? তখনই সিধা-খোর বরকন্দাজ দুই জনা, এই বাবু দুইটীকে দেখিয়া চিনিল, এবং বলিল যে, এঁরাই দাঙ্গা করিতে হুকুম দিয়াছেন। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, বাবুরা তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার হলেন।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, গ্রামের ভদ্রলোকেরা দ্বার রুদ্ধ করিয়া লেপের মধ্যে কম্পজ্বর ভোগ করিতেছেন। কেহই বাহিরে আসিতে পারেন না। দয়ালু দরগা, তাঁদের দুঃখে কাতর হইয়া অন্তঃপুরে সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। আবার আইনে গৃহ তল্লের বিধান আছে, এ মোকদ্দমায় লাঠি তলোয়ার আদি অন্বেষণ জন্য গৃহতল্ল না করিলেই নয়। এক দিকে ভদ্রলোকের অপ-মান, অন্য দিকে আইন-বিরুদ্ধ কাজ। দারগা মহা বি-ব্রকে ঠেকিয়া ভাবিতে-ছেন, এমন সময়ে মা ভারতেশ্বরী, খণ্ড খণ্ড রজতে শত শত মূর্ত্তিতে দেখা দিলেন। দারগা তাঁর অভিপ্রায় বুঝিয়া পিছাইয়া পড়িলেন।

এই হুলস্থূলের সময়, কুলাঙ্ককের সেই গোমস্তা, পাঁচ খানি ডুলি সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন। ডুলি গুলিতে একটী একটী মনুষ্য শায়িত। তারা সাত ডাকে উত্তর দেয় না, মৃত কি জীবিত তা বুঝিতে পারা যায় না। ইহা-দের চর্ম্ম-ক্ষত, বা রুধিরপাৎ হয় নাই সত্য, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ দাগ চিহ্নে সুশো-ভিত। ছলগ্রাহী উকিলেরা এ গুলিকে, সীমলতা সংযোগে কৃত্রিম দাগ বলিতে চায় বলুক, কিন্তু সরল স্বভাব দারগার মনে সে সন্দেহ উঠিতে পারে না। বিশেষতঃ গোমস্তাটী তাঁর বিশ্বাসী পাত্র। গোমস্তা কাতর বাক্যে বলিল উপস্থিত আসামীরা ইহাদিগকে খুন করিয়াছে, ইহারা সকলেই দক্ষিণার লোক। দারগা কঠোর বাক্যে উত্তর দিলেন, ডাক্তার বাবুর সার্টিফিকেট ভিন্ন একথায় বিশ্বাস হয় না। গোমস্তা একখানি কাগজ দারগার হাতে দিয়া বলিল,

হাঁসপাতালের ডাক্তার বাবু বাড়ীতে যাইয়া চিকিৎসা করিতেছেন। তিনিই এই খানিতে লিখিয়াছেন, প্রত্যেক ব্যক্তির পঞ্জরাস্থি ভাঙ্গিয়াছে, আর চমৎকার ঔষধির প্রভাবে দুই দিনেই জোড়া লাগিবে। ইহাদের পাঁজরে প্রলেপ আছে তাহার উপরে কাপড় বাঁধা।

মড়া শ্মশানের বাঁশে মোকদ্দমাটীর, কাঠামো হওয়া অবধি ডাক্তার বাবুর দ্বারা অঙ্গরাগ এবং রং দেওয়া সমাপন হইল। বলীর পশুও অনেক গুলি সংগ্রহ হইতেছে, কেবল সাক্ষীর অভাব। কেননা চণ্ডী পাঠের জন্য শুদ্ধ সত্ব লোক চাই।

সাক্ষীর কথা উত্থাপন হওয়ায় দারগার বদন গম্ভীর হইল। যখন তখন তাঁর মনে পরকালের চিন্তা হইত, তাঁরে লোকে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর বলিত, তাঁর হাতে অনেকেরই প্রাণ গিয়াছে, চিত্রগুপ্ত খাতার পাতায় পাতায় সেই সকল কথা লিখিতেছে। অভাব পক্ষে দুইটী সাফাই সাক্ষী না হইলে, সেখানে দাঁড়াইতে পারিবেন না। আবার সেখানে মিথ্যা সাক্ষী চলিবে না। এক্ষণে এখানেও সাক্ষীর প্রয়োজন। তিনি একবারে ইহকাল পরকালের কাজ সারিবার জন্য আসামীদের মধ্যে তিন জনাকে বাছিয়া লইয়া নির্জ্জন গৃহে প্রবেশ করিলেন। ইহারা তিন জনে, দারগা বাবুর পাদুটী জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। দারগা ভাবিলেন চিত্রগুপ্তকে ভুলাইবার, সুযোগ উপস্থিত। তিনি দয়াধর্ম্মের কল্পতরু হইয়া, ঐ তিন জনকে বলিলেন, তোমাদের পরিত্রাণের উপায় ছিল না, কিন্তু আমি তোমাদিগকে সাক্ষী করিয়া দিতেছি। সত্য কথা না বলিলে, ইহকাল পরকাল থাকে না, এই কথাটী যেন মনে থাকে। উহারা ব্যগ্র হইয়া বলিল, আমরা দীন দুঃখী লোক, সত্য কথা জানিনা, আপনি কৃপা করিয়া শিখাইয়া দিউন। বলা বাহুল্য যে দারগাবাবু নিজেই তাদের দীক্ষা গুরু হলেন। আসামীরা সকলেই চালান হইল। পরদিনে ইহাদের বিচার হইবে।

প্রবাদ আছে যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাল বেতালের গুণে ত্রিভুবনের সঠিক সংবাদ পাইতেন ইহাতেই তিনি সর্ব্বত্র জয়ী ছিলেন আমাদের দারগা বাবু এবং পেস্কার মহাশয়, হুজুরের তাল বেতাল, এরা নির্জ্জনে কাণে কাণে মোকদ্দমার কাহিনী শুনাইতেন। সত্য বাহির করিবার জন্য তাঁর আর পরি-

শ্রম করিতে হইত না। কুটিল লোকেরা ইহাতেও বাধা দিতে ছাড়ে নাই, তারা বলিত কর্ত্তার প্রভাবে তাল বেতালেরা মিথ্যা প্রতারণা শিখিয়াছে। কিন্তু হুজুর সে কথায় কাণ দিতেন না।

হুজুর এই বর্ত্তমান মোকদ্দমার বিচার করিবার জন্য, এজলাসে বসিলেন। এবং আইন কানুনের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সমস্ত নিয়ম পালন করিলেন। কেবল উকীল মোক্তারের বক্তৃতায় কাণ দিলেন না। কেননা গুরু মন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনিতে নাই। আসামীরা সকলেই দীর্ঘকালের জন্য কয়েদ হইল। আর দক্ষিণা দাসী যে সকল অনর্থের মূল, তা তিনি বহুকাল পূর্ব্বেই জানিতেন; এই জন্য তার উপরে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির করিলেন।

ছলগ্রাহী দেশীয় কাগজগুলা, হুজুরের কতই নিন্দা করিল, কিন্তু সেকথা শুনে কে? ইংরাজী কাগজে বিলক্ষণ সুখ্যাতি উঠিল। হুজুর উপস্থিত মোকদ্দমা শেষ করিয়া, ভবিষ্যৎকালে শান্তিস্থাপনের জন্য দক্ষিণা দাসীর পক্ষীয় সমস্ত চাকরকে পুলিসের ক্ষমতা দিলেন। উড়িয়া মালী পর্য্যন্ত বঞ্চিত হইল না। কিন্তু হতভাগ্যরা, সে দেব-দুর্ল্ভ ক্ষমতা গ্রহণ করিল না, সকলেই ভয়ে পলাইল। কেবল পুরোহিত ঠাকুর ধরা পড়িলেন। পুলিস পুঙ্গবেরা তাঁর হাতে পরওয়ানা দিয়া, বরকন্দাজের পোষাক পরিতে বলিল। ব্রাহ্মণ কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল বাবা! আমাকে ছাড়িয়া দেও আমি রামায়ণ জানি না। ইহারা বলিল যে, ব্রাহ্মণ ভাবিয়াছে উহাকে নীল-বানর সাজিতে হইবে, সেই জন্য তারা হাসিয়া উত্তর দিল ঠাকুর; রামায়ণ চাইনা, দক্ষ-যজ্ঞ জানিলেই চলিবে, এটা ভুতের পোষাক।

অবোধ ব্রাহ্মণ বোধ হয় আতসী কাচের মর্ম্ম জানেন না। পোলীষের পোষাক আতসী কাঁচ বিশেষ, ব্রাহ্মণ প্রাণ বাঁচাইবার জন্য যতই ছট্‌ফট্‌ করিলেন ততই আইন বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ সবান্ধবে দগ্ধ হলেন। পরদিন সকলকেই, পুলিষের প্রতি বল প্রকাশ করার অপরাধে, হুজুরে চালান দেওয়া হয়।

এই ছল পাইয়া, কোন কোন ইংরেজি কাগজ দ্বারে দ্বারে নৃত্য করিতে করিতে গান ধরিলেন, বাঙ্গালীরা রাজকার্য্যের উপযুক্ত নয়। পোলিষের

গুরুতর ক্ষমতা, নবনগরীর প্রজাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু ভার সহিতে না পারিয়া পলাইয়া গিয়াছে। তথাপি এদেশের নির্লজ্জ সম্পাদকেরা উচ্চ উচ্চ পদের জন্য গবর্ণমেণ্টকে বিরক্ত করে। এই উপলক্ষে সাধারণ বিধি হওয়া উচিত যে বাঙ্গালীরা আর কার্য্যে নিযুক্ত হইতে না পারে।

যে অনল জ্বলিয়াছে, ইহাতে নবনগরী ছারখার হইবারই কথা। লঙ্কাদগ্ধে একটী ছিল, এখানে সকলে মিলিয়া লাগিয়াছে। তবে একটি বাঙ্গালী বারিষ্টারকে দেখিয়া, হুজুর স্বয়ং লাঙ্গুল গুটাইলেন ইহাতেই রক্ষা। ত্রিদিব-নাথ জজ সাহেব, হুজুরকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিলেন। কিন্তু পশু-হত্যা করা তাঁর কাজ নয়।

হাইকোর্টের জজ বাহাদুরেরাও ইহাকে স্পর্শ করিলেন না, উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হলেন। তাঁরা বলেন, হিংস্র পশুকে জীবিত রাখা উচিত কিনা বিধাতা তা বুঝিবেন, আমরা ইহাতে হাত দিব না। সুতরাং হুজুরের গর্ব্ব চূর্ণ হইল না, তিনি শীকারভ্রষ্ট, সার্দ্দূলের মত গর্জ্জন করিতে করিতে নবনগরীর দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

প্রবাদ আছে, জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য কাপালিককে শিক্ষা দিবার জন্য একটি প্রচণ্ড চপেটাঘাত করেন। কিন্তু তাতে কি হতে পারে; তার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বালিকা বলিদান দিলেই চামুণ্ডা সন্তুষ্টা হবেন। আমাদের হুজুর এ পথের কাপালিক, ঘোর বীরাচারী। অতি অল্প দিন পরেই আবার সেই দক্ষিনাকে হাতে পাইয়াছেন, তিন লক্ষ বলিদানের সংকল্প করিয়া পুজায় বসিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণ একাদশীর রজনী, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মা-গোসাঞীএর মত বিধবা মহলে দারুণ আধিপত্য কর্চ্ছেন। এদের শ্রদ্ধা ভক্তির ত্রুটি হইলেই নরকে যাইতে হয়। বিদায় করিবার যো নাই, কিন্তু মনের ইচ্ছা যে, পাপ গেলে বাঁচি। মা-গোশাঞীর ভৃত্যের সেই রাগ-ভরা গর্‌গরে মুখখানি অনেকেই দেখেছেন; সে কথা কহিলে যেন গায়ে আগুণ ছড়াইয়া দেয়। একাদশী নিশি, ভৃত্যের পরিবর্ত্তে দারুণ গ্রীষ্মকে সঙ্গে আনিয়াছেন। তার দৌরাত্ম্যে নিদ্রা ছুটিয়া পলাইয়াছে, তবে ক্ষুধা, তৃষ্ণার লজ্জা সরম নাই বলিয়া তারা বিধবাকে ছাড়ে না। ভিখারিণীর দশাই এইরূপ।

রজনীনাথ চন্দ্রমা, একেই তো বৃদ্ধ-দশায় ক্ষীণাঙ্গ, তাতে আবার গৃহিণীর এই নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখিয়া ক্রমে পাণ্ডুবর্ণ হলেন। এই দেখিয়াই যেন সূর্য্যদূত শুক্রঠাকুর তীব্র কটাক্ষ করিতেছেন। মৃতকল্প দক্ষিণা দাসী ইহাতেই সাহস পাইয়া জলবালাকে বলিলেন "বাছা! আর রাত্রি নাই, দশবার ইষ্ট-মন্ত্র জপ করিয়া, জল খাও।" ক্ষীণা জলবালার মুখে কথা সরে না, তথাপি সে সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে কোনমতেই জলস্পর্শ করিতে চায় না। "জলবালা বিধবা নয়," এই বলিয়া দক্ষিণা তার উপবাসে বাধা দিতেন, তিনি বলিতেন, সধবার একাদশীতে স্বামীর অকল্যাণ হয়। জলবালা, তাহাতে একটু হাসিয়া কুশাগ্রে গঙ্গাজল তুলিয়া জিহ্বায় দিতেন। বোধ হয়, সে এইরূপ বুঝিয়াছিল যে, যার অদৃষ্টে পতি-সেবা নাই, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহই তার মুখ্য কর্ম্ম।

এই সময়ে একটা কলরব শুনিয়া দক্ষিণা, জানালা খুলিয়া দেখিলেন বাহির বাড়ীতে লোকারণ্য হইতেছে। দারগা বাবু, কতকগুলা চৌকিদার। এবং বরকন্দাজ লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে উদ্যত। দক্ষিণার জমাদার রাজপুত তেজসিংহ, অনুচরবর্গকে লইয়া মাজের দ্বারে দাঁড়াইয়াছে। রাজপুতদের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়াই পুলিষ পুঙ্গব ভয়ে আড়ষ্ট হলেন, তাহাদিগকে ঘাঁটাইলেন না। কেবল একখানা কাগজে কি লিখিয়া একজনকে বরকন্দাজের হাতে দিলেন। বরকন্দাজ চলিয়া গেল। তার পর আধ ঘণ্টার মধ্যে একটা ইংরাজ যুবক অশ্বারোহণে উপস্থিত হইলেন। ইনি পুলিসের বড় সাহেব। ইনি সৈনিক

পুরুষ। এ পর্য্যন্ত এঁর ভাগ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটে নাই। ইনি বাঙ্গালা ভাষা বুঝেন না। দারগা বাবুও ইংরাজির বর্ণমালা জানেন না; তবে গোটাকতক ইংরাজি কথা অভ্যাস করিয়াছেন। আমাদের জীবনধন বাবু, কারকুন কুট্টিল দত্তকে লইয়া এখানে উপস্থিত ছিলেন। এঁরা কয়জনে মিলিয়া যা কিছু ইংরাজি কথা জোট পাট করিলেন, তাহাতে সাহেব ইহাই বুঝিয়া লইলেন যে, জীবন বাবু এই বাড়ীর মালিক, রাজপুত তেজসিংহ প্রভৃতি লাঠিয়ালেরা, এই বাড়ীতে ডাকাইতি করায় দারগা উহাদিগকে ধরিতে আসিয়াছে, কিন্তু কায়দা করিতে পারিতেছে না এবং অন্তঃপুরে অন্য ডাকাইতেরা আছে, সকলে জুটিয়া লড়াই করিবে।

অভাগ্য তেজসিংহ সাহেবকে দেখিয়া ভাবিল, ধর্ম্মবতার আসিয়াছেন, আর ভয় নাই। তার হাতে লাঠি তলোয়ার ছিলনা, একখানি গাঁজাকাটা ছুরি ছিল; সে সেইখানি দেখাইয়া, উচ্চৈস্বরে বলিল, "সাহেব! দারগা বাবু অবিচারে গলায় ছুরি দিতে আসিয়াছেন; আপনি সুক্ষ্ম বিচার করুন।" তেজসিংহ এই কথা বলিতে বলিতে সাহেবের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সাহেব আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। পিস্তলের কল টিপিলেন, অমনি গুলি তার হৃৎপিণ্ডভেদ করিয়া যেন বুঝিতে পারিল যে সে নির্দ্দোষী; তাতেই সেই প্রস্তর হৃদয় পিস্তল আক্ষেপে ঘোর আর্ত্তনাদ করিল কিন্তু সাহেবের আহ্লাদের সীমা রহিল না। তেজসিংহের মৃতদেহ ধুলায় লুটিতে লাগিল তার সঙ্গীরা বাঁধা পড়িল। সাহেব হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন। কালীয় নাগের মস্তকে ভগবানের চরণ চিহ্ন দেখিলে গরুড় পর্য্যন্ত মাথা হেঁট করেন, কিন্তু কালীয় সুবিধা পাইলেই ক্ষুদ্র পাখীর ঘাড় ভাঙ্গে। পোলিস পুরুষদের মস্তকে ভারতেশ্বরীর পদচিহ্ন তাদের ভয় কি? তারা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণাকে গ্রেপ্তার করিল। জলবালাকেও ছাড়িল না; ইহার পরেই গৃহতত্ত্ব আরম্ভ হইল।

জীবন বাবুর এজাহারে মালামাল স্থানান্তর হওয়ার কথা নাই; কিন্তু তা না হইলে চুরি সিদ্ধ হয় না। বিচক্ষণ দারগা মোকদ্দমাটী অঙ্গহীন রাখিতে পারেন না, এই জন্যই বোধ হয় খানা তল্লাশীর ভান করিলেন। নতুবা ইহার প্রয়োজন ছিলনা।

দারগার কার্য্য সমাপ্ত হইল। কারকুন দুখানি পাল্কি আনিয়া দিলেন। দক্ষিণা এবং জলবালা তাহাতেই উঠিয়া বসিলেন। দক্ষিণার দেওয়ান প্রভৃতি আমলারা সকলেই গা-ঢাকা দিয়াছিলেন, এক্ষণে ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিলেন এবং দেখিলেন, জীবন বাবু ঘোর জাঁক জমকের সহিত কাছারি ঘরে বসিয়া দরবার করিতেছেন। কারকুন, সকলকে শুনাইয়া জীবনবাবুকে বলিলেন, মহাশয়! দক্ষিণা ঠাকুরুণ স্ত্রীলোক, উনি আমাদের মন্ত্রণায় মারা পড়িতেছেন। আপনি উঁহাকে ক্ষমা করুন। দারগা এই কথায় মহা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, এক্ষণে জীবনবাবুরও হাত নাই। দেওয়ানজি এ কথার ভাবার্থ বুঝিতে পারিলেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপারটা কি?

কারকুন সুযোগ বুঝিয়া, বলিতে লাগিলেন। মহাশয়! আপনারা এ পর্য্যন্ত এই কাঙ্গালের কথা গ্রাহ্য করেন নাই। এখন সর্ব্বনাশ উপস্থিত। জীবন বাবু পোষ্য-পুত্র, উনি আপনার বিষয় বুঝিয়া লইলেন, সর্ব্বাধিকারী হইলেন তাতে আমাদের কিছুই ক্ষতি নাই, কিন্তু গৃহিনী ঠাকুরুণ যে জেলখানায় যাইতেছেন, ইহাতেই আমাদের বুক ফাটিতেছে। দেওয়ানজি এখনও তার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, কিছুই বুঝিলেন না, কিন্তু কারকুনের বিষন্ন ভাব, সজল নয়ন, এবং অন্য অন্য কাণ্ড কারখানা দেখিয়া তাঁর বুদ্ধি লোপ হয়েছে।

কারকুন সর্ব্বসমক্ষে গুপ্ত কথা প্রকাশ করিবেন না, এইরূপ ভান করিয়া বাহিরে উঠিয়া গেলেন। দেওয়ানজি প্রভৃতি তাঁর পশ্চাদ্বর্ত্তী হ'লেন এবং বিরল স্থানে তিনি বলিলেন, জীবনধন, কুলাঙ্গক রায়ের পরামর্শে, লাট সাহেবের গৃহিনীর পা দুটী জড়াইয়া ধরে, তাঁরে মা বলিয়াছে। আরো কতপ্রকার যোগাড় করিয়াছিল, তা আমি সকল সংবাদ পাই নাই, কিন্তু সেই যোগাড়ের ফলে, দারগা উহাকে বিষয় দখল দিলেন। আর জীবনের ধন সম্পত্তি এবং মূল্যবান সামগ্রী, দক্ষিণা দাসী গোপনে গোপনে স্থানান্তর করিয়াছেন বলিয়া, ওঁকে জেলে দিবার হুকুম হইয়াছে; না হলে কি ইংরাজের মুলুকে কেহ মানুষ খুন করিতে পারে? আমাদের ভাগ্যে যে কি আছে তাহাও বলিতে পারি না। আমি বিষম বেগতিক দেখিয়া উহাদের খোষামোদ করিতেছি।

কারকুনের কথায় সকলেই ভয় পাইল; ক্ষণকাল পরে উহারা যখন দেখিল, দারগা প্রভৃতি সকলেই চলিয়া গিয়াছে। তেজসিংহের মৃতদেহ স্থানান্তরিত হইয়াছে, তখন উহারা সকলে মিলিয়া কারকুনকে অগ্রে লইয়া জীবন বাবুর নিকটে উপস্থিত হইল। কেবল দেওয়ানজি, এবং আর দুই একটী আমলা ইহাদের সঙ্গে ছিলেন না। খাজাঞ্চি, চাবির গুচ্ছ জীবনের পায়ের নিকটে ফেলিয়া দিয়া, যোড় হাতে বলিলেন বাবুজি। এত দিনের পর আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। খাজাঞ্চির পার্শ্বে পুরোহিত ঠাকুর দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি খাজাঞ্চির কথা চাপা দিয়া ব্যগ্র ভাবে বলিলেন, আমি এক মোণ দুগ্ধের ঘৃত পরমান্ন মানসিক করিয়াছি তদুপযুক্ত পূজার আয়োজন চাই, আমাকে শীঘ্র বিদায় করুন। উপস্থিত অনুচরবর্গ একে একে সকলেই বলিল যে, তাহারা কেবল জীবন বাবুর জন্যই ধন প্রাণ পুষিয়া রাখিয়াছে, তিনি ইঙ্গিত করিলেই ছাড়িয়া দেয়।

জীবনের দক্ষিণ ভাগে জটিল দত্ত বসিয়াছিলেন, জটিল কুলান্তক রায়ের প্রধান মন্ত্রী, সম্প্রতি জীবনের সহচর। সেই জটিল, জীবনকে ভৎর্সনা বাক্যে বলিলেন, তুমি নিতান্ত অবোধ বাড়ীর মধ্যে এতগুলি গুপ্ত বান্ধব ছিল, তাহা না জানিয়া ইহাদের ঘোর সর্ব্বনাশ করিয়াছ। লাট সাহেবের কোপে রক্ষা করা কি সাধারণ কথা। মূর্খ কুটিল আপনার পায়ে আপনি কুড়ালি মারিয়াছে। তথাপি পোষ্য-পুত্র সম্বন্ধে মুল দলিলখানি বাহির করিয়া দিলেই উহার পরিত্রাণ হইতে পারে, কিন্তু এই ভদ্র সন্তানগুলির উপায় কি, পাপীর সংসর্গে কি ধার্ম্মিকগুলি মারা যাবে? আমলারা ব্যগ্রভাবে বলিল, মহাশয়! রক্ষা করুন। আমরা চিরকাল বাবুর পক্ষে আছি। জটিল বলিল, মুখে বলিলে চলিবে না, কাজে প্রমাণ দেখাইতে হইবে নতুবা তেজসিংহের যে গতি, অনেকের সেই গতি হইবে।

অকারণে মানুষ খুন কেহ কখন দেখে নাই। সুতরাং তেজসিংহের মৃত্যুতে সকলের হরিভক্তি উড়িয়া গিয়াছে। আইন আদালতের আশা ভরসা বাণে ভাসিয়া গেল। ইহারা ভয়ে আকুল হইল, বলিল মহাশয়! আমাদিগকে যাহা করিতে বলিবেন, আমরা তাহাতেই প্রস্তুত আছি। আমরা আপনাদের আজ্ঞাকারী ভৃত্য, বাবুর কার্য্যে যদি পরকালে নরকে যাইতে হয়

তাহতেও স্বীকার।" জটিল দত্ত মহা বিরক্ত হইয়া বলিল, আমরা অধর্ম্ম করাইতে আসি নাই। মিথ্যা চাতুরি জানি না। সত্য পথে আছেন বলিয়াই জীবন বাব্ বিষয় পাইলেন। ত্রিভুবনে কাহারও সাধ্য নাই যে, ইহার উপর দন্ত-স্ফুট করেন, তবে তোমরা রক্ষা পাইলেই বাঁচি; তোমরা পুরাতন লোক তোমাদিগকে ছাড়াইতেও ইচ্ছা নাই।

দত্তদ্বয়ের নীতি-লতা ফলবতী হইল। জীবন বাবু নির্ব্বিরোধে প্রকৃত অধিকারী হইয়া বসিলেন। তাব হুকুমে খাজাঞ্চি যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতেছেন। গোমস্তা, পাইক এবং প্রজাবা থরে, থরে নজর ধরিল। কিন্তু কর্ম্মচারী বর্গ এখনও নিশ্চিন্ত নয়, আপনাদের প্রাণ বাঁচাইবাব জন্য কুটিল দত্তকে লইয়া, বিরলে পরামর্শ আঁটিতে বসিল; ইহারা যে চিরকাল জীবনের সাপক্ষ ইহাই দেখাইবার জন্য ব্যগ্র।

সুচতুর কুটিল দত্ত একখানি দলিল বাহির করিয়া বলিল, "এইখানি আমাদের মৃত-সঞ্জীবনী পত্র। এই দেখ দেওযানজি স্বহস্তে সমস্ত লিখিয়াছেন। স্বয়ং দক্ষিণা ইহা রেজেষ্টরি করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে দক্ষিণা ঠাকুরুণ পোষাপুত্র স্বীকার করিয়া, সমস্ত সম্পত্তি জীবন বাবুকে বুঝাইয়া দিয়া বিপাকে পড়িয়াছেন। জলবালা মাসে পঁচিশ টাকা এবং দক্ষিণা একশত টাকা পাইবে; এই দেখ জলবালা স্বয়ং দস্তখত করিয়াছে। যে দিন রেজিষ্টরি হয় সে দিন ঠাকুরুণটী আঁধারপুরের বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন, সেখানে অধিক জমিদারী, সুতরাং সেখানেই রেজিষ্টরি হয়। কিন্তু রেজিষ্টরি হওয়ার পর দিনেই, জলবালাকে লইয়া জীবন বাবুর সঙ্গে বিবাদের সূত্রপাত। জীবন যুবা, এবং জলবালা যুবতী, উভয়েই বয়স দোষে মাতিয়াছিল; গৃহিণীর তাহা সহিল না, তিনি এই দলিলের কথা চাপিয়া গেলেন। এই জন্য তোমরা কেহই জানিতে পার নাই। আমরা কেবল গিন্নীর খাতিরে ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছিলাম কিন্তু আর পারি না।"

কর্ম্মচারীবর্গ, দলিল খানি দেখিয়া বলিতে পারিল না যে এখানি দেওয়ানজির লেখা নয়। আর অন্য আমলা, যারা দেওয়ানজির সঙ্গে অনুপস্থিত তাহারও সকলমে সাক্ষী হইয়াছে, তাদের হস্তাক্ষর ইহারা বিলক্ষণরূপে চিন্নিল।

খাজাঞ্চি জিজ্ঞাসা করিল, "ইহাতে আমাদের অব্যাহতি কিরূপে সম্ভবে ?" কুটিল বলিল, তোমরা দুর্গা বলিয়া ইহাতে সাক্ষীর শ্রেণীতে একটা নাম লিখিয়া ফেল। রেজেষ্টরি-আফিসের নকল বহির সঙ্গে মিল রাখিবার ভার আমার রহিল সত্যপথে থাকিলে কোন ভয় নাই। দক্ষিণা ঠাকুরুণ সেই দ্বিচারিণী জলবালার জন্য অধর্ম্মে মন দিলেন বলিয়াই জেলে গেলেন, তেজ-সিংহ প্রাণে মরিল, দরওয়ানেরা বাঁধা পড়িল। এতক্ষণে দেওয়ানজি প্রভৃতির কি দশা হইয়াছে তা ভগবানই জানেন, স্বয়ং লাট সাহেব জীবন বাবুর সাপক্ষ, একি সাধারণ কথা !

কর্ম্মচারীরা আর ভাবিতে সময় পাইল না ; অগ্রে নাম সহি করিবার জন্য পরস্পরে কলম কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল।

ধর্ম্মপথে আসিবামাত্র, জ্ঞানাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। কর্ম্মচারিরা অনেক গুলি খাতা পত্র দগ্ধ করিয়া দক্ষিণার নাম লোপ করিলেন। কথিত দলি-লের দিন হইতে জীবন বাবুর নামে নূতন কাগজ প্রস্তুত হইল।

কুটিল, এবং জটিল, পরস্পর মাসতুত ভাই—ইহারা দুজনেই সরস্বতীর বর-পুত্র, মা ইহাদিগকে কাম্য-কলম দিয়াছেন। ইহারা বিধাতার হস্তাক্ষর দেখিতে পায় না বলিয়াই কপালের ফলাফল জাল করিতে পারেন নাই ; বোধ হয়, বিধাতা, ইহাদের ভয়েই ললাট চামড়া ঢাকা দিয়া রাখিয়াছেন।

বাহকেরা বাজারে পাল্কী দুখানি নামাইয়া অপেক্ষা করিতেছে। নব-নগরীর অনেক লোক চারিদিকে দাঁড়াইয়া হাহাকার করিতেছিল ? বরকন্দাজ দের তাড়া খাইয়া, উর্দ্ধশ্বাসে পলাইল। কেবল বৃদ্ধ দেওয়ানজি, কুগ্রহবশতঃ পলাইলেন না। দক্ষিণা চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে তাঁরে বলিলেন "কাল একাদশী গিয়াছে, আজি এ পর্য্যন্ত জলবালা জলস্পর্শ করে নাই।" দেওয়ানজি ব্যগ্রতার সহিত যৎকিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন আনিয়া জলবালাকে দিতে-ছিলেন, বরকন্দাজেরা বাধা দিল। দেওয়ানজির আর সহ্য হইল না, বলি-লেন, পাপিষ্ঠ চণ্ডালেরাও যে পাখী ধরিয়া আহার দেয়। তোদের জন্যই ইংরাজ রাজ্যের কলঙ্ক। তোরা বিচার অঙ্গের খোশ্ পাঁচড়া। এই পাপ চর্ম্মরোগে আদালত অস্থির। ঈশ্বর যদি এই বিচার শক্তির অস্থি মজ্জাকে কুশলে রাখেন, তবে এই অত্যাচার সহজে মিটিবে না। আমি হাইকোর্ট পর্য্যন্ত

দেখিবো।" দেওয়ানজির মুখে সকল কথা বাহির হইল না, পশ্চাৎ হইতে দারগা বাবু ইঙ্গিত করিবামাত্র, বরকন্দাজ জরবণ খাঁ, দেওয়ানজিকে ধরিয়া হাতে হাতকড়ি লাগাইল; বৃদ্ধ কেবল আপনার মুখের দোষে সেই গুরুতর মোকদ্দমার প্রধান আসামী হইলেন।

অপরাধটা যে কি তা আমরা পাঠককে বলি নাই। তজ্জন্য আমাদিগকে দোষ দিবেন না, কেননা স্বয়ং দারগা বাবু এ পর্য্যন্ত সে কথা জানেন না। তবে তাঁর ধর্ম্মের সংসারে, ইনি কখনই বঞ্চিত হইবেন না। পিনাল কোডের একটা ধারা অবশ্যই খাটিয়া যাইবে।

নিন্দুকেরা বলিয়া থাকে যে, দয়া মায়াকে দ্বৈপায়ন হ্রদে ডুবাইয়া পুলিসের কাজে প্রবেশ করিতে হয়, কিন্তু দারগার স্বভাব সেরূপ নয়। তিনি জলবালার উপবাসের কথা শুনিয়া, স্বহস্তে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন লইয়া, হঠাৎ তার পাল্‌কীর দ্বার খুলিলেন। বালিকা, বস্ত্র সম্বরণের অবকাশ পাইল না, তার মুখমণ্ডলে দারগার তীব্র কটাক্ষ পড়িল। সে চক্ষু মুদিয়া বদনে বসন চাপা দিল। এখানে কেহ কবি থাকিলে, তিনি বলিতেন, সুমেরুর স্বর্ণ চূড়া, বিদ্যুৎপাৎ ভয়েই তুষারাবৃত থাকে। কথাটী নিতান্ত অসঙ্গত নয়, কেননা দারগার সেই বিদ্যুৎবৎ কটাক্ষপাতের পরেই তিনি যে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সেই বালিকার পক্ষে বজ্রপাৎ সদৃশ; সে জ্ঞানহারা হইয়া পাল্কীর কোনে মুখ লুকাইল।

অল্পবোধ বালিকা, অনুগ্রহ বুঝিল না, দেখিয়াও দারগা বিরূপ হইলেন না। মহতের উদার স্বভাব, তিনি উপকার না করিয়া ছাড়িবেন কেন? তাহাতেই উপযাচক হইয়া বলিলেন, "আমি দারগা, আমার অসাধ্য কিছুই নাই। আমার কলমে খুণ উড়িয়া যায়, আবার বিনা খুনেও ফাঁশি হয়। আমার কোপে পড়িয়াই দক্ষিণা জেলে চলিল, তার আর রক্ষা নাই, কিন্তু আমি তোমাকে বাঁচাইয়া দিলাম। আমার আশ্রয় লইলে, আমার বাধ্য হইলে, শত শত দক্ষিণা দাসী তোমার পায়ের তলে লুটাবে।" ইহার পরেই দারগা, অন্য সকলকে লইয়া কাছারীর পথে চলিলেন। জলবালার পাল্কী খানি অন্য পথ ধরিয়া দারগা বাবুর বাসা বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইল। দারগার মদিরা-সহচর রামঠাকুর সঙ্গে ছিলেন, তার কণ্ঠস্বর শুনিয়া, একটি

পঞ্চবিংশতি বর্ষীয়া যুবতী বাহির হইয়া পাল্কীর দ্বার খুলিলেন ; জলবালা তার মুখ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। রামঠাকুর সুরসিক লোক, তিনি হাসিয়া বল্লেন, "বাছা ভয় নাই, এর বদন-মণ্ডল উজ্জ্বল তাম্রবর্ণ হয়েছে বটে, কিন্তু ইহা অনল নয়। আর যে গুলি পোড়া ঘুটের মত দেখিতেছ সেগুলি নিবীড় মেছেতা। ইনি সুধার প্রভাবে রক্ত-চামুণ্ডা হয়েছেন, কালক্রমে আবার তিমির বরণী হবেন। কোন সময়ে এই বদনে কামদেবের রাজধানী ছিল, মন্মথ-দেব চামুণ্ডা মূর্ত্তি দেখিয়া, গা-ঢাকা দিয়াছেন। ত্রিবঙ্ক অঙ্গারের মত যাহা ঝুলিতেছে, তাহা দগ্ধভ্রূ নহে, ইহাই সেই কাম-কার্ম্মুক। তারকা দুটী উত্তাপে বিবর্ণ হয় নাই ; কাম-দূত ভ্রমর-যুগল, প্রভু বিরহে মৃতকল্প, উহাদের আর সে চঞ্চল ভাব নাই। কটাক্ষ-শর ছাই হইয়া উঠিয়া যায় নাই, চক্ষের গহ্বরে ডুবিয়া আছে।"

জলবালা, ব্রাহ্মণের মধুর শ্লেষ বুঝিল না, সে সাহসে ভর করিয়া যুবতীকে জিজ্ঞাসিল, "বাছা! আমাকে কোথায় আনিয়াছে?" যুবতী, এক মনে এক খানি রুমাল দেখিতেছে ; সে জলবালার কথার উত্তর দিল না। এই রুমালে দারগা বাবু, মিটাই বাঁধিয়া পাল্কীতে দিয়াছিলেন। যুবতী সে রুমাল খানি চিনিল, এবং একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল, নিশ্বাসের সঙ্গে একটু বক্র হাসিও আছে, অথবা ইহা, হাসি কি নিশ্বাস, তা আমরা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। বৈজ্ঞানিকরা উপস্থিত থাকিলে হয়তো বলিতেন যে উহার অন্তর ভেদ করিয়া বিষবাষ্প উঠিল।

জলবালা আবার সুধাইল, "বাছা! আমি কোথায় আসিয়াছি? সে দারগা কি এখানে আছে?"

যুবতী এবারেও উত্তর দিল না বরং নিজে প্রশ্ন করিল, "তুমি সধবা না বিধবা?"

জলবালা বলিল, "তা আমি ঠিক জানি না, কিন্তু বোধ হয় বিধবা"। "হা হতভাগিনী! তাই বলিয়া কি মদে তৃষ্ণা নিবারণ হয়" এই বলিতে বলিতে জলবালার হাত ধরিয়া যুবতী বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দক্ষিণা দাসী, দারগা বাবুর স্বভাব-সিদ্ধ দয়ার মাহাত্ম অগ্রে জানিতে পারেন নাই। এক্ষণে একটা নির্জ্জন পুর মধ্যে উপস্থিত হইবামাত্র, দারগা বাবু তাঁরে বলিলেন, "মা পাপ চাকরির অনুরোধে আপনাকে অতিশয় কষ্ট দিয়াছি। প্রকাশ্যভাবে যত্ন করিতে পারি না। কালি একাদশী গিয়াছে, আজি এই খানেই স্নান করুন, দ্বাদশী অধিকক্ষণ নাই, শীঘ্র পারণ না করিলে আমাকেও নরকে যাইতে হবে।" দক্ষিণা কথঞ্চিৎ আশ্বস্তচিত্তে বলিলেন "বাবা! প্রাণ রাখিতে ইচ্ছা নাই, বিষ পাইলে এই অপমানের সমাধা করি। হা ভগবান! নিরপরাধে এত পীড়ন! কোম্পানির রাজ্যে কি বিচার নাই।"

দারগা কাতর গদ-গদ স্বরে বলিলেন "মা! ম্লেচ্ছ যবনের আবার দয়া ধর্ম্ম কোথায়; গো খাদকের রাজ্যে কি বিচার আছে? আমাদের হাকিমের খ্রীষ্টানি ভাব। এঁর নিকট সত্য কথা বলিলে আর নিস্তার নাই, ইনি তাঁর সর্ব্বনাশ করিয়া ছাড়েন। মা! আমি অপনাকে পাল্কীতে আনিয়া মান রক্ষা করিয়াছি, কিন্তু তাঁর নিকটে জাতি কুল রক্ষা করিতে পারিলে বাঁচি। জেলে পাঠাইলে তো আর রক্ষা নাই। দারগা মাথায় হাত দিয়া অধোমুখে ভাবিতে লাগিলেন।

দক্ষিণা জমিদারি রক্ষা করেন, মাম্‌লা মোকদ্দমা ও হয়, কিন্তু পাপ ফৌজ-দারী মোকদ্দমায় কখন ঠেকেন নাই। কারকুন দত্তজার প্রতি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস আছে। দত্তজ তাঁর আদালত সাগরের কর্ণধার। বাস্তবিক দত্তজ যে একজন কৌশল পণ্ডিত তার আর ভুল নাই। কেননা এই মহৎ গুণ না থাকিলে, তিনি উভয় পক্ষের হৃদয়-বন্ধু হইতে পারিতেন না।

দক্ষিণা এই উপস্থিত বিপদে দিশা-হাবা হইয়া সেই দত্তজাকেই ভাবিতে-ছেন। এমন সময়ে দারগা বাবু বলিলেন, "দাদা কোথায়? আমি তো চাক-রির প্রত্যাশা ছাড়িয়া দিয়াছি, এখন আবার দুই দিক না যায়। আমি তাঁর জন্যই নির্জ্জন স্থানে আসিয়াছি, ইহার পর আর সাক্ষাৎ হইবে না। এই সময়ে আসিয়া পরামর্শ করুন। কায়স্থ কন্যাকে রক্ষা করা চাই।"

"দাদাকে ?" এই কথা দক্ষিণা জিজ্ঞাসা করায়, দারগা চুপে চুপে বলিলেন, আপনার কারকুন আমার দাদা। সাবধান ! প্রকাশ না হয়। একথা কেহই জানেন না, জানিলে চাকরি থাকেনা।

এই সময়ে বনাতে বদন ঢাকিয়া, মাহাত্মা কারকুন উপস্থিত হলেন। তাঁরে দেখিয়া, দক্ষিণার স্নান এবং পারণের আপত্তি রহিল না। কারকুন দারগাকে ভৎর্সনা বাক্যে বলিলেন, এই সামান্য বিষয়ে তোর এত চিন্তা ? কেন দারগা উত্তর করিলেন, ভাইপোর ধন চুরি করা কি সামান্য কথা ? আপনি এঁরে না বলিয়া আমাকে বিপদে ফেলিয়াছেন। আমারওতো মা। মায়ের জাতি কুল লইয়া টানাটানি।

কারকুন হাসিয়া বলিলেন, "ভাইপো নহে, ইনি জীবনকে পোষ্যপুত্র লইয়া প্রতিপালন করিয়াছেন।"

"কিন্তু পোষ্য-পুত্র অসিদ্ধ, যাগ-যজ্ঞ হয় নাই" দক্ষিণার মুখে এই কথাটি বাহির হইবামাত্র, দারগা আবার মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। আর বলিলেন, "আপনি যতই ভরসা দিউন, আমি দশদিক অন্ধকার দেখিতেছি। জননীর জাতিকুল রাখিতে পারিলাম না। কি সর্ব্বনাশ ? যিনি তেজসিংহকে স্বহস্তে গুলি করিয়াছেন, তঁারে কি চিনিতে পারেন নাই।"

দস্তজা বলিলেন "মা ! উপস্থিত বিপদে উদ্ধার হইলে পর, জীবনকে তাড়াইয়া দেওয়া বেশী কথা নয়। এক্ষণে তুই একটা মিথ্যা না বলিলে, এই মূর্খ হাকিমটাকে ভুলাইতে পারিবে না।

অবোধ দক্ষিণা, কোনক্রমেই এই হিতোপদেশের মর্ম্ম বুঝিল না। কারকুন মহা বিরক্ত হইয়া বলিলেন "মা ! অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে ভগবতী নিজে পথ দেখিতে পান না, কিন্তু সিংহ পৃষ্ঠে আরোহণ করিলে আর কোন বাধা থাকে না, সিংহ অন্ধকার রাত্রে বেশ দেখিতে পায়। আমরা আপনার যুগল সিংহ হাজির। হয় আমাদের পরামর্শ অনুসারে চলুন, না হয় বিদায় দিউন।" কারকুন চক্ষে বসন দিয়া ঘাড় হেট করিলেন। দক্ষিণা আর দ্বিরুক্তি করিলেন না ; চক্ষু মুদিয়া কর্ণ পাতিয়া রহিলেন। কারকুন কি মন্ত্র দিলেন, তা বলিতে পারি না। আমরা তা শুনিতে পাই নাই।

নবনগরীর ক্ষুদ্র হুজুরের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় আছে, তিনিই চেয়ারে

বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতে করিতে, সেই নিরীহ মুটেটীর বেত্র-দণ্ড দেখিয়াছিলেন। সেই ক্ষুদ্র হুজুর বাসায় বসিয়া, নিজের পরাক্রম বর্ণনা করিতেছেন, গৃহিণী এক মনে শুনিতেছেন, আর বলিতেছেন, "আমার জন্মদিন হইতে, পিতার দুঃখ ঘুচিয়াছে, তিনি জাল খতের দায়ে খালাস পাইয়াছিলেন। তিনি চাকরি করেন নাই, ব্যবসা বাণিজ্য জানেন না, তথাপি সংসার উথলিয়া তিনি কুলান্তক রায়ের ডাইন হাত হ'লেন ; কিন্তু আমি এখন এখানে আসিয়াছি, আর তার সেরূপ অবস্থা নাই।"

নব নগরীর ক্ষুদ্র হুজুরের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় আছে, তিনিই চেয়ারে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতে করিতে, সেই নিরীহ মুটেটীর বেত্র-দণ্ড দেখিয়াছিলেন। সেই ক্ষুদ্র হুজুর বাসায় বসিয়া নিজের পরাক্রম বর্ণন করিতেছেন, গৃহিনী এক মনে শুনিতেছেন, আর বলিতেছেন, "আমার জন্ম দিন হইতে, পিতার দুঃখ ঘুচিয়াছে, তিনি জাল খতের দায়ে খালাস পাইয়াছিলেন। তিনি চাকরি করেন নাই, ব্যবসা বাণিজ্য জানেন না, তথাপি সংসার উথলিয়া উঠিল। তিনি কুলান্তক রায়ের ডাইন হাত হলেন। কিন্তু আমি এখন এখানে আসিয়াছি, আর তাঁর সেরূপ অবস্থা নাই।"

ইহাতে ছোট হুজুর একটু হাসিলেন, অমনি গৃহিনীর বদন গম্ভীর হইল। অভিমানে ফুলিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি অলক্ষণা আমি অপয়া, আমি আসিয়া তোমার স্বর্ণপুরী খাক করিয়াছি।" ছোট হুজুর দরিদ্রের সন্তান, শশুরের অন্নে পালিত, এই জন্য গৃহিনীর নিকটে তিনি নির্জ্জলা মান পাইতেন না। এ দিকে আবার গাঢ় স্ত্রৈণ না হইলে শিক্ষিত নামে কলঙ্ক হয়, এই জন্য তিনি গৃহিণীর হাত ধরিয়া কবুলডিক্রী দিতেছেন, এমন সময়ে দারগা বাবু দক্ষিণাকে লইয়া বাহির বাড়ীতে উপস্থিত হলেন।

হুজুর জানালা পথে দেখিয়াই বুঝিলেন যে একটা পাপীনী অপরাধ স্বীকার করিতে আসিয়াছে।

সর্ব্ব-শাস্ত্রের সারাংশ লইয়া আইন আদালত হয় ; বোধ হয় সেই জন্যই এই অপরাধ স্বীকার খণ্ডে কর্ত্তা-ভজা সম্প্রদায়ের বিধি ব্যবস্থা চলিয়া থাকে। কর্ত্তা নিরপরাধীর প্রতি বড় বিরক্ত। "আমি নির্দ্দোষী" এই কথা বলিলেই, ঘোর বিভ্রাট, সপাসপ বেত্রাঘাত চলিল। এ সময়ে পাওরা অপরাধ ধার দিয়া প্রাণ রক্ষা করে।

এখানে আমাদের ছোট হুজুরের প্রতি সেই কর্ত্তাগিরির ভার আছে। তিনি বাহিরে আসিলে, গৃহিনী তাঁর এই আধিপত্য দেখিতে পারেন না, এই জন্য শারীরিক পীড়ার ভান করিয়া জানালার নিকটে বসিলেন। ইঙ্গিত মাত্র দারগা বাবু, দক্ষিণাকে জানালার বাহিরে উপস্থিত করিলেন। হুজুর প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বইচ্ছায় একবার করিবে কি? (আদালতি ভাষায় দোষ কবুল করায় নাম একরার।) দক্ষিণা তা কখন শুনে নাই। প্রজারা বিবাদ ভঞ্জনের জন্য একরার দেয়, সে তাহাই জানে। সুতরাং সে উত্তর দিল, অবশ্য একরার দিবো। হুজুর আবার বলিলেন, তুমি যাহা একরার করিবে, তাহা তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার হইবে।

হুজুর ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন, একথা পূর্ব্বে জানিতে পারিলে, পরীক্ষা দেওয়ার জন্য পণ্ডশ্রম করিতাম না। এখন বুঝিলাম, তোমার ভাগ্যবলেই আমি হাকিম হয়েছি। গৃহিনী, এই ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া, অভিমানে মুখ ভারি করিলেন। হুজুর, গলায় বসন দিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময়ে দারগা বাবু দক্ষিণাকে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। হুজুর তখনি বুঝিলেন অভাগিনী অপরাধ স্বীকার করিতে আসিয়াছে, কেননা এই কাজটি তাঁর প্রায় এক চেটিয়া ছিল। কালীঘাটের কামারের পক্ষে পাঁঠা কাটা তুচ্ছ ব্যাপার। আমাদের হুজুরও এই তুচ্ছ কাজের জন্য স্থান ত্যাগ করিলেন না। বাহির দিকের জানালা খুলিয়া দিয়া দক্ষিণাকে তথায় আনাইলেন। দক্ষিণা এজাহার দিতে লাগিল। কিন্তু সমস্ত কথা লিখিতে গেলে নানা গোল বাঁধে, এই জন্য তিনি বাছিয়া বাছিয়া গুটিকতক কথা লিখিয়া লইলেন এবং দক্ষিণা নিজ মুখে সকল দোষ স্বীকার করিল বলিয়া নিজে স্বাক্ষর করিলেন। ইহাতে হুজুরের ইষ্ট পূর্ত্ত কিছুই নাই, কিন্তু শীকার এড়াইয়া গেলেই শীকারীর কলঙ্ক হয়, এইজন্য বানরের বক্ষেও বর্বার আঘাত করে, অথচ তার মাংসে কোন কাজ হয় না।

জীবন পোষ্যপুত্র নহে, যাগযজ্ঞ করিয়া গ্রহণ করি নাই বলিয়া দক্ষিণা অনেক চিৎকার করিল, কিন্তু হুজুর ভাবিলেন এ সমস্ত কথা মিথ্যা, এবং ইহা লিখিবার আবশ্যক নাই; এই জন্য মিষ্টস্বরে বলিলেন মাগী কি হারামজাদা!

দারগা, দক্ষিণাকে হাজতে লইয়া গেল। হুজুর নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহিণীকে বলিলেন, "আমার এই কলমে সাংঘাতিক বিষ আছে—ইহা শিবের অসাধ্য।" গৃহিণী উত্তর দিলেন, তবে ওটা কুকুরের দাঁতের কলম, নাহ'লে ঔষধ খাটেনা কেন?

গৃহিণী দক্ষিণাকে জানিতেন, অকারণে তার এই যন্ত্রণা দেখিয়া, স্বামীকে অযোগ্য কথা বলিলেন, কিন্তু হুজুর ইহাতে পরম সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, এই-রূপ সদুত্তর বড় মিষ্ট, আমি ইহা বড় ভালবাসি, নতুবা স্বামীকে গুরু বলিয়া ভক্তি করিলে গায়ে যেন বিষ ছড়াইয়া দেয়। গৃহিণী হিন্দুবালা, উচ্চ ধরণের সভ্যতা জানেন না বলিয়াই সময়ে সময়ে এইরূপ গঞ্জনা খাইতে হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আমরা জলবালাকে নরককুটীরে ফেলিয়া আসিয়াছি। বেলা দুই প্রহর অতীত হইল তার সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। বাহিরে অনেকগুলি লোক বসিয়া আছে, সকলেই নীরব। এখানে ডাক্তার কপালী বাবুও আছেন। কেবল তাঁর মুখ খানি প্রফুল্ল, কিন্তু ইহাতেই আরও বেশী আশঙ্কা হয়। জলবালা, যাহাকে দেখিয়া পিশাচী ভাবিয়াছিল, সেই যুবতী, নাকি স্বরে বলিতেছে "যারা জাতিকুল ছাড়িয়া বাহিরে এসেছে, তাদের কিছুই অসাধ্য নাই।" এই সময়ে দারগাকে আসিতে দেখিয়া, যুবতীর বক্তৃতা আরও বাড়িল। "দারগা হলে কি হবে! কিন্তু কিছুই বুদ্ধি নাই। উনি ভাবেন সকলেরই ধর্ম্ম কর্ম্মে মতি আছে। আমি স্বামী ছাড়িয়াছি সত্য, কিন্তু জাতি কুল ছাড়ি নাই। এখনও কাহারো হাতে ভাত খাই না। এ দেশের সকল দেবতাই আমাকে জানেন। সকলেই আমার লুন খেয়েছেন। আমার এই ঠাকুর দেবতার ঘরে যেমন একটা পাপিষ্ঠাকে এনেছে, তেম্‌নি হাতে হাতে ফল হ'ল।" দারগা জিজ্ঞাসিলেন, ব্যাপারটা কি। যুবতী উত্তর দিল, তুমি যারে ভদ্রলোকের মেয়ে বলিয়া আনিয়াছ যার সুখ্যাতি করিতে তোমার লাল পড়ে সেই জলবালা এক তাল আফিম খাইয়া মরমর হয়েছে। ঘরে মরিবার সুবিধা ছিল না বলিয়াই তোমার ঘাড়ে চাপিয়াছিল। তোমাকে নির্ব্বোধ পাইয়া ভুলাইয়াছে। শীঘ্র শীঘ্র তফাৎ কর, আমি গঙ্গাজল ছড়া দিয়া বাড়ী পবিত্র করি।" ডাক্তার বাবু দারগাকে ভরসা দিতে পারিলেন না, তিনি বলিলেন, জলবালার রোগটা পুঁথির সঙ্গে মিলে না। দারগা বাবু, জলবালার মৃত্যু নিশ্চয় বুঝিয়া, ভাবিলেন উহাকে সরকারী ডাক্তারখানায় পাঠাইলে সকল আপদ চুকিয়া যাইবে। তিনি তখনি একটা ঘোড়ার গাড়ি আনিয়া উহাকে পাঠাইলেন। একটী খোট্টা কনেষ্টেবল সঙ্গে গেল; কিন্তু ইহাতেও একটা রিপোর্ট দেওয়া চাই। কাহার ঘাড়ে সেই ঝোক ফেলিবেন, কলম হাতে লইয়া সেই চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে দক্ষিণার বৃদ্ধা দাসী

আসিয়া উপস্থিত হইল। দক্ষিণা, জলবালার বালা দুগাছি বুড়ীকে দেয় নাই, মূল্য ধরিয়া দিয়াছিল। সোণার বালার বদলে রূপার টাকায় মন উঠে নাই। জলবালা আবার মরিতেছে দেখিয়া, বুড়ী সেই বালার দরবার পাকাইতে আসিয়াছে। লোকে দারগাকে ধর্ম্মাবতার বলে, তিনি ধর্ম্মতঃ বিচার করিবেন ইহাই বুড়ীর ভরসা। সে সেই জন্য বলিতে লাগিল বাবা! গরিব দুঃখীর কি দেবতা নাই? এই তো হাতে হাতে ফল হ'ল। না হলে আমার ঔষধে কাহার কথন বিঘ্ন হয় না। তোমার কান্ত আমার ঔষধ খাইয়াই তোমার বশ হয়েছে। তাহারে জিজ্ঞাসা কর, আমার ঔষধে কোন দোষ নাই।

দারগা অকূলপাথারে ভাসিতেছিলেন, একটা নাওয়ারিস ভেলা আসিয়া জুটিল। তিনি তাহার ঘাড়ে চাপিয়া গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। দারগার আদরে বুড়ী হাতে স্বর্গ পাইল। সে ভাবিল দারগা তার পরম বন্ধু, এত কালের পর বালা আদায় হইবে; বিশেষতঃ দারগা বাবুও তার যজমান। এজন্য মনের কথা খুলিয়া বলিল—"বাবা! তোমরা সকলেই জান যে, আমার উপরে ঠাকুরের কৃপা আছে। আমার ঔষধে ব্রাহ্মণ কন্যা চণ্ডালের বশ হয়। জীবন বাবু এই বালার জন্য আমার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়াছেন, কিন্তু এ পোড়া কপালী কিছুতেই বশ মানে না। আমার নাম ডুবাইতে চায়। কেবল বলিতো "বুড়ি! মরিবার ঔষধ জানিস, বিষ দিতে পারিস। আমি তোমার কান্তের পরামর্শ লইয়া, বিষ বলিয়া সেই ভাল ঔষধ দিয়াছি। বাবা! আমি ভাল বই মন্দ করি না। হে চন্দ্র সূর্য্য! তোমরা সাক্ষী, যদি আমি উহার ভাল করিয়া থাকি, তবে যেন আর ফিরিতে হয় না। বাবা! বালা দুগাছি আমার যথার্থ পাওনা, কিন্তু বাঁচিয়া উঠিলে আর বালা দিবে না, না হ'লে এই দণ্ডে বাঁচাইতে পারি।"

দারগা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ঔষধেই কি অজ্ঞান হয়েছে। বুড়ী বলিল "তা জানি না বাবা। আমি বলিতেছি, যদি ঔষধ খাইয়া থাকে, তাতে বিষ নাই। জলবালা একাদশীর উপবাস করিয়াছে, কাল অবধি জলস্পর্শ করে নাই। আর এক বার একাদশীতে এই রূপ অজ্ঞান হইয়াছিল তাতেও আমি বাঁচাইয়াছি।

সুচতুর দারগা এই সন্ধান পাইয়া সরকারি ডাক্তারখানার দিকে ছুটি-লেন। এখানে আসিয়া দেখিলেন, ডাক্তার বাবু উপস্থিত নাই। জল-বালাকে লইয়া গাড়োয়ান বাহিরে আছে। সঙ্গে এক জন খোট্টা কনষ্টেবল ছিল, সে নূতন ভর্ত্তি হইয়াছে। দারগা তারে অন্য কাজে পাঠাইলেন। এখানে একটা বেশ্যা বাস করিত, দারগা তাহার বাড়ীতে জলবালাকে লইয়া গিয়া অল্প অল্প দুগ্ধ দিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ পরে জলবালা কথা কহিতে পারিল। বেশ্যার প্রতি দারগার অবিশ্বাস ছিল না, তিনি জলবালাকে অতি সঙ্গোপনে রাখিবার জন্য উহার প্রতি ভার দিয়া চলিয়া গেলেন। বেশ্যাটী প্রাচীনা, সে এক্ষণে নির্জ্জনে মালা জপ করে, এখানে অন্য জন-মানব নাই। দারগা যখন ফিরিলেন তখন চারি দণ্ড। পথে যাইতে যাইতে সংবাদ পাই-লেন অমলা বেশ্যা আফিন খাইয়া মরিয়াছে। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া একাকী অমলার বাড়ীতে গেলেন; দেখিলেন অমলার বাড়ীর ত্রিসীমানায় লোক জন নাই সকলেই ভয়ে লুকাইয়াছে। অমলার তিন কুলে কেহ নাই। দারগা, বাড়ীওয়ালীকে ডাকিয়া ভরসা দিলেন যে, অমলা কখনই আফিনে মরে নাই, ইহা উহার স্বাভাবিক মৃত্যু। এই কথা শুনিয়া দুই একজন লোক প্রকাশ্যে দেখা দিল এবং সকলেই বলিল অমলার ঘটি বাটী পর্য্যন্ত নাই। অমলা কোম্পানির মড়া, উহারা তাহার সৎকার করিবে না। এই বিষয় লইয়া পুঁথি বাড়াইবার প্রয়োজন নাই; এগুলি নিত্য ঘটনার সামিল। উপস্থিত ব্যক্তিরা দারগার মান রক্ষা করিল। তিনিও মিউনিসিপাল ডোম দুই জনাকে আনিয়া কোম্পানির মড়াকে ডাক্তারখানার নিকটে ফেলিলেন। ডোমেরা বিদায় হইল। তিনি সেই খোট্টা কনষ্টে-বলকে সত্বরে ডাকিয়া বলিলেন, জলবালা মরিয়া গিয়াছে, গাড়োয়ান মড়া ফেলিয়া পলাইয়াছে, তুমি মোরদাফরাস আনিয়া অতি সত্বরে এই মড়াটাকে ডাক্তারখানায় দাখিল কর। ডাক্তার তোমার সাক্ষাতে মড়া চিরিবেন। সাবধান! কোন মতে গাফিলি করিও না। দারগা বাবু এ কাজ শেষ করিয়া, সেই রাত্রেই ঠিকা পাল্কিতে জলবালাকে লইয়া কলিকাতায় গেলেন।

পরদিনে বৃদ্ধা দাসী অপরাধীর শ্রেণীতে হুজুরে চালান হয়। জলবালার প্রসঙ্গ লইয়া নানা গুজব উঠিল।

শ্রীশ্রীপঞ্চানন্দ ঠাকুর এই সমস্ত গুজবে মহা বিরক্ত হইয়া, সংবাদপত্রের মধ্যস্তম্ভে একটা ইস্তাহার জারি করিলেন, তাহা এই রূপঃ—

"যেহেতু জগতে অপ্রকাশ নাই যে, পঞ্চানন্দ শর্ম্মার চুল চেরা বিচার। ইহাতে পক্ষপাতের লেশ নাই। ইনি চিরকাল দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করিয়া আসিতেছেন। ইনি কাণে রাঙ্গ ঢালিয়া বধির হইতে প্রস্তুত আছেন, তথাপি বেদ নিন্দা শুনেন না। সনাতন বেদ এঁর পরম ধন। বেদের মান রক্ষা করিবার জন্য ইনি প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন। হিন্দু সমাজ এই সমস্ত জানিয়া শুনিয়া, এই পঞ্চানন্দকে ক্ষেপাইবার মতলবে, সংপ্রতি এক খানি দরখাস্ত দাখিল করিয়া বলে, যে, বিপক্ষেরা বেদের গৌরব নষ্ট করিতেছে। বেদোক্ত ঋষিগণের পবিত্র স্কন্ধে লাঙ্গল চাপাইয়া দিয়াছে। বেদ মন্ত্রকে চাষার গীত বলিতেছে। ইত্যাদি—

পঞ্চানন্দের টন্ টনে জ্ঞান। ইনি কাজ বুঝেন, কথায় ভুলেন না; তথাপি অবোধেরা ধোঁকা দিতে চায়। পাছে ইহাদের ছলনায় ভুলিয়া, অজ্ঞ জগৎ পঞ্চানন্দের প্রতি অভক্তি করে, এই জন্য জলবালার উপাখ্যান উপলক্ষে, অতি গুহ্যকথা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন।

বর্ত্তমান কালে যাহারা আর্য্য-সন্তান বলিয়া পরিচয় দেয়, ইহাদের মধ্যে অনেকেই বেদের পরম শত্রু। ইহারা হয় শঠ, না হয় নির্ব্বোধ এবং ইহাদের দরখাস্তের বিবরণ সমস্তই মিথ্যা। পঞ্চানন্দ ইহার তন্ন তন্ন মীমাংসা করিতেছেন।

বেদ স্মৃতি এবং ভবিষ্য-পুরাণাদিতে স্পষ্ট লেখা আছে যে, কলিযুগে বেদের দুর্দ্দশা হইবে, বেদোক্ত দেবতারা তর্ক সাগরে হাবুডুবু খাবেন, বেদ প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম বালকের ক্রীড়া সামগ্রী হবেন। এই মহাবাক্য গুলি সফল না হইলে বেদের মান থাকে না, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার মহাবাক্য মিথ্যা হয়, ব্যাসদেবের কলম রদ হইয়া যায়। পঞ্চানন্দের হৃদয়ে ইহা বরদাস্ত হইতে পারে না এই জন্য ইনি কলির প্রথমেই একদলকে নিযুক্ত করিয়া স্বেচ্ছাচারিতার ক্ষমতা দিলেন। তাহারাই বৃষভরূপী ধর্ম্মের তিনটী পা ভাঙ্গিয়া দেয়। ইহাই ভবিষ্য পুরাণের বচন সকলের প্রথম সূত্রপাত। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এই হিন্দুরাই ইহাতে বাধা

দিতে লাগিল। এই দুর্ব্বৃত্তদের কথায় মাতিয়া কুরুকুল-কজ্জল পরীক্ষিত উহাদিগের প্রতি অত্যাচার করে। সেই জন্য এই পঞ্চানন্দের আজ্ঞায়, নাগ-রাজ তক্ষক অকালে ঐ পরীক্ষিতকে দংশন করেন। পরীক্ষিতের পর আর কোন বাধা ছিল না, দেব-কার্য্য সুচারুরূপে আঞ্জাম হইতেছে। সম্প্রতি মুশ্কিল উপস্থিত, বহু পরিবর্ত্তন না হইলে, ভবিষ্য পুরাণ মাটি হইয়া যায়, এই জন্য পঞ্চানন্দ দেব, অনেক মন্ত্রণার পর, তাঁর প্রিয়তম কর্ম্মচারীদের প্রতি ব্যাসগিরির পরওয়ানা দিয়াছেন। অসীম ক্ষমতা না দিলে কাজ চলে না। এঁদের মধ্যে কেহ যাজ্ঞবল্ক্য, কেহ বশিষ্ঠ, অথবা যার যা ইচ্ছা তিনি তাহাই হইবেন। ঘেঁটু মনসা হইতে হরিহর বিরিঞ্চি পর্য্যন্ত এঁদের ক্ষমতাধীন হইলেন, এঁরা স্বেচ্ছানুসারে দেবতাগণকে বাহাল বরতরফ করিবেন। দেবতারা অবোধ হিন্দুদের মত অবাধ্য নহেন, তাঁরা বেদের মানরক্ষার জন্য সকল অপমান সহ্য করিতে রাজি আছেন।

কিন্তু ইহাতেও হিন্দুদের চৈতন্য হইল না, ইহারা এখন দেবকার্য্যে বাধা দিতেছে। এরা আপনারা ভবিষ্য পুরাণ মানে না, আবার অন্য লোকদিগকে মানিতে দেয় না। ইহারা বেদ পরায়ণ বলিয়া গর্ব্ব করে, কিন্তু ইহাদের ন্যায় বেদ-দ্রোহী ভূভারতে নাই। পঞ্চম-বেদ ভবিষ্যপুরাণকে ব্যর্থ করিতে চায়। ইহারা পরীক্ষিতের বিষ-যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়াছে। "সত্যমেব জয়তে" এই ধুয়া ধরিয়া পৃথিবীকে রসাতল দিলে। বেদ পুরাণ ছাড়িলে, সত্যের ক্ষমতা কি? সেদিন শ্রীমন্ত সদাগরের পিতা ধনপতি দত্ত সত্যের দোহাই দিয়া, সিংহল রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর কাল কারা-যন্ত্রণা ভোগ করে। কিন্তু সে কি প্রকৃত পক্ষে কমলে-কামিনী দেখে নাই, না রাজসভায় মিথ্যা কথা বলিয়াছিল? ধনপতি যে মায়াদেবীর ছলনায়, বিপাকে ঠেকিয়াছিল, সেই মায়াদেবীই আজি, জলবালা সম্বন্ধে সাধারণের চক্ষে ধাঁধা লাগাইয়াছেন। সাবধান! এখন সতর্ক হও। চক্ষের দেখা, কাণে শুনা আদি সমস্ত ভুলিয়া যাও। জলবালা সম্বন্ধে দারগা বাবু যা রিপোর্ট করিলেন, তাহাই প্রকৃত বলিয়া মানিয়া লও। নতুবা ধনপতি দত্তের মত জেলে পচিলে, পঞ্চানন্দ দেব কথনই রক্ষা করিবেন না। সত্যের শরণ লইয়া খালাস হওয়া বহুদূরের কথা। দারগার রিপোর্ট খানিও এই সঙ্গে দেওয়া হইল। যথা—

জীবন বাবুর চুরি মোকদ্দমায় তাঁর গৃহতত্ত্বকালে একটী যুবতীকে অচেতন অবস্থায় পাওয়া যায়। ইহার নাম জলবালা। এই যুবতী পাছে জীবনের মোকদ্দমায় সত্য কথা বলিয়া ফেলে, এই জন্য দক্ষিণা দাসী, তার দাসীর দ্বারা উহাকে বিষ খাওয়ায়। দাসী সেই কথা স্বীকার করিতেছে। তদ্ভিন্ন দক্ষিণার বিরুদ্ধে অন্য প্রমাণ নাই। জলবালা ডাক্তারখানায় পৌঁছিবার পূর্ব্বে মরিয়া গিয়াছে। তাহার মৃতদেহ পরীক্ষা হইয়াছে। এক্ষণে ঐ বৃদ্ধা দাসীকে প্রেরণ করা হইল।

আজ্ঞাধীন দারোগা

শ্রী——

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নব-নগরীর কাছারিতে আজি বড় ধুম। দক্ষিণার মোকদ্দমার বিচার হইবে। কাছারীর বাহিরে অশ্বত্থতলায় বিগত-যৌবনা বারাঙ্গণারা পান তামাকের দোকান খুলিয়াছে। উকীল মোক্তারের দালালেরা, আপনাদের স্বার্থ দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকাইয়া পরোপকারে মাতিয়াছে। লোকে লোকারণ্য, হৈ হৈ শব্দ। কিন্তু বেলা দুইটা পর্য্যন্ত হুজুরের দেখা নাই। দেশীয় হাকিমেরা, বিলাতী অপরাধীর বিচার করিতে চাহিয়াছেন, ইহাতেই সাহেবেরা একটা সভা করিয়াছেন। আমাদের হুজুর সেই সভাতে আটক পড়িয়াছেন। হুজুর, জন্মদোষে বাঙ্গালী, কিন্তু কর্ম্মগুণে সাহেব। আজি সাহেবেরা তাঁহাকে মিষ্টার বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। তিনি কোন ক্রমেই উঠিতে পারিতেছেন না। এখানে একজন সুবিজ্ঞ প্রবীণ সাহেব বক্তৃতা করিতেছেন। "আমরা বলি না যে, দেশীয় হাকিমগণ অযোগ্য। পক্ষপাতের আশঙ্কাও করি না। তথাপি ইহাতে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। আমরা সাত সমুদ্র পার হইয়া ভারতে আসিয়াছি, শতবর্ষ কাল ভারতবাসীর আচার ব্যবহার শিখিতেছি, তথাপি মুসলমান ডাক্তার দ্বারা হিন্দুবালার সতীত্ব পরীক্ষা করিয়া থাকি। ব্যাভিচারিণী বিধবাকে স্বামীধনে বঞ্চিত করিতে পারি নাই ইহাতে হিন্দু-হৃদয়ে ব্যথা লাগিয়াছে। আর দেশীয় হাকিম যারা বিলাতীয় রীতি নীতি কিছুই জানে না, তারা আমাদের বিচার করিতে বসিলে কি রক্ষা আছে? তারকেশ্বরের মহান্ত পরস্ত্রী-গমন অপরাধে জেলে গিয়াছিল আপনারা সকলেই এ কথা জানেন। কিন্তু আমি কুক্ষণে বিলাতে বসিয়া এই গল্পটী বলিয়াছিলাম। ইহাতে আমার বন্ধুরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া সন্দেহ করিলেন; কেহ কেহবা সময়ে সময়ে ঐ কথা তুলিয়া খেপাইতেন। এই সমস্ত কারণে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বিজাতীর হস্তে ন্যায় বিচারের আশা অতি অল্প।"

সাহেবের নীতি-গর্ভ বক্তৃতা শুনিয়া আমরা এতই মোহিত হইলাম যে, আমাদের হুজুরের চেরাসই হইবার পূর্ব্বেই আমরা কলম ছুঁইয়া সম্মতি দিলাম। ইহার পরেই হুজুর আসিয়া এজলাসে বার দিলেন। প্রথমেই দক্ষিণার মোকদ্দমার ডাক হইল। দক্ষিণা সেই থানেই ছিল, পুলিস তাহাকে কাঠরায় খাড়া করিয়া দিল। চাপরাসি জানিত না যে, দক্ষিণা হাজতে আছে, সে স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে, বাহিরে আসিয়া চিৎকার যুড়িল, "দক্ষিণা হাজির হও—দক্ষিণা হাজির হও।"

ঘটনাক্রমে সেই দিনে আর এক দক্ষিণার মোকদ্দমা আছে। তাহাতে কুলধন চট্টরাজ বাদী আছেন। সেই দক্ষিণা কুলধনের স্ত্রী, সে অভাগিনী কুঘরে কন্যার বিবাহ দিয়াছে, সেই সূত্রে চট্টরাজ ঠাকুর, স্ত্রীর নামে কন্যা চুরির দাবী দিয়াছেন। শুনিয়াছি, এরূপ মোকদ্দমাও নাকি নজির-সঙ্গত। দক্ষিণা ঠাকুরুণ, কুলধনের একত্রিশ নম্বরের গৃহিণী,—তিনি উহাকে চিনিতেন না। এ দিকে দারগা বাবু জলবালাকে লইয়া বিব্রত থাকায় সময়ে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ফরিয়াদির কাঠরা খালি আছে। কুলধন ভাবিল, তবে তাহারি মোকদ্দমা ডাক হইয়াছে। ব্রাহ্মণ শশব্যস্ত হইয়া ব্যগ্রভাবে বলিতে লাগিল, "হুজুর, এই মাগী আমার কন্যাকে চুরি করিয়া কুঘরে দিয়াছে। আমার কুললক্ষ্মীকে খোঁড়া করিয়াছে।"

পেস্কার বাবু বলিলেন, "ঠাকুর, ক্ষান্ত হও। এ দক্ষিণা তোমার স্ত্রী নয়।" কুলধন ইহাতে বিপরীত বুঝিল, চীৎকার শব্দে বলিল, "হুজুর, পেস্কার ঘুষ খেয়েছে। এই মাগীই আমার স্ত্রী।" হুজুর নিজে দক্ষিণাকে চিনিতেন, এই জন্য ব্রাহ্মণকে ধমক দিয়া বলিলেন, তুমি আপনার স্ত্রীকে চিনিতে পার না। তোমার সকল কথা মিথ্যা, তুমি শক্ত সাজা পাবে।

ব্রাহ্মণ অপ্রতিভ হইবার পাত্র নহে, যোড়হাতে বলিল, "হুজুর, আসামী না চিনিলে কি মোকদ্দমা হয় না? তা হ'লে তো জমিদারের জমিদারী থাকে না। তাঁহারা কয়জন প্রজাকে চিনিয়া রাখে। বিশেষতঃ ইহাতে আমার অপরাধ কি? আমি বিবাহের রাত্রে একবার স্ত্রীকে দেখিয়াছিলাম, তখন উহার মুখ ঢাকা ছিল। তাহাও আজি ষোল বৎসরের কথা। তার পর আর দেখা সাক্ষাৎ নাই। কিন্তু আমার পাকা দলিল আছে। দলিলে

কি মোকদ্দমা হয় না ? পঞ্চাশ ষাইটটা বিবাহের কথা কি মুখস্থ রাখা যায়।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ, খাতা বাহির করিল। ইহাতে বার, তিথি, দিন, মাস এবং পণ, গণ আদি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে লিখিত আছে।

"তবে কন্যাটী তো তোমার হইতে পারে না" এইরূপ তর্ক উঠিল। ব্রাহ্মণ বিরক্ত হইয়া বলিল, "দেখুন, ঐ খাতাতেই গর্ভ-সংশোধন বাবত দশ টাকা জমা আছে। সেই গর্ভেই এই কন্যা হয়। আমি ছল চাতুরী করিতে আসি নাই।"

দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রাহ্মণের মোকদ্দমাটী এক্ষণে স্থগিত রহিল। ওদিকে দারগার অনুপস্থিতে দক্ষিণার মোকদ্দমা হইতে পারে না। তাহাকেও স্থানান্তরিত করা হইল। আর একটী মোকদ্দমার ডাক পড়িল। ইহাতে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত গাঁজাখোর ঠাকুর বাদী আছেন। এবার ইনি একটা গুলিখোরের হাতে পড়িয়াছেন। গুলিখোর চুরি করিবার জন্য তাঁর ঘরে সিঁদ কাটিয়া প্রবেশ করে, এবং অন্ধকার রাত্রে তার ঘাড়ে পড়িয়া যায়। গাঁজাখোর তাহাকে ত্রিশূন্যে তুলিয়া আনিয়া দারগার নিকট ফেলিয়া দেয়। হুজুর, গাঁজাখোরের এজাহার শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার কেহ সাক্ষী আছে কি ?"

"কি, এতে আবার সাক্ষী চাই ?" এই বলিতে বলিতে গুলিখোরের নিকটে আসিয়া তার গালে একটা প্রকাণ্ড চপেটাঘাত করিয়া বলিল, "হতভাগা, তুই কেন সাক্ষী নিয়ে গেলি না ? আমি এখন সাক্ষী কোথায় পাই ?"

এই গর্হিত আচরণে, হুজুর গাঁজাখোরের দশ টাকা জরিমানা করিলেন। সে বলিল, "দোহাই ধর্ম্ম-অবতার; অবিচার করিবেন না। আপনার চারিটি টাকা বই পাওনা নাই। আমি দশ টাকা দিব না।"

"কেন, কিসের দরুণ চারি টাকা ?"—হুজুর এই কথা জিজ্ঞাসা করায়, ব্রাহ্মণ বলিল, "হুজুর; লোকে বলিয়াছিল, চোর ধরিয়া দিলে বাটপাড়ের হাতে তিন গুণ যায়। আমার ঘরে দুই টাকা মূল্যের সামগ্রী ছিল। চোরে নিলে তাহাই যাইত। ইহাতে দুই টাকার তিন গুণ ধরিলে ছয় টাকা হয়। কিন্তু আপনার জমাদার আমাকে দুই ধাক্কা দিয়া দুই টাকা আদায় করিয়াছে। বাকি আছে চারি টাকা, তাহাই আপনার ধর্ম্মগণ্ডা পাওনা।"

গাঁজাখোরের কথায় কেহ কাণ দিলেন না। বরকন্দাজ তারে টানিয়া লইয়া গেল। ইহার পরেই একটী যুবতী ফরিয়াদির শ্রেণীতে দাঁড়াইল। যুবতী, তার স্বামীর নিকটে খোরাকি চায়। স্বামী বলিতেছেন বাদিনীর জননী এ পর্য্যন্ত কুমারী অবস্থায় আছে। সে কুলীন কন্যা, তার সমযোগ্য ঘর মিলে না বলিয়া এ জন্মে তার বিবাহ হয় নাই। একজন বংশজ ব্রাহ্মণ, তার সঙ্গে ঘর সংসার করিতেছে। ইহাতেই বাদিনীর জন্ম হয়। সেই কারণে বাদিনীর বিবাহ বাতিল। (অর্থাৎ তিনি ভুলক্রমে বিবাহ করিয়াছেন।) দৈব গতিকে দুইটী সন্তান হইয়াছে। তিনি ব্রাহ্মণ-সন্তান, সম্প্রতি বিলাতী সুধার কারবারে, তাঁর সাধু-সঙ্গ হইয়াছে। সাধু ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে উদ্ধার করিতে প্রস্তুত আছেন। এক্ষণে এই আপদ কাটিয়া গেলেই, তাঁর সেই পথ নিষ্কণ্টক হয়। বাদিনীর চক্ষে জল দেখিয়া আমাদের হুজুর বড়ই বিরক্ত হইলেন, কেন না, তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার ঘোর পক্ষপাতী। কিন্তু একেই তো আমাদের দেশের স্ত্রীলোকগুলা পায়ের বেড়ি কাটিতে চায় না, তাহাতেই তিনি মহা দুঃখিত, এ অভাগিনী আবার ভাঙ্গা বেড়ি যোড়া দিতে চায়।

এই সময়ে আমাদের দারগা বাবু উপস্থিত হওয়ায়, হুজুর এ মোকদ্দমাও ফেলিয়া রাখিলেন। জীবন বাবু, সমর তুরঙ্গমের ন্যায় কাঠরায় উঠিয়া এজাহার দিতে লাগিলেন। দারগা বাবু তাঁর পিষ্ঠভাগে বসিয়া লাগাম টানিতে লাগিলেন। দক্ষিণা, অধোবদনে চক্ষের জল ফেলিতেছে। যোগী-বরের ভ্রুক্ষেপ নাই। তিনি অম্লান-বদনে সংসার-সাগরের ঢেউ গণিতে লাগিলেন।

বঙ্গদেশের সকল কাছারীতেই পাগলের আমদানী হয়। এখানে অনেক গুলি জুটিয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটী পণ্ডিত, আর একটী কবি আছে। ইহারা দুই জনেই পাগ্‌লা-গারদের ফেরত। একটী পল্লিগ্রামবাসী ভদ্রলোক, কবি পাগলকে জিজ্ঞাসা করিল "এটা কি প্রকার মোকদ্দমা?" কবি বিরক্ত হইয়া বলিল, "তুমি কি গারদ হইতে পলাইয়া আসিয়াছ? কই, তোমার পাগ্‌লামী তো সারে নাই। আমি অদ্যই সেখানে চিঠি লিখিব।" ভদ্র লোকটী অবাক হইল। সঙ্কুচিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেন মহাশয়,

মোকদ্দমার কথা জিজ্ঞাসা করায় দোষ কি ?" কবি বলিতে লাগিল, "এখানে মোকদ্দমা কোথায় ? এ যে নারীমেধ যজ্ঞ হইতেছে। পুরোহিত পেস্কার বাবু পুথির বদলে নথি ধরিয়া মন্ত্র বলিতেছেন। পরিচারক চাপরাসিরা, সোণা রূপার সামগ্রী থরে থরে সাজাইতেছে। (এমন সময়ে অভিযোগ পত্র পাঠ হইল) ঐ দেখ, দক্ষিণাকে উৎসর্গ করা হইল, উহার কর্ণমূলে মহাবাক্য বলিতেছে। জীবন, উহার গলায় দড়ি দিয়া টানিয়া আনিয়াছে। দারগা বাবু ছেদন ভার লইয়াছেন।" এই সময়ে পণ্ডিত-পাগল কবিকে, বাধা দিয়া বলিল, "কলিযুগে নরমেধ নিষেধ। কার সাধ্য এরূপ ব্যবস্থা দেয়। আমি ইহাতে স্বাক্ষর করি নাই।" উভয়ে তুমূল গণ্ডগোল করিতে লাগিল। চাপরাসি, দুই জনের গলাধাক্কা দিতে দিতে বাহিরে আনিল, তথাপি নিবৃত্তি নাই, গাছ তলায় বিচারের ধুম চলিল।

এ দিকে অকস্মাৎ কাছারীময় হৈ হৈ শব্দ হইল, হাইকোর্ট হইতে তারে সংবাদ আসিয়াছে, এখানে দক্ষিণার মোকদ্দমা হইবে না। দক্ষিণা এবং তাঁহার সংশ্রবের সমস্ত লোক মোচনকা দিয়া খালাস পাইল। জেলার মাজিষ্টর স্বয়ং ইহার বিচার করিবেন। জীবন বাবু, কাঁদিয়া আকুল তিনি গদগদস্বরে বলিতে লাগিলেন, "দোহাই হুজুর; অন্য হাকিমের নিকট সুক্ষ্ম বিচার হইবে না, আপনার ন্যায় কার এত ধর্ম্মজ্ঞান আছে ?

হুজুর মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

এই ঘটনায় পাগলদের বিরোধ মিটিল। পণ্ডিত দেখাইয়া দিল, এ যজ্ঞ বেদের বিপরীত বলিয়াই, দেবতারা বিঘ্ন করিলেন। কবি বলিল, "কই; দৈববাণী তো হয় নাই। দেবতারা কোথায় যজ্ঞ নিবারণ করিলেন।" পণ্ডিত বলিতে লাগিল, "আজ কাল দেবতারা সভ্য হইয়াছেন, আর তাঁরা চীৎকার করেন না। দেবরাজের বিদ্যুৎ দূত সেই কাজের ভার পাইয়াছে।" বাস্তবিক বিদ্যুৎ তেজ লইয়া টেলিগ্রাফের কারখানা; এক্ষণে দৈববাণীর বদলে, দৈবলিপি প্রচলিত হয়েছে। কবি হারিয়া গেলেন, পণ্ডিতজীর জিত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

কাছারীর বাহিরে কিছু দূরে বহু লোকের সমারোহ হইয়াছে। ইহারা সকলেই দক্ষিণার প্রজা। বেহারার বিলম্ব দেখিয়া, প্রধান প্রজারা আহ্লাদ পূর্ব্বক দক্ষিণার পাল্কি কাঁধে তুলিল। যাহারা তাহা পাইল না, তাহারা বলিল, "মা! আমরা কি তোমার সন্তান নই;" আপনার তো এরূপ পক্ষপাত কখন হয় না। দক্ষিণা সকলকে সান্ত্বনা করিয়া প্রথমে গঙ্গাস্নান করিলেন। পরে বাড়ীর দিকে যাত্রা করিবার সময় দেখিলেন, প্রজারা সকলেই এক এক গাছা গরাণ কাষ্ঠ হাতে লইয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় মণ্ডলেরা বলিল, "জীবন বাবু, কুলাঙ্ক রায়ের সঙ্গে যোগ করিয়া লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়াছেন। দারগা বাবু সেখানে উপস্থিত আছেন আপনাকে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দিবেন না। মা! আমরা আর সহ্য করিতে পারি না, আপনার নিবারণ মানিব না। সর্ব্বাগ্রে সেই কুটীল দত্তের মাথাটা চূর্ণ করিব।"

পৃথিবীর রাজত্ব পাইলেও দক্ষিণা এরূপ কাজ করেন না। তখনই গমন স্থগিত করিয়া প্রজাবৃন্দকে সান্ত্বনা করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দক্ষিণার সমস্ত লোক খালাস পাইয়াছে। তিনি দেওয়ানজীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার সর্ব্বস্ব যাউক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু জলবালার জন্য আমার প্রাণ বড় আকুল হইতেছে। সে ঐ শত্রুপুরীর মধ্যে পড়িয়া আছে। তার প্রতি পাপিষ্ঠ জীবনের বড় আক্রোশ! হয় তো সে আত্মঘাতিনী হইবে। তাহাকে উদ্ধার করিবার উপায় কি?" দেওয়ানজীও দক্ষিণার মত জলবালার বৃত্তান্ত কিছুই জানেন না, মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। পাঠকের পূর্ব্ব-পরিচিতা বৃন্দাদাসী, দক্ষিণার সম্মুখে আসিয়া বলিল "মা! জলবালার জন্য ভাবনা নাই, সে শত্রুপুরী হইতে উদ্ধার হইয়াছে। দারগা তারে সেখানে রাখিবে কেন, সে রাজার হালে আছে, কোম্পানির ডাক্তার তার সেবা করিতেছে।"

দক্ষিণা ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসিল, "তার কি আবার রোগ হয়েছে?"

বুড়ি বলিল, "রোগ কেন? সে যে বিষ খেয়ে অজ্ঞান হয়েছিল, তাতেই তো সেই দারগা মিনসে আমাকে জেলে পাঠিয়ে দেয়। হে মা, চন্দর স্যিয্যি; তোমরা সাক্ষী, আমি কোন দোষের দোষী নই। তার যেন তেরাত্রি পোহায় না।"

দক্ষিণা, মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, এবং বলিলেন, বুড়ী তোর ভয় নাই, তুই সত্য কথা বল্। আমি আর কি সেই মুখখানি দেখ্‌তে পাবো না? বাছা আমার মনের খেদেই এই সর্ব্বনাশ করেছে।

বুড়ী বলিতে লাগিল, "আমি কি কারো পরমায়ু দিতে পারি। মরা বাঁচা দেবতার হাত। সে কোম্পানীর মড়া, কোম্পানীর লোকে তারে নিয়ে গেল। আমি চক্ষেও দেখ্‌তে পাই নাই। কিন্তু আমার ঔষধে সে মরে নাই। আমি বালা ভুগাছিও পেলেম না, আবার এত লাঞ্ছনা! ধর্ম্ম থাকেন তো সূক্ষ্ম বিচার করিবেন।"

দক্ষিণা, সংসার-মরুর উষ্ট্র। সে নীরবে সকল যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আসিতেছে। উষ্ট্রের গলদেশের অভ্যন্তরে যে জলপূর্ণ থলি থাকে, তাহাই তাহার শেষ আশা। দক্ষিণা জলবালাকে বক্ষে লইয়া সকল জ্বালা ভুলিত। আজি তাহার সে আশাও ফুরাইল, সুতরাং আর সহ্য হইল না, অধোমুখে পাল্কির মধ্যে পড়িয়া রহিল।

আমাদের দারগা বাবু অলক্ষ্যে থাকিয়া এই সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছেন। তাঁহার অন্তঃকরণে কি কিছু করুণা সঞ্চার হইল? না, তাহা হইলে যে বেদ মিথ্যা হয়। তবে এত যোগাড় থাকিতেও দারগা নিশ্চিন্ত কেন? যখন এতগুলা প্রজা একত্র হইয়াছে—তাহারা সকলে গরাণের লাঠি ধরিয়াছে; তখন ইহাতে না হয় কি?—না—দক্ষিণা জলবালার মৃত্যু সংবাদে কৃত-নিশ্চয় হইয়াছে বলিয়া দারগা বাবু সন্তুষ্ট হইলেন। না—তাহাও নয়, ইনি এবারে পাকা ষড়-যন্ত্রের চেষ্টায় আছেন; হঠাৎ ঘাঁটাইবেন না। এখন মৃদু-গতিতে জীবন বাবুর নিকট চলিলেন।

এদিকে অতি অল্পক্ষণ পরেই, গেরুয়া-বসনধারী, প্রশান্ত মূর্ত্তি একটী প্রবীন পুরুষ দেখা দিলেন। আমাদের তরুণ যোগী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া,

দক্ষিণাকে বলিলেন, "মা! শীঘ্র গা তোল, গুরুদেব উপস্থিত।" দক্ষিণা উঠিয়া প্রণাম করিল, কিন্তু তাহার শোক-বেগ দ্বিগুণ হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, ঠাকুর, "আমি ঘোর পাপিনী, আমি আপনার গচ্ছিত ধন নষ্ট করিয়াছি ও আমার জলবালাকে হারাইয়াছি। আর আমাকে নিবারণ করিবেন না, আমি আর বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না। জলবালা আমার একাদশীর উপবাস করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, আবার পাপ সঙ্কল্প? আবার আমার উপদেশ লঙ্ঘন করিতে চাও, আমি জীবনকে গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি তাহা না শুনিয়া, এই বিপদে পড়িয়াছ। তুমিই না তখন বলিয়াছিলে, "না ঠাকুর কোন চিন্তা নাই," জীবন বড় ভাল ছেলে। আজি যদি শ্বেতাম্বর সাহেব না থাকিত, তাহা হইলে তোমার জাতি, কুল, মান ও সম্ভ্রম রক্ষা করা ভার হইত। এখনও তুমি বিপদ বহ্নির মধ্যে আছ। ঘাটে বজরা উপস্থিত, আর কথার সময় নাই, এই মুহূর্ত্তে আমার সঙ্গে আইস। বৎস তত্ত্ববোধ আমাদের সঙ্গে চলুন। ব্রহ্মচারীর সঙ্গে ইহাঁরা নৌকায় আরোহণ করিবামাত্র নাবিকেরা মধ্য গঙ্গায় আনিয়া ফেলিল। এমন সময় দেখা গেল, দারগা বাবু তাঁর সৈন্য সামন্ত লইয়া ঘাটে উপস্থিত হইলেন। দক্ষিণা দেশত্যাগ করিতেছে দেখিয়া, তিনি তাঁরে ক্ষমা করিলেন। গ্রেপ্তার করিবার জন্য পাছে পাছে গেলেন না। ব্রহ্মচারী ঠাকুর, দারগাকে দেখিয়া বলিলেন লোকে না জানিয়া ইংরাজরাজের নিন্দা করে, কিন্তু তাঁহারা দেবতা বিশেষ, এই পাপিষ্ঠই তাঁহাদের কলঙ্ক। আমি এই উপলক্ষে হাইকোর্টের বিচার ব্যাপার দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। এরূপ হইলে শতযুগ পরাধীন থাকিলেও দুঃখ নাই। অথবা ন্যায় বিচারের অধীনতাকে পরাধীন বলে না। দক্ষিণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর," শ্বেতাম্বর সাহেব কে? ইহার বৃত্তান্ত আমায় বলুন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, বাছা! পুত্রশোকে কাতর হইয়া যারে কোলে লইয়াছিলে, যার উপনয়নে প্রথম ভিক্ষা দিয়াছ, যে মা বলিলে তোমার সকল দুঃখ দূর হইত, 'যার পিতাকে দেওয়ান করিবার জন্য স্বামীর পায়ে ধরিয়াছিলে, সেই এই শ্বেতাম্বর সাহেব। সে এখন ব্যারিষ্টর হইয়াছে,

তার কথাতেই হাইকোর্টের জজেরা তোমার প্রতি কৃপা করিলেন। দক্ষিণা, ব্যগ্র হইয়া বলিল, "তবে কি আমার খাঁদু প্রাণে বাঁচিয়া আছে?" আমি তার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেই দেওয়ানজী কাঁদিয়া অনর্থ করেন, বংশ লোপ হইল বলিয়া মাথায় চাপড় মারেন। ব্রহ্মচারী বলিলেন, তিনি এখন খাঁদু নহেন, শ্বেতাম্বর সাহেব, তাঁর অসীম ক্ষমতা হইয়াছে। দক্ষিণা বলিলেন, "তবে নিশ্চয়ই সে এক মাগী বিবিকে বিবাহ করেছে।" আহা! কত সাধ করিয়া বাছার বিবাহ দিলাম। বউটী যেন সরস্বতী প্রতিমা। আমি সেদিন বউটীকে বাড়ীতে আনিয়াছিলাম। বাছার যেমন রূপ তেমনি গুণ। জলবালার সঙ্গে তাঁহার গলায় গলায় ভাব ছিল। আহা! সব বৃথা হ'ল। জলবালা আমার একাদশীর উপবাস করিয়া দ্বাদশীর পারণা করিতে পাইল না। আর কথা সরিল না, চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারী ঠাকুর অন্য অন্য প্রসঙ্গ তুলিয়া, তাহার শোক চাপা দিলেন, এবং সময় বুঝিয়া যোগীর কথা পাড়িলেন। দক্ষিণা, যোগীবরের মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর! এ বালককে কোথায় পাইলেন, এঁর কি মা বাপ নাই? ইনি বিবাহ করেন নাই কি? এই কি সন্ন্যাসের বয়স! আমার বোধ হয় কোন অভাগিনী আমার মত হা হা করিয়া বেড়াইতেছে। জানিনা, বাছা কি খেদে সন্ন্যাসী হয়েছেন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "বীরভূমের নিবীড় জঙ্গলে আমি উঁহাকে পাইয়াছি। দুরন্ত চোয়াড়েরা উঁহাকে নরবলি দিতে আনিয়াছিল। উনি কোনক্রমেই আত্ম-পরিচয় দিতে চাহেন না। সংসারের প্রতি উনি বড় বিরক্ত। যোগী হইবেন, নির্জ্জনে হরি-সাধন করিবেন, ইহাই মনের আশা। আমি উঁহার তত্ত্ববোধ নাম দিয়াছি। বালক বিলক্ষণ বুদ্ধিমান, অল্পদিনে আমার নিকটে নানাবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে। প্রশ্ন গণনায় অদ্বিতীয়। আমার অনিচ্ছায় কুম্ভক অভ্যাস করে।

দশম পরিচ্ছেদ।

মহাপুরুষ দক্ষিণার গর্ভজাত পুত্রের উল্লেখ করিলেন। আমরাও বহু অনুসন্ধানে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানিয়াছি। সমুদয় না বলিলে মহাভারত অশুদ্ধ থাকিয়া যায়। সুতরাং পাঠকের অনুমতি লইয়া, অগ্রে সেই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলাম।

দক্ষিণার স্বামী পদ্মলোচন বসু বিপুল জমিদারীর অধিকারী ছিলেন। তাঁহার প্রথম ভার্য্যা, এক পুত্র এবং এক কন্যা রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। পদ্মলোচন আর বিবাহ করিলেন না। পুত্রের বিবাহ দিয়া বংশরক্ষার আশা করিলেন। কিন্তু পুত্রের সন্তান হইল না। ক্রমান্বয়ে তাঁহার তিন বিবাহ দেন, কিছুতেই বংশ থাকিল না। আবার কন্যাটীও শৈশবে বিধবা হইল। এবারে পদ্মলোচন পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ইহা বৃহৎ ব্যাপার, ইহাকে, দেব—পার্লিয়ামেণ্টের চূড়ান্ত দরবার বলিলে, অত্যুক্তি হয় না। এঁরা সন্তুষ্ট হইলে, বিধাতা, পুত্র না দিয়া থাকিতে পারিবেন না। এই জন্য তিনি ফাঁকি সিদ্ধান্ত করিয়া, পদ্মলোচনের একমাত্র পুত্রকে যমালয়ের জেলখানায় টানিয়া লইলেন। পদ্মলোচনের সকল আশা ফুরাইল। এক্ষণে তাঁহার বয়স যাটি বৎসর। পুত্রশোক অপেক্ষা বংশ-রক্ষার ভাবনা দ্বিগুণ হইল। তিনি অবশেষে দক্ষিণাকে বিবাহ করিলেন। দক্ষিণা, জীবন বাবুর পিতার সহোদরা। দক্ষিণার মাতা বর্ত্তমান আছেন, প্রথম সহোদর জীবনের পিতা, চাকরী উপলক্ষে বিদেশে থাকেন। দ্বিতীয় সহোদরের কাযকর্ম্ম নাই, কিন্তু বাড়ীতেও থাকেন না। তিনি মদিরা-সিদ্ধ পুরুষ। অনবরত পান করিলেও টলেন না, এইজন্য তাঁর বড় সুখ্যাতি আছে। যাত্রা নাটকাদিতে তিনি বড় নিপুণ, রাত্রি দিনের মধ্যে এক দণ্ড অবকাশ নাই। দক্ষিণার মাতা, গোষ্ঠি-পতি কায়স্থের কন্যা, আদ্যরসে প্রদত্তা হইয়া, পিতৃদত্ত সামান্য বাড়ীতে বাস করেন। অবস্থা ভাল নয়। আদিশূরের যজ্ঞে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে, ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্ত এবং গুহ, এই

পাঁচটী কায়স্থ আনেন, কিন্তু এক্ষণে তিরাশী ঘর দেখা যায়। বাকী গুলি কি প্রকারে কোথা হইতে মিশিয়াছে, তাহা কায়স্থ মহাশয়েরাই জানেন। কিন্তু উৎকৃষ্ট ধাতুর সঙ্গে অপকৃষ্ট মিশ্রিত করিলে যে কঠিনতা দোষ হয়, তাহা এই দক্ষিণার জননীর দ্বারা প্রমাণ হইয়াছিল। ইনি বাহাত্তরে কায়স্থের কন্যা, উক্ত শ্রেণীর মধ্যেই আদ্যরস-ব্রতধারী, ও গোষ্টিপতি উপাধিধারী। দক্ষিণা পিতৃ-স্বভাব পাইয়াছিল। বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দক্ষিণার গর্ভ-সঞ্চার হয় নাই। বৃদ্ধ পদ্মলোচন পোষ্য-পুত্র গ্রহণের কল্পনা করিলেন। দক্ষিণার মাতা ইহাতে মহাভয় পাইয়া নানা দেব দেবীর ঔষধি আনিয়া দক্ষিণার গলায় বাঁধিয়া দিলেন। দক্ষিণা গর্ভবতী হইল। পঞ্চম মাস গর্ভকালে, পদ্মলোচন পক্ষাঘাত রোগে শয্যাশায়ী হইলেন। তিনি জীবনে নিরাশ হইয়া এই সময়ে এক উইল করিলেন। উইলের স্থূল মর্ম্ম এই যে, যদি দক্ষিণার গর্ভে পুত্রসন্তান হইয়া জীবিত থাকে তবে কোন কথাই নাই, নতুবা দক্ষিণা পোষ্য-পুত্র গ্রহণ করিবেন। কন্যাসন্তান হইলেও নিষ্কৃতি নাই, তথাপি পোষ্য-পুত্র গ্রহণ করা চাই।

বৃদ্ধ পদ্মলোচনের মনের কথা এই যে, সাত কন্যা হইলেও তাঁহার পিতৃ-পুরুষের নাম বজায় থাকিবে না। বসু বংশের ভদ্রাসনে ঘোষ কি মিত্র আসিয়া আধিপত্য করিবেন, তাহা তাঁহার বরদাস্ত হয় না। বরঞ্চ একজন (বাহাত্তুরে) চন্দ্র আসিয়া বসু উপাধি গ্রহণ করে, তাতেও তিনি রাজি আছেন। দক্ষিণার জননী দক্ষিণাকে আপনার বাড়ীতে লইয়া গেল। প্রথম গর্ভবতী, জননীর নিকটেই প্রসব হইতে যায়। এদেশে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে। ঘটনাক্রমে দক্ষিণার দ্বিতীয় ভ্রাতৃ জায়া এই সময়ে গর্ভবতী ছিল। দক্ষিণার জননী উভয় গর্ভবতীকে পালন করেন এবং মনে মনে ভাবেন যে, দক্ষিণার পুত্রসন্তান না হইলে সকলই বৃথা। ক্রমে দশমাস পূর্ণ হইল, একদিন সন্ধ্যার সময়ে দুই গর্ভবতীরই প্রসব বেদনা উপস্থিত। পাছে কেহ কিছু মন্দ করে এই জন্য বৃদ্ধাগৃহিনী কাহাকেও কোন সংবাদ দিলেন না। একাকিনী দুইটীকে লইয়া রহিলেন। জীবনের মাতা এই বাড়ীতে আছেন তিনি শাশুড়ীর স্বভাব জানিতেন। কোন প্রকার বিঘ্ন হইলে পাছে তাঁহাকে দোষের ভাগী হইতে হয়, এজন্য তিনি, জানিয়াও না

জানার মত আপন গৃহের অর্গল বন্ধ করিলেন। রাত্রে বিষম দুর্য্যোগ হইল, জল ঝড় এবং বজ্রাঘাতে, লোকে ঘরের বাহির হইতে পারিল না। পরদিন প্রাতে প্রতিবেশীরা আসিয়া দেখিল, দক্ষিণার পুত্রসন্তান হইয়াছে, এবং ছোট বধূ কন্যা কোলে করিয়া, ম্লান মুখে বসিয়া আছে। গ্রাম্য গণকেরা ইতিপূর্ব্বে গর্ভ গণনা করিয়া, একপ্রকার ডিক্রী ডিস্‌মিস্ করিয়া যান। সাতজনের মধ্যে পাঁচজনের রায়ে দক্ষিণা পুত্রবতী হইলেন, কিন্তু বাকি দুইজন ছোটবধূর পক্ষে পুত্র প্রসবের ক্ষমতা দিলেন। এই সময়ে একজন উদাসীন ব্রহ্মচারী আসিয়াছিলেন, তিনি বলিয়া যান, দক্ষিণার কন্যা হইবে। দক্ষিণার মাতা, ব্রহ্মচারীর সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করেন। তিনি গ্রামছাড়া হইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন। আজি সেই কথা পাড়িয়া দক্ষিণার মাতা বলিতে লাগিল, পাঁচ জন গণকের কথা কি মিথ্যা হয়? তবে আমার দুইই সমান। কিন্তু ব্রহ্মচারী বেটা যদি জানিত যে, আমার দক্ষিণা কত বড় লোকের স্ত্রী, তাহা হইলে কখনই তেমন গণনা করিত না। পাড়ার বড় গিন্নি বলিলেন, গুণ ও জ্ঞান ছয় মাস, কপালের ভোগ বার মাস। যার কপালে যা ছিল, তা হয়ে গেল, এখন বাঁচিয়া থাকুক। সঙ্গত হউক বা না হউক, বড় গিন্নির কথায় কথায় কবিতাটী বলা আছে।

এ দিকে শয্যাশায়ী পদ্মলোচনের আহ্লাদের সীমা নাই। রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিলেন। পাল্কিতে চড়িয়া পুত্র-মুখ দেখিতে গেলেন। কিছুদিন পরে দক্ষিণার মাতা জামাতাকে বলেন, বাছা! তোমার উইল খানি জলে ফেলিয়া দাও। ইহাতে খোকার অমঙ্গলের কথা লেখা আছে। বাপ্‌রে! এমন সর্ব্বনেশে কথা কি লিখিতে হয়?। পদ্মলোচন বুঝিলেন, "পুত্র জীবিত না থাকিলে পোষ্য-পুত্র গ্রহণের অনুমতি সম্বন্ধেই শাশুড়ী ঠাকুরাণী এই কথা বলিতেছেন"। ইহা অবশ্যই উঁহার হৃদয়ে বাজিতে পারে। মাংসপিণ্ড পদ্মলোচন এখন ইহাদের হস্তে কলের পুতুল। তিনি অগোপনে উইল রহিত করিলেন। কিন্তু অকল্যাণ-দোষ কাটিল না, দুই বৎসর পরে শিশু সন্তানটীর মৃত্যু হইল। ইহার পরে পদ্মলোচন তিন বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। তাহার মধ্যেই দক্ষিণা, তাঁহাকে ভিক্ষা-পুত্র গ্রহণ করেন। শিশু পুত্রের মৃত্যুর পর পদ্মলোচনের মতি, স্থির ছিল না, এই সময়ে তৃতীয়

উইল হয়। খাঁদুর পিতা তাহা লিখিয়াছিলেন। ইহাতেও পোষ্য-পুত্রের অনুমতি আছে, কিন্তু তাহা দক্ষিণার ক্ষমতাধীন। দক্ষিণা ইচ্ছা করিলে সমুদয় সম্পত্তি দান বিক্রয় করিতে পারিবেন এরূপ ক্ষমতাও উইলে রহিল। দক্ষিণা ইহার কিছুই জানিত না। খাঁদুর পিতা, খাঁদুর জন্যই এই সমস্ত পথ রাখিলেন। উইল খানি রেজেষ্টরি হইল, এবং বৃদ্ধের মৃত্যুর পর, জেলার জজ সাহেব, ঐ উইল সিদ্ধ করিয়া দক্ষিণাকে সার্টিফিকেট দিলেন।

খাঁদু, দক্ষিণার খরচে ইংরাজি পড়িতেন। আর্য্যধর্ম্মে অনাস্থা, অনাচার অত্যাচার আদি, আজকাল ইংরাজি শিক্ষার অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও কিছু ক্ষতি ছিল না, কেননা, খাঁদুর পিতা ভক্তরাম মুখোপাধ্যায় স্বভাব-কুলীন, তাঁর পুত্রের এই সকল সামান্য দোষ ধরে কে? তবে তিনি মাতামহের উত্তরাধিকারী হইয়া বিপাকে ঠেকিয়াছেন। মাতামহ চৈতন্য গোশাঞি, অনেকগুলি শিষ্য সেবক রাখিয়া যান। ভক্তরাম সেই অনুরোধে কুলদেবী শক্তিকে জলে ভাসাইয়া বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হন। এখন আর জপের ঝুলিকে কুঁড়াজালি বলেন না। পূর্ব্বে শ্রোত্রীয় বংশজের বাড়ীতে পদার্পণ করিতেন না। এখন সুবর্ণ বর্ণিক হইতে শতগুণে নিকৃষ্ট কৈবর্ত্ত আদি সকল জাতিকে উদ্ধার করিতেছেন। সেই ভক্তরাম আজি কোন মুখে খাঁদুর অত্যাচার সহ্য করিবেন?। একদিন তিনি স্বহস্তে খাঁদুকে প্রহার করেন। কিন্তু খাঁদু সামান্য পাত্র নয়, সে, এণ্ট্রান্স পাস করিয়াছে। মহেন্দ্র পর্ব্বতকে তৃণতুল্য দেখিয়া থাকে। সে, সেই দণ্ডেই কুসংস্কারের বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিল। সে বন্ধনও অতি সামান্য, কেননা, সেই বৎসরেই তাহার বিবাহ হইয়াছিল মাত্র। সেই দিন অবধি আর কেহ খাঁদুকে নব-নগরীতে দেখে নাই. এবং সংবাদও পাওয়া যায় নাই। খাঁদু নিরুদ্দেশ হওয়ার পর জীবনধন বাবু, পিসি-মার জীবন সর্ব্বস্ব হলেন। তিনি উঁহাকে দত্তক গ্রহণ করিবেন বলিয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন। জীবনের পিতা, মাতা, পিতামহী এবং খুড়ি-মা, তাঁদের বাড়ীতেই থাকেন তাঁর খুড়ার মদের পয়সা জুটল না, তিনি গুলি গাঁজা ধরিলেন। কিন্তু তাহাতেও সুবিধা হইল না, কেননা, ইহাতে যাত্রা নাটকের অযোগ্য হইয়া পড়িলেন। তাহাতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লাভ ছিল, তাহাও ঘুচিয়া গেল।

এইবারে চুরীর দায়ে ঠেকিয়া একমাস জেলে থাকিতে হইল। কিন্তু ইহাতে অন্যদিকে মঙ্গল হয়, নেশার অভ্যাস কাটিয়া যায়। তিনিগ্রামে একটী পাঠশালা করিয়া কৃষক-তনয়-গুলিকে ঢেরা-সইয়ের দায় হইতে বাঁচাইতেছিলেন। কিন্তু পুলিশ তাহাকে তিষ্ঠিতে দিল না। কয়েদ-খালাসীর পৃষ্ঠ, সরকারী জয়ঢাক,যার ইচ্ছা সেই আসিয়া আঘাত করে। তার উপর আবার দক্ষিণা চায়। সে, তাহাদের জন্যই চুরি করিতে গেল, আবার, তাহারাই ধরিয়া চালান দেয়। বেচারা সেই ঘৃণায় যে, কোথায় গেল, কেহ তাহার সন্ধান পাইল না। অনেকেই বলিয়া থাকে, সে, গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছে। তার সেই কন্যাটীও নাই, সে, ঐ পিতার সঙ্গে সঙ্গেই নিরুদ্দেশ হয়। গ্রামের নিকটে একটী খাল আছে, সে বৎসর বন্যার জলে অনেক লোক মারা যায়। উক্ত খালে একটী বালিকার মৃত দেহ দেখিয়া লোকে ভাবিয়াছিল যে, ইহা সেই বালিকা। কিন্তু চিনিবার যো ছিল না, পচিয়া ফুলিয়া বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। ইহাই এই ক্ষুদ্রতম ভারতের আদিপর্ব্ব।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ভাগীরথী-তীরে বৃহৎ অট্টালিকার দ্বিতল প্রকোষ্ঠে, একখানি মৃগ-চর্ম্ম বিছাইয়া, আমাদের নব-পরিচিত ব্রহ্মচারী ঠাকুর বসিয়া আছেন। আমাদের পুরাতন বন্ধু যোগীরাজ নিকটে ছিলেন, আর কেহ ছিল না। যোগী বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! আর কতকাল এই ম্লেচ্ছ সংসর্গে থাকিতে হইবে? ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন, বৎস তত্ত্ব-বোধ! মল হইতে ম্লেচ্ছ শব্দের উৎপত্তি। মনে মলা ধরিলেই দোষ। তাহাই প্রকৃত ম্লেচ্ছের লক্ষণ। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যকে ঘৃণা করিতে পারে, সে, কি ম্লেচ্ছ নয়?। তুমি সাধনের জন্য বড় ব্যগ্র, কিন্তু বল দেখি, এই নশ্বর জগতে পরোপকারের তুল্য আর কি কোন সাধন আছে?। তপোবনে যাইয়া বৃক্ষের সঙ্গে মিশিয়া থাকিলে কি হইবে? ভক্তি এবং প্রেম সকলের সার, সেই প্রেম ও ভক্তি, এই পরোপকারে জড়ান আছে।

তত্ত্ববোধ বলিল, ঠাকুর! তবে কি যোগীরা মূর্খ। তাঁরা শত সহস্র বৎসর সমাধি আসনে আছে। কেন? ব্রহ্মচারী বলিলেন, তাঁরাও স্বার্থপর। তাঁদের সেই নীরস ধ্যান জ্ঞানে, কোন প্রকার মধুরতা নাই। তাঁরা ঈশ্বরের সমকক্ষ হইতে চাহেন। সুতরাং এ জগতে তাঁরাও কাহারও নহেন, এবং কেহই তাঁহাদের নহেন। ব্রহ্মচারীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে, শ্বেতাম্বর সাহেব গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং ব্রহ্মচারীকে "গুড মর্নিং বলিয়া হাস্য বদনে চেয়ারে বসিলেন, এবং তত্ত্ববোধকে ক্ষেপাইবার জন্য, প্রথমতঃ তাহার হস্তমর্দ্দণ করিতে গেলেন. সে, আপনার হাত বাহির করিল না। তার পর একটী চুরুট ধরাইয়া তার হাতে দিতে গেলেন, সে, সাত হাত পিছাইয়া পড়িল, এবং হাড়ে চটিয়া গেল। ইহার পরে শ্বেতাম্বর উচ্চৈঃস্বরে গায়ত্রী পাঠ করিলেন। তত্ত্ববোধ গায়ত্রী জানিত না, কিন্তু গুরুর মুখে যেরূপ উচ্চারণ শুনিয়াছিল, ম্লেচ্ছ শ্বেতাম্বরের মুখেও সেইরূপ শুনিয়া মহা বিস্ময় হইল। আপনার দুই কর্ণে হস্ত আচ্ছাদন করিয়া মুখ

ফিরাইয়া রহিল। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসিলেন, তোমাদের খৃষ্টানী ধর্ম্মের গায়ত্রী কি প্রকার? শ্বেতাম্বর উত্তর দিলেন “আমি খৃষ্টান নহি; তবে উহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িয়াছি। ইহা অতি উৎকৃষ্ট, জগতে এরূপ শাস্ত্র আর নাই, কিন্তু ইহাতেও আমাদের মন ভিজাইতে পারে নাই। খৃষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করা বহুদূরের কথা, খোদ ঈশ্বর আমাদের নিকটে আমল পান নাই। এই উপলক্ষে শ্বেতাম্বর, খ্রীষ্টের জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত, সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। শুনিতে শুনিতে ব্রহ্মচারীর চক্ষে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইল। শ্বেতাম্বর পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন যে, আর্য্যদের পাঁজি পুঁথি, অসার পদার্থ। চাষার গীত লইয়া বেদ, বানর ভালুকের গল্পে রামায়ণ, আর শ্রীমদ্ভাগবত এবং মহাভারতে কুরুচি পূর্ণ জঘন্য ব্যাপার ভিন্ন আর কিছুই নাই। এক্ষণে ব্রহ্মচারীকে ধর্ম্ম-কাঙ্গাল দেখিয়া, তিনি আশ্চর্য্য হইবেন কেন? বরং তত্ত্ববোধকে ইঙ্গিত করিয়া হাস্য করিলেন। তিনি ভাব ভঙ্গিতে ইহাও দেখাইলেন যে, আমি ঈশ্বরকে বেদখল করিয়া, তাঁর রাজ্য লণ্ডভণ্ড করিতেছি, তবু তিনি কিছুই করিতে পারেন না। তত্ত্ববোধ. শ্বেতাম্বরের বাহাদুরি বুঝিল; এবং হাসিয়া বলিল, গো মহিষের অপরাধ ধরিলে সংসার চলে না, এই জন্যই ঈশ্বর, নাস্তিকের অপরাধ ক্ষমা করেন। তুমি যে পরম-ধনে বঞ্চিত, তাহা তিনি জানেন। শ্বেতাম্বর বলিলেন, “আমার কি ধন নাই?” তত্ত্ববোধ উত্তর দিলেন “জ্ঞান”। সেই জ্ঞান নাই বলিয়াই তুমি পশুর সামিল। ব্রহ্মচারী মহাপুরুষ বলিলেন, না,—বৎস! তা কখনই নয়; ইনি পূর্ব্ব জন্মে মানব ছিলেন। শ্বেতাম্বর বুঝিলেন, ব্রহ্মচারী ভণ্ডামি জুড়িয়াছে, কেননা, তিনি বিলাতে থাকিয়া, নানাপ্রকার দূরবীক্ষণ, অনুবীক্ষণ দেখিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্ব-জন্ম দেখিবার যন্ত্র এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, ব্রাহ্মণকে লইয়া ক্ষণেক রঙ্গ করিয়া পরে পুলিশের হাতে দিবেন। এ বিষয়ে পিনাল কোডের কোন্ কোন্ ধারা খাটিতে পারে, তাহাও ভাবিয়া রাখিলেন। অথচ প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার পূর্ব্ব-জন্ম-বৃত্তান্ত বলিতে পারেন কি? ব্রহ্মচারী বলিলেন, তাহা অবশ্যই বলিতে পারি; কিন্তু, তাহ'লে তো পুলিষে যেতে হবে? ইহাতেই ভয় হয়। ব্রহ্মচারী তাঁর মনের কথা বলিয়া দিলেন, কিন্তু

শ্বেতাম্বর তাহাতে ভুলিবার পাত্র নহেন। কেননা, তিনি বিলাতে থাকা কালে, কে যেন তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, বৈদ্যুতিক শক্তি-প্রভাবে, একজনের মনের কথা অন্য জন জানিতে পারে। কিন্তু সেই কথা গুলি, এবং বক্তার নাম মনে আসিতেছে না। ব্রহ্মচারী প্রভু, বিনা জিজ্ঞাসায় সেই বক্তার নাম উল্লেখ করিয়া, তাঁহার কথিত সকল কথাই বলিয়া দিলেন। শ্বেতাম্বর আশ্চর্য্য হইয়া ইংরাজী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কতদিন লণ্ডনে ছিলন, এবং ঐ সাহেবের সঙ্গে কোথায় আলাপ হয়? ব্রহ্মচারী বলিলেন, আমি ইংরাজী জানি না; কিন্তু, তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি—আমি ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মচারী, কস্মিনকালেও ম্লেচ্ছ দেশে যাই নাই।

একথা বিশ্বাসই হইতে পারে না, অসভ্য ভারতে এরূপ ক্ষমতা থাকিতে পারে না ; এই ভাবিয়া, শ্বেতাম্বর পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, আপনি ম্যাজিকের দলে ছিলেন কি? ব্রহ্মচারী ইহাও অস্বীকার করায় বাঙ্গালী সাহেব ভাবিয়া অধীর হইলেন। শেষে স্থির করিলেন, তাঁহার বিজ্ঞ বন্ধু মান্দ্রাজ হইতে আসিতেছেন, তাঁহার সঙ্গে যোগ করিয়া ব্রহ্মচারীর ভণ্ডামি ধরিব। কিন্তু তিনি মুখের কথা খুলিবার অগ্রেই ব্রহ্মচারী বলিলেন, " বন্ধুর আশা করিও না, আগামি কল্য রাত্রি এক প্রহরের সময়, তিনি, জাহাজ-ডুবি হইয়া মারা পড়িবেন। এবারে ভবিষ্যৎ কালের কথা হইল, ফল-পরীক্ষার সুযোগ পাইলেন। সে দিন এই প্রসঙ্গটী চাপা রাখিয়া দক্ষিণার মোকদ্দমার কথা পাড়িলেন। কিন্তু, ব্রহ্মচারী সেজন্য ব্যগ্র নহেন, তিনি, যেন সকলই জানিয়া রাখিয়াছেন। তবে দক্ষিণা যে, বিপদে মুক্ত হইয়াছে, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দক্ষিণাকে নির্দ্দোষী বলিয়াছেন, সেই জন্য শ্বেতাম্বরের বিস্তর প্রশংসা করিলেন। ব্রহ্মচারী যে, কি জন্য এখানে আসিয়াছেন, তাহা এ পর্য্যন্ত কিছুই বুঝা গেল না। তিনি যেন কি একটা কথা বলিবার জন্য সুযোগ খুজিতেছেন, এমন সময়ে দুইটী যুবতী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইহাদের আকার এবং পরিচ্ছদে বুঝিতে পারা যায় যে, একটী ইউরোপীয় মহিলা, এবং অন্যটী দেশীয় কামিনী। ব্রহ্মচারী, ইতিপূর্ব্বে শ্বেতাম্বরের মুখেই শুনিয়াছিলেন যে, ভারতাঙ্গনাদের দুঃখমোচন করিবার জন্য, সভ্যতম দেশবাসিনী একটী যুবতী, এদেশে আসিয়াছেন। ইনিই

সেই দয়াবতী। আজি ইহার আহ্লাদের সীমা নাই, দ্বিতীয় যুবতী ভূতেশ্বরীকে, ইনিই অদ্য উদ্ধার করিয়াছেন।

মেম সাহেব শ্বেতাম্বরকে বলিলেন, "আমি বিলাতে বসিয়া যে সকল কথা বিশ্বাস করি নাই, তাহা আজি প্রত্যক্ষে দেখিলাম।" আহা! এই বালিকার ষোল বৎসর পূর্ণ হয় নাই, বিবাহের অর্থ জানে না, ইহার উপর স্বামীর অত্যাচার! বালিকা বলে, যে স্বামীর মুখ দেখিলে হৃৎকম্প হয়। তবে কি সত্য সত্যই এ দেশে, কন্যার মত না লইয়া বিবাহ করে? কি নিষ্ঠুর ব্যাপার! শুধু ইহার কথা নয়, আমি আজি ছয়মাস কাল এ দেশের গ্রামে গ্রামে ফিরিয়াছি, এবং দেখিয়াছি শতর আঠার বৎসরের বালিকারাও স্বামীর বাড়ী যাইবার সময় কাঁদিয়া অস্থির হয়। তাদের জননীদের চক্ষেও শতধারা বহে। পাষণ্ড স্বামীগুলা উহাদিগকে পাল্কির মধ্যে কয়েদ দিয়া দ্বার আঁটিয়া দেয়। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, কোন বালিকা বিনা কান্নায় শ্বশুরবাড়ী যায় না। যুবতী রমণীদের জালা যন্ত্রণা সহ্য হইয়া গিয়া থাকিবে, তাহাতেও তাহারা যাইবার সময় অল্প অল্প কাঁদে। কিন্তু বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি বঙ্গীয় কবিরা কি মিথ্যাবাদী? এই দুঃখিনী বালিকাদের হৃদয়ে প্রণয় কল্পনা করিতে কি তাঁদের লজ্জা হয় না? তাঁরা কোন্ চক্ষে এই অশ্রু-স্রোতের মধ্যে প্রেম-প্রতিবিম্ব দর্শন করিলেন? সভ্যদেশে স্ত্রী পুরুষে অপ্রণয় হইলেই, উভয়ে স্বতন্ত্র থাকে।

সম্প্রতি এই বালিকাকে উদ্ধার কর। ইহাতে যাহা ব্যয় হইবে, সমস্তই আমি দিতে প্রস্তুত আছি। বালিকার মাতা পিতাও সঙ্গে আসিয়াছে। তাহারা বিবাহ কাটাইয়া দিয়া বালিকার প্রাণরক্ষা করিতে চায়।

শুনিয়াছি ভারতে ব্রাহ্মণেরাই শ্রেষ্ঠ। এই বালিকা ব্রাহ্মণ কন্যা, ইহার পিতার কাঁধে পইতা দেখিয়াছি। যখন ইহারই এই দুর্দ্দশা, তখন না জানি ইতর নারীদের কতই যন্ত্রণা হয়।

শ্বেতাঙ্গী-কামিনী, কলির দেব কন্যা। তাঁর কথায় অবিশ্বাস করিয়া কে নরকে যাইবে? বিশেষতঃ শ্বেতাম্বর একজন চিহ্নিত ভক্ত। তিনি বরং বলিলেন, বঙ্গ-মহিলারা যত দিন পর্য্যন্ত লেখাপড়া না শিখিবে, ততদিন এই দুর্দ্দশা থাকিবে। "ইহারাই এই অনর্থের মূল" এই কথা বলিয়া ব্রহ্ম-

চারীকে দেখাইয়া তাঁর পরিচয় দিলেন ও বলিলেন ইনি একজন পরম পণ্ডিত।

শ্বেতকন্যা, এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁরে লক্ষ্য করেন নাই। ভাবিয়াছিলেন, পাখাটানা কুলি বা বাগানের মালি, বসিয়া আছে। পায়ে জুতা নাই, গায়ে জামা নাই, এরূপ মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি আছে বলিয়া কে বিশ্বাস করিতে পারে? ইনি ভারতে আসিবার পূর্ব্বে বঙ্গভাষা শিক্ষা করেন। শ্বেতাম্বর ইঁহার শিক্ষক, তিনি নিজে পদ্যপাঠ বুঝিতে পারেন না, অথচ বলিয়া দিয়াছেন, বঙ্গভাষায় সুপুস্তক নাই ও সংস্কৃত ভাষা অতি প্রাচীন বলিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে ছাত্রীর মনে বিলক্ষণ স্পর্দ্ধা আছে যে, তিনি একজন ঘোরতর পণ্ডিতা হইয়াছেন। সুতরাং সগর্ব্বে বলিলেন, পণ্ডিত জি! কপাল কুণ্ডলাকে আপনারা যে নরকে পাঠাইয়াছেন, আমার এই বালিকাটীও কি সেই নরকে যাইবে? কপাল কুণ্ডলা, কাপালিকের খড়্গে প্রাণ দেয় নাই, আর এই বালিকাও চণ্ডাল স্বামীর হস্ত হইতে প্রাণরক্ষা করিতে চায়। ব্রহ্মচারী বলিলেন, আমি কপাল কুণ্ডলার প্রসঙ্গ জানি না। "সে কি, আপনার ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করেন না? কপাল কুণ্ডলার নামও শুনেন না? তবে কি পড়িয়া পণ্ডিত হইলেন? এই কথা বলিয়া, দেবকন্যা একটু হাসিলেন।" ব্রহ্মচারী ইহাতে ভ্রুক্ষেপও করিলেন না। কিন্তু তত্ত্ববোধের গায়ে সহিল না; সে বলিল, তুমিও যেমন ভারত হিতৈষিনী, আর কপাল কুণ্ডলাও তেমনি ধর্ম্মগ্রন্থ। আবার তদনুরূপ সতী সাধ্বীটীও মিলিয়াছে। নিউটন সাহেবের ভাগ্যে বেলাভূমির উপলখণ্ড জুটিয়াছিল, আর তুমি সমাজ সাগরের তীর হইতে ঝিনুক কুড়াইয়া আনিয়াছ।

নিউটন সাহেবের নাম শুনিয়া সুন্দরী স্তম্ভিতা হইলেন। শ্বেতাম্বর তাঁর পক্ষ হইয়া বলিলেন, কেন তত্ত্ববোধ! ব্রাহ্মণ কন্যা কি সমাজ সাগরের রত্ন নহে? তত্ত্ববোধ, শ্বেতাম্বরের কথায় উত্তর না দিয়া, ভূতীকে বলিল, "স্বামি ছাড়িয়া নরকে ডুবিতে চাও কেন? ইহাতে যে, দুর্গতির সীমা থাকিবে না।"

ভূতী সগর্ব্বে উত্তর দিল, "আমি কীর্ত্তন শিখিয়াছি, থিয়টারে যাই এবং নাচিতে জানি; আমার আবার ভয় কি?।"

শ্বেত-সুন্দরী আহ্লাদে অধীরা হইয়া বলিলেন, "অসভ্য ভারত-বালার মুখে যে, এরূপ উচ্চ কথা শুনিব, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

শ্বেতাম্বর এই উপলক্ষে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অদূর ভবিষ্যতে, শ্বেতকণ্ঠে নীলপদ্মের মালা দেখিলেন। শ্বেতাম্বর হিন্দুয়ানী ভুলিয়াছেন, কিন্তু তাঁর ক্ষুদ্র পত্নীকে ভুলিতে পারেন না। বালিকা তাঁর স্মৃতিকণ্টক হইয়াছিল। সেই স্ত্রীর জ্বালায় তাঁর ইহকাল পরকাল নষ্ট হইল। স্বর্গ হাতে পাইয়াও ছাড়িয়া দিতে হইল, জর্ডন নদের জল, তাঁর পক্ষে শীতল হইল না; কেননা, হিন্দু-স্ত্রী জীবিত থাকিতে এপথে অন্য সঙ্গিনী মিলিবার যো নাই। তবে একাকী স্বর্গে যাওয়াতে ফল কি ? এই ভাবিয়া তিনি স্পষ্টই বলিলেন, "আমি মনের মত সঙ্গিনীর সঙ্গে নরকে যাইব, তথাপি ভুয়া-স্বর্গ চাই না।" দয়ালু পাদ্রি সাহেব তাহাতে হিন্দু-পত্নীকে আনিবার কথা বলিলেন। শ্বেতাম্বর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, সাহেব! পরকালে কি হইবে তা জানিনা, কিন্তু তাই বলিয়া জীয়ন্তে নরকভোগ করিতে পারি না। হিন্দু স্ত্রীজাতির সকল দোষ সারিয়া লইতে পারি, কিন্তু বার বৎসরের বালক হাত ধরিলেই যে, সিহরিয়া উঠে, আর পাতের প্রসাদ চাহিলেই যে, দাঁতে জিব কাটে, ইহা প্রাণে বরদাস্ত হয় না। এর চেয়ে বরং থিয়াটার বালার কৃত্রিম স্বামি হওয়াতে সুখ আছে। সেই অবধি শ্বেতাম্বর থিয়াটার-বালাদের পক্ষপাতী। সম্প্রতি তিনি তত্ত্ববোধকে বলিলেন, "আমিও এক সময়ে বাঙ্গালী ছিলাম, কিন্তু ইতর জাতির ঘরে এরূপ বুদ্ধিমতী বালিকা দেখি নাই। ইহাতেই বোধ হয় ভূতেশ্বরী, ব্রাহ্মণ-বালিকা।"

তত্ত্ববোধ হাসিয়া বলিল, "সাহেব! যে দেশে ফুলে গন্ধ নাই, সে দেশের লোকের চক্ষে স্থলপদ্ম ও জলপদ্ম সমান পদার্থ। তারা বাহ্য শোভা দেখিবার জন্য নয়ন পাইয়াছে। কিন্তু তুমি কিরূপে একথা বলিলে ? সমাজ-সরসীর পদ্মিনী কি এইরূপে হাটে মাঠে প্রফুল্লিতা হয় ? আর সতীত্ব সৌরভ কি ভুলিবার জিনীস ? লজ্জা-নম্রমুখী পতিব্রতার বিমল মুখমণ্ডল, যদি তোমার হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিত, তাহা হইলে তুমি এই ভূতীকে দেখিয়া, পিশাচী বলিয়া ভয় পাইতে; কিন্তু শৃগাল কি মৃগনাভির গৌরব জানে ? সে মাংস পাইলেই সন্তোষ।

এই কথায় শ্বেতাম্বরের হৃদয় দুলিয়া উঠিল। তিনি বিমর্ষ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। চতুরা ভূতী, বেগতিক দেখিয়া বলিল, বিবি মা! ঐ দেখুন, সন্ন্যাসী ছোঁড়া সাহেবকে কুপরামর্শ দিতেছে ও বলিতেছে, "আমি বামুনের মেয়ে নই।"

শ্বেত সুন্দরী স্বচক্ষে ভূতীর বাপের পইতা দেখিয়াছেন; তাঁর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল; তিনি বলিলেন, বাঙ্গালীরা কেবল মিথ্যাকথা বলিবার জন্য জিহ্বা পাইয়াছে। জন্মমাত্র এই জিব কাটিয়া দিলে, জগতের প্রকৃত উপকার হয়; তাহা হইলে বানরভ্রমে গুলি করিলেও কথা জন্মায় না। কিন্তু, ভারতের মাটির কি চমৎকার গুণ! যারা বিলাতে গিয়া মানুষ হয়, তারাই আবার দেশে ফিরিলে, পুনরায় পশুত্ব প্রাপ্ত হয়; তাহা না হইলে মিথ্যা কথায়, কাণ দেয় কেন?।

টিয়াপাখীর "রাধাকৃষ্ণ" বুলিও কর্কশ, কিন্তু কোকিলের কু-বোলে সকলেই মোহিত হয়। সুন্দরীর মিষ্ট ভর্ৎসনে শ্বেতাম্বর স্তব্ধ হইলেন। এই সময়ে সুন্দরী, ব্রহ্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এই জন্যই বলিতে হয়, হিন্দুদের হিতাহিত জ্ঞান নাই। এরূপ সভ্যজাতির সংসর্গ পাইয়াও আপনাদের উন্নতি করিতে পারিল না। আমেরিকার আদিম নিবাসীরা ইহাদের চেয়ে শতগুণে শ্রেষ্ঠ। তাহারা একশত বৎসরের মধ্যে আপনাদের তাম্রবর্ণ ঘুচাইয়া সুন্দর শ্বেতবর্ণ হইয়াছে। এক সময়ে সেখানে অন্য একজাতির মানুষ ছিল, আজি কাল আর তাহা জানিবার যো নাই; সকলেই, একবর্ণ হইয়াছে ও তাহাদের চিহ্ন পর্য্যন্তও লোপ পাইয়াছে। ইহা কি কম গৌরবের কথা? স্ত্রী-স্বাধীনতাই এই উন্নতির মূল। কি মূর্খতা! হিন্দুরা ইহাতেই বাধা দিতে চায়।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "মা! পতিহীনা অপেক্ষা, পতিত্যাগিনীর দুর্গতি বেশী," ভূতী আর তাঁহাকে কথা কহিতে না দিয়া, তাড়াতাড়ি বলিতে লাগিল, "বিবি মা! এঁদের দুজনের কথাই মিথ্যা, স্বামী মরিলেও ক্ষতি নাই, আর স্বামীত্যাগী হইলেও দুঃখ নাই। আমার মাতামহী এজন্মে স্বামীর-মুখ দেখে নাই, আমার মা, দশ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছেন; তাই বলিয়া কি তাঁদের মুখে মণ্ডা, মিঠাই, তিক্ত লাগে,—না তাঁহাদের

সন্তান সন্ততি হয় নাই? আর স্বামী কি মা'র পেটের ভাই যে, তিনি মরিয়া গেলে, কাঁদিয়া আকুল হইতে হইবে? কণ্ঠিবদল সুখে থাকুক, রাঙ্গের স্বামী মরিলে, সোণার স্বামী পাওয়া যায়।

ব্যারিষ্টর শ্বেতাম্বর জানিতেন যে, হিন্দু আইনে একটা জঘন্য ব্যবস্থা আছে। পতি জীবিত থাকিতে দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিলে, হিন্দু মহিলার দণ্ড হয়। এক্ষণে, সেই সন্দেহভঞ্জন করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইরূপ ব্যাপার ঘটিলে স্ত্রীলোকের দণ্ড হয় না কেন?।"

ভূতী বলিল, সে অতি সামান্য দণ্ড; পাঁচ সিকা দিলেই নিশ্চিন্ত। ধরিতেও পাঁচ সিকা, আবার ছাড়িতেও পাঁচ সিকা। আর এরূপ বাঁধাবাঁধি না করিলেও চলে; কেবল সন্তান হইবার পর কিছু পয়সা খরচের আবশ্যক। পাঠক ভাবিবেন, শ্বেতাম্বর বাঙ্গালী হইয়া কি নেড়া নেড়ীর কাণ্ড ভুলিয়া গেলেন? কিন্তু তাহা নহে, তিনি ভুলিবেন কেন, তবে পূর্ব্বকথা স্মরণ করিতে গেলে পাছে বাঙ্গালী হইয়া পড়েন, এই জন্য চাপিয়া রাখিয়াছেন।

শ্বেতকন্যা গম্ভীরভাবে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "যখন স্বধবার পতিত্যাগ ব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত আছে, তখন স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, হিন্দুরাই জগতের আদি সভ্য। আর পণ্ডিতেরা যে বলিয়া থাকেন, ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণেরা সুবিধাজনক ব্যবস্থাগুলি আপনাদের জন্য বাছিয়া রাখিয়াছে, তাহাও ঠিক। কেননা, অবোধ শূদ্রজাতি ইহাতে বঞ্চিত আছে। আজ কাল সকলেরই চক্ষু ফুটিতে চলিল, আর চাতুরী খাটিবে না। আমরা সমস্ত হিন্দু মহিলার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব এবং জগতের লোককে দেখাইব যে, বিদ্যাসাগরের ক্ষমতায় এতদূর হয় নাই। ইহা কেবল সৎসঙ্গ এবং সাধু সমাগমের ফল।"

এই সময়ে ভূতেশ্বরীর পিতা মাতা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভূতীর পিতার নাম ভণ্ডুল গোশাঞি। ভণ্ডুল, নিত্যানন্দ গোস্বামির বংশধর; তবে এক্ষণে ভূতীর জননীর অনুরোধে, কালীঘাটে ডালাধরার ব্যবসা করেন, এইজন্য রুদ্রাক্ষমালা এবং রক্তচন্দন ব্যবহার করেন। ভূতীর মা, জগদম্বার প্রসাদী মাংসের দোকান খুলিয়াছে। ভূতীর মাতামহী ব্রাহ্মণ কন্যা, গৃহবাসে সন্তান সন্ততি হয় নাই; একজন রামায়ৎ বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদে,

ভূতীর জননীর জন্ম হয়। শুনিতে পাওয়া যায় তার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু সে স্বামীর, উদ্দেশ পাওয়া যায় না।

ভূতীর স্বামী হটু ঠাকুর, কুলীন-কন্যার গর্ভজাত। তাঁর জননী বালিকা-কালে বিধবা হইয়া, কলিকাতায় পাচিকাবৃত্তি করিবার সময়ে এই পুত্ররত্ন লাভ করেন। হটু আত্মবিস্মৃত ছিলেন, পিতার নাম জানিতেন না, এইজন্য পূর্ব্বে চক্রবর্ত্তী বলিয়া পরিচয় দিতেন। এক্ষণে তিনি হটুচন্দ্র চট্টরাজ। তাঁর অদৃষ্ট মন্দ বলিয়াই, তাঁর জননীর স্বামী অকালে মরিয়াছেন, তাহা ন হইলে আজি এই হটুচন্দ্র কত শত কুলবতীর মাথায় পা দিয়া ডুবাইতেন। এই ভূতীর জন্য পথে পথে কাঁদিবেন কেন?।

শ্বেতাম্বর কলিযুগের ঋষ্যশৃঙ্গ। বিভাণ্ডক তনয়ের মত ইনিও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সঞ্চালনে, পিতার উপদেশজাল খণ্ড খণ্ড করিয়া, অপূর্ব্ব তপস্বীর সঙ্গে জাহাজ আরোহণে রাজধানীর দিকে ছুটিয়াছিলেন। তিনি এক গণ্ডুষ চিনির জল বদনে দিয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁর তত্ত্বজ্ঞান গলিয়া যায়। আমাদের ঋষ্যশৃঙ্গ শত শত বোতল সুধা গলায় ঢালিয়াছেন, তথাচ তাঁর দিব্যজ্ঞান আছে। ইহাতেই, আধুনিক পণ্ডিতমণ্ডলীর মতে, ইনি তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হিন্দু-দের শাস্ত্র সংহিতায় যে ছাই ভস্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই, তাহা এই ঋষি-রাজই দেখাইয়া দিয়াছেন।

হটুচন্দ্র, ভূতীকে পাইবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের হজুরে দরখাস্ত দিয়াছে। ইংরাজের আইনে, স্ত্রীলোকের স্বেচ্ছাচারিণী হইবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে সত্য, কিন্তু চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত সে অধিকার, সে পায় না। অভিভাবকের অধীনে তাহাকে থাকিতে হয়; এই সূত্রেই ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব পরওয়ানা বাহির করিয়াছেন। সুতরাং এস্থলে বয়স লইয়াই মোকদ্দমা। শ্বেতাম্বর সাহেব আইন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভূতে-শ্বরীর বয়স কত?।"

ভণ্ডুল এ সকল সন্ধান জানেনা, সে বুঝিয়াছে বয়স অল্প হইলেই কন্যা, পিতামাতার নিকটে থাকিতে পাইবে; এই ভাবিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "ভূতীর বয়স তের বৎসর।"

শ্বেতাম্বর মুখ বিকৃত করিয়া রহিল, কিন্তু গণ্ডমূর্খ ভণ্ডুল, তাহা বুঝিতে

পারিল না; সে আরও দ্বিগুণ ব্যগ্রতার সহিত বলিল, "বাবুজি মহাশয়! আমি দৈবজ্ঞ সাক্ষীর যোগাড় করিয়াছি, তিনি কোষ্ঠীর সহিত বয়ঃক্রম মিল করিয়া, যথার্থ প্রমাণ দেখাইবেন।"

"বাবু" সম্বোধনে, সাহেব, জলিয়া উঠিলেন। কাগজ পত্র ছিঁড়িয়া, উচ্চৈঃস্বরে বেহারাকে হুকুম দিলেন, "ইস্‌কো আবি নেকাল দেও।"

হতভাগা ভণ্ডুল তবুও বুঝিল না; সে, আবার কাতরস্বরে, যতই "দোহাই বাবুজী," "দোহাই বাবুজী" বলিয়া পায়ে ধরিতে যায়, তিনি ততই অগ্নি-অবতার হইয়া, "নেকালো," "নেকালো" শব্দ করেন। ঘোর গণ্ডগোল উপস্থিত। আগুণে ছাই চাপা দেয় বলিয়া, ভণ্ডুল ঠাকুর বারুদ চাপা দিতে গেলেন। তিনি জানেন, বারুদ, ঐ ছাই ভস্মের সামিল।

ভূতীর মা, শ্বেতাঙ্গীর ইঙ্গিতে, ভণ্ডুলকে ঠেলিয়া, আপনি যাইয়া জানু পাতিয়া বসিল, এবং "দোহাই সাহেব." "দোহাই হুজুর" ইত্যাদি শব্দের শীলাবৃষ্টি করিল। শ্বেতাম্বর একবারে জল হইয়া গেলেন। ইহার পরে ভূতীর মা বলিল, "ভূতী পনর পার করিয়া ষোল বৎসরে পা দিয়াছে।"

শ্বেতাম্বর মহাসন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভূতী স্বামীর প্রতি নারাজ কেন?" ভূতীর মা ইহার উত্তর দিতে পারিল না। কিন্তু শ্বেতসুন্দরী তার পক্ষ হইয়া বলিতে লাগিলেন, "সাধে কি বলিতে হয়, ভারতের মাটির দোষ? হিন্দুর অন্তঃপুর দায়মালি জেলখানা? স্ত্রীলোকেরা তুরুকের ক্রীতদাসীর ন্যায় যাবজ্জীবন যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে,—ইহাতেও কি অসন্তোষের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে হয়? আমি একদিনের জন্য যদি ভারতের শাসন-ভার পাই, তাহা হইলে এই অন্তঃপুরগুলা তোপে উড়াইয়া দিয়া, অনাথিনী অবলা-কুলকে রাজপথে বাহির করি।"

তত্ত্ববোধ, "হো" "হো" শব্দে হাসিয়া উঠিল। শ্বেতাম্বর হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করায়, বলিতে লাগিল, "আজি প্রাতে যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহাই মনে পড়ায় হাসিতেছি।" শ্বেতাম্বর সুধাইলেন, "কি দেখিয়াছেন?" তত্ত্ববোধ বলিল, "একটী স্ত্রীলোক দুইটী হাঁসকে জলে ফেলিতেছিল; অদূরে একটী পাগল দাঁড়াইয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি আসিয়া স্ত্রীলোকের হাত ধরিল। হাঁসকে কোনক্রমেই জলে ফেলিতে দিবেনা; একে দারুণ শীত-

কাল, তাতে ভোরের সময়, ইহাতে কি এরূপ নিষ্ঠুর কায করিতে আছে, এই বলিয়া তুমুল ঝগড়া বাধাইল। হাঁস দুটা এই গোলযোগে লাফাইয়া জলে পড়িয়া গেল। পাগল, দুঃখে কাতর হইয়া জলে নামিল। হাঁস না তুলিয়া উঠিতে চায় না; সে জলচরের শীতের দুঃখে আকুল হইল।"

তত্ত্ববোধ এই কয়েকটী কথা ইংরাজী ভাষায় বলিলেন; ইহাতে শ্বেতাম্বর মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

ইংরাজী জানিলে সাত খুন মাপ হয়; আর তাহাকে জানোয়ার বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলে না। সুতরাং শ্বেত-কুমারী, ইহার উত্তর দিতে বাধ্য হইলেন। তিনি ভূতেশ্বরীর দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিলেন, "বাবু! এ দেশের জলচরের গ্রীষ্ম বেশী, ঐ দেখ, তোমাদের সমাজ-হংসী, জলছাড়া হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে।"

তত্ত্ববোধ এমন সুযোগ ছাড়িবে কেন? বলিতে লাগিল, "মালক্ষ্মি! ভেকগুলাও একসময়ে জলচর থাকে, পঙ্কিল জলে উহাদের জন্ম হয়, দিনকতককাল লেজ নাড়িয়া জলে খেলা করে; তার পর লাঙ্গুল খসিলেই চারি পায়ে ভর দিয়া পৃথিবীকে রসাতলে পাঠাইতে চায়। সম্প্রতি তোমার ভূতেশ্বরীর উল্লম্ফন প্রলম্ফনের পালা উপস্থিত, ভুজঙ্গমের গ্রাসে পড়িলেই সমস্ত নিবৃত্ত হইবে। সমাজ-জঙ্গলে অনেক ভুজঙ্গম লুকাইয়া থাকে। মা! আমি রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি কিছুই জানি না; তথাপি আপনাদের পরার্থপর হৃদয়কে নমস্কার করি। বিপুল কলেবর হিন্দু সমাজ মৃতপ্রায় হইয়াছিল, আপনাদের ডাক্তারি চিকিৎসায় পুনর্জ্জীবন পাইল, একথা স্বীকার না করিলে নরকে যাইতে হয়। তবে ইহাতে একটু গোল বাধিয়াছে; আমরা আমাদের স্মৃতি-ভাণ্ডারে যে সকল অমূল্য অমৃত দেখিতেছি, ডাক্তার তাহা দেখিতে পাইলেন না, সুতরাং তিনি শাক, কচু ইত্যাদি পথ্য দিতে চাহেন। এঁরা যদি জানিতেন যে, এই পুণ্যভূমিতে তত্ত্বজ্ঞানের চাষ করিলে ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে, (ও এখনও তার বীজ, ভাণ্ডারে মজুত আছে), তাহা হইলে কখনই এখানে বাইবেলের বীজ ছড়াইতেন না। বিশেষতঃ আপনি যদি জানিতেন যে, এই ভারত, সতী সাবিত্রীর লীলা-ভূমি, এখনও বালিকারা সাঁজুতি ব্রত উপলক্ষে সতীত্ব শিক্ষা করে, এরা

জগতে পতি বই আর কিছুই জানে না, পতির পদ-পল্লবে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ পায়, সেই গরবে এরা ত্রিদশনাথ ইন্দ্রের বৈজয়ন্ত পুরীকে বাম পদ দ্বারা স্পর্শ করে না, তাহা হইলে আপনি কি আজি বিবাহকে ব্যবসার জিনিস বলিতে সাহসী হইতেন ? । হায় ! যে ভারত-সতী, পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে, পুত্র কন্যার কান্নায় কাণ দেয় নাই, পাদরি সাহেবের উপদেশে কাণে হাত দিয়াছে, " ঐ আমার পতি ডাকিতেছেন," বলিয়া জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়াছে, সেই অনলরাশির মধ্যে মৃতপতিকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়াছে, সেই কুলবতীই কি আজি পতিত্যাগের জন্য আপনার শরণাগতা ? যদি তাহাই হয়, তবে ভারতবৈরী মুসলমানেরা, ভারতের সর্ব্বনাশ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া যাহা করিতে পারে নাই, আজি আপনারা বন্ধুভাবে তাহাই করিলেন। দাম্পত্য-প্রণয় যদি পণ্যদ্রব্য হয়, তাহা হইলে সমাজের পুনর্জ্জীবন ঘোর বিড়ম্বনা, ইহার চেয়ে ভারতভূমি রসাতলে যাওয়াই শতগুণে ভাল। কিন্তু মা ! দয়াময় জগদীশ্বর, এমন সর্ব্বনাশ করিবেন না। আপনার এই ভূতী স্বতন্ত্র জীব। ভূতী কখনই হিন্দুকুলের কুলবতী নয়। আপনি এদেশে না আসিলেও, উহার স্বামী উহাকে লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিতে পারিত না। বিধাতা যে উপাদানে এই নারকীর দেহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে ঘৃণা, লজ্জা, দয়া, ধর্ম্ম, স্নেহ, মমতা আদি কিছুই নাই, ইহারা একপ্রকার স্বষ্টিছাড়া জীব ; জগতে ইহাদিগকেই বেশ্যা বলে।"

তত্ত্ববোধের ক্ষুদ্র বক্তৃতায়, শ্বেতাম্বর এবং শ্বেতসুন্দরীর হৃদয় বিচলিত হইল। সুন্দরী বুঝিলেন, এখনও তাঁর সমাজতত্ত্ব জানিতে ঢের বাকী আছে। আধুনিক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত কিনিবার জন্য বাজারে লোক পাঠাইলেন। ইত্যবসরে ব্রহ্মচারী ঠাকুর তত্ত্ববোধকে লইয়া বিদায় হইলেন। সতী-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে তত্ত্ববোধের বড়ই আনন্দ জন্মিয়াছে। পথে আসিতে আসিতে গুরুদেবকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, " প্রভো ! আপনি আমাকে যখন জলবালাঘটিত দারুণ পরীক্ষায় ফেলিয়াছিলেন, তখন আমার হৃৎকম্প হইতে লাগিল ; ভাবিয়াছিলাম গুরুদেব উভয়কেই নরকে পাঠাইলেন। জলবালা একে বিধবা, তাতে তার রূপ দেখিলে মুনির মন টলে ; কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! সেই নবীনা বিধবাই

আমাকে ইন্দ্রিয়-সংযম শিক্ষা দিল। সে. তার পুণ্যবলেই অল্পদিনে দারুণ বৈধব্য-জ্বালা এড়াইল। বিধাতা তারে যোগ্যধামে লইয়া গেলেন। তবে আর এ অভাগা সংসার-যন্ত্রণা পায় কেন? আমারে দীক্ষা দিয়া তত্ত্ববোধ নাম সার্থক করুন। ব্রহ্মচারী জানেন, তত্ত্ববোধ সংসারে বিরক্ত; অথচ বৈরাগ্যের কারণ খুলিয়া বলে না। ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ তাহা জানিতেন কি না, তাও সে কোন দিন ভাবে নাই। এদিকে ব্রহ্মচারীর কৃপায় প্রশ্ন গণনা আদি নানাবিধ বিদ্যা শিখিয়াছে; কিন্তু সে, তাতে ভুলিবে কেন? ব্রহ্মচারী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন. "বৎস তত্ত্ববোধ! স্বার্থপর ব্যক্তির কি তপস্যা আছে? হৃদয় নির্ম্মল না হইলে কি তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে?" "দেব! এখনও আমারে স্বার্থপর বলিবেন?" এই বলিয়া তত্ত্ববোধ, ঘাড় হেঁট করিল। ব্রহ্মচারী বলিলেন, "বৎস! এক কুলাঙ্কক, শত শত নর নারীকে লইয়া নরকের পথে ছুটিতেছে। ভারতে এমন শত শত কুলাঙ্কক আছে; ইহাদের জন্য তোমার মনে কোন চিন্তাই নাই, তুমি নিজের জন্যই মহাব্যস্ত। নির্জ্জনে সমাধি করিয়া আনন্দ ভোগ করিবে, এই জন্যই পাগল। তবে আর স্বার্থপরতা কাহাকে বলে? তুমি পরম পুরুষের সম্মুখে কি বলিয়া দাঁড়াইবে?"

কুলাঙ্ককের নাম শুনিয়া, তত্ত্ববোধের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। ব্রহ্মচারী ঠাকুর, তাহাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা করিলেন, তাহা আমরা জানিতে পারিলাম না। এঁরা দুজনেই গঙ্গাতীরের বাঁধাঘাটে সাধু সন্ন্যাসীর দলে মিশিয়া গেলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মহানগরীর অনতিদূরে পিয়ারা কাননের মধ্যে কতকগুলি পর্ণ-কুটীর দেখিতে পাওয়া যায়। অধিবাসীরা অতি সরল লোক, প্রাণ গেলেও আদালতে যাইতে চাহে না। একজন পেয়াদাকে দেখিলেই ঘরে খিল দেয়। গ্রামের নটচন্দ্র বাবু এখানকার পঞ্চায়ৎ। এই ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসনভার তাঁর হস্তে সমর্পিত আছে। অন্য দুইজন পঞ্চায়ৎ আছেন সত্য, কিন্তু কেবল ঢেরা সই দিবার সময়ে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। নটুবাবু বাল্যকালে কিছুদিন কলিকাতায় ছিলেন, প্রায় এক শত, দেড় শত ইংরাজী কথা জানেন, সুতরাং বাবুগিরিতে তাঁর অধিকার আছে। নটুবাবু নিজ মুখে বলেন যে, তিনি ধনের গরব করিতে চাহেন না, ইহাতেই আমরা তাঁর বিষয় বৈভবের পরিচয় দিতে পারিলাম না। তবে তাঁর অধীন প্রজাবর্গ সর্ব্বদাই অহঙ্কার করিয়া বলিয়া থাকে যে, "নটু বাবুর পাঁচ শত টাকা নগদ আছে। বাবু নিতান্ত উদার, পরোপকার-ব্রতের জন্য, তাঁহাকে সর্ব্বদা ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়। গ্রামের লোককে টাকা ধার না দিয়া থাকিতে পারেন না, কিন্তু এমনি কালের দোষ, যে ব্যক্তি এক টাকা ধার লইল, সে, এক বৎসরের মধ্যে দশ টাকা বাকী ফেলিল। ধান খড় বিক্রয় করিয়া আটটী টাকা আদায় হইলেও, দুইটী টাকা গর্ভ-লোকসান; সুতরাং সেই টাকা দাতব্য খাতায় খরচ লিখিতে হয়, এইরূপে অনেক টাকা দান আছে নটু বাবুর পালন গুণে বন্য শুকরেরা পালে পালে আসিয়া স্ত্রী-পুত্র সহ বসবাস করিতেছে। শৃগালকুল মৌরুসী পাট্টাদার প্রজা; ইহারা প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে, বাবুর বাড়ীর নিকটে সভা সমীতি করিয়া উর্দ্ধমুখে বক্তৃতা করে। সভ্যতার অনুরোধে বাবু তাহাতে কখনই বাধা দেন না।

ফাঁসীর উপযুক্ত মোকদ্দমা না হইলে আর নটু বাবু মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে কষ্ট দিতে চাহেন না, নিজেই একপ্রকার মিট্‌মাট করিয়া ফেলেন।

গ্রামের সর্ব্বস্থলেই নট্ট চন্দ্রের গুপ্তচর ফিরিতেছে, প্রজা সাধারণ তাঁর নামে কাঁপে ; তিনিই ইহাদের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। নট্টচন্দ্রের উপরে যে আবার কেহ হাকিম আছেন, ইহা অনেকেই বিশ্বাস করে না।

এই পিয়ারা গ্রামের চারিদিকে দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত জলাভূমি। এই জলা বার মাস জলে ডুবিয়া থাকে। ডোঙ্গা কিম্বা সাল্‌তি ভিন্ন গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্রে যাইবার উপায় নাই ; সুতরাং গ্রামের বহুতর লোক ইহজন্মে কখন গ্রামান্তরে যায় নাই।

এই পিয়ারা গ্রামে ভুলু ঠাকুরের বাস। ভুলুর বিবাহ হয় নাই, তিনি একটী কুমারীকে লইয়া এই স্থানে থাকেন। কুমারী ঠাকুরাণী কুলিন-তনয়া, তাঁর সমযোগ্য বর পাত্র জুটে নাই, এবং ভুলু ঠাকুর বংশজ ব্রাহ্মণ, তাঁর ভাগ্যে পনর টাকার যোগাড় হইল না। এঁদের দুজনের দুঃখ একই প্রকার ; সুতরাং দুইজনে একত্রে মিলিয়া, এই নির্জ্জন স্থানে মনের খেদ মিটাইতে আসিয়াছেন। ইহাকেই বলা যায়, " কাঁদেরে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে।"

এ অবস্থায় ভুলুর একটী কন্যা হইয়াছে। সেই কন্যার নাম বিধুমুখী। বিধুমুখীকে একজন ব্রাহ্মণ বিবাহ করিয়াছেন, তাঁর দুইটি শিশুসন্তান হইয়াছে ভুলুঠাকুর ব্রাহ্মণ সমাজে পতিত। নট্টচন্দ্র এই বিধুমুখীর রূপে মোহিত হইয়া, নানা প্রকার চক্রান্ত করেন। তাহাতে কি ফল হইয়াছিল, তা আমরা বিশেষ জানি না, তবে সেই সময়ে নট্ট বাবুর বাম কর্ণটী ছিন্ন হইয়া যায়, এবং তার পরে বিধু প্রায় তিনবৎসর কাল এদেশে ছিলনা. এক্ষণে আবার আসিয়াছে। ভুলুর বাড়ীর নিকটে "রামের মা" নামে এক মাগি তেলীর মেয়ে বাস করে। সে মাগী পূর্ব্বে কলিকাতা অঞ্চলে ছিল, তাহার ভয় ডর নাই, গ্রামের সকল লোক নট্টবাবুর পদানত, কিন্তু তিনিও এই রামের মাকে দেখিলে পাশ কাটাইয়া পথ চলেন। কোন সময়ে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব এই গ্রামে আসিয়াছিলেন। গ্রামের লোক তাঁহাকে দেখিয়া গা-ঢাকা দেয়, কেবল এই রামের মা তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়া, তাঁর মন রক্ষা করে। সেই অবধি রামের মার জহুরো প্রকাশ পাইয়াছে। রামের মা প্রতিদিন মাঠ পার হইয়া নগরে তরকারি বিক্রয় করিতে যায়, এবং এক এক খানি খবরের কাগজ আনিয়া ভুলুর বাড়ীতে দেয়। বিধু সামান্য লেখা পড়া জানে,

আজি কয়েকদিন হইতে একটী যুবতী আসিয়া এখানে সঙ্গোপনে আছে। সেই যুবতীই এই সংবাদ পত্র শুনিতে ভাল বাসে। এক দিন অপরাহ্নে, বিধু সংবাদ পত্র পড়িতেছে, তাহাতে এইরূপ লেখাছিল,—

" স্ত্রীলোকের হাতে পড়িয়া, বসুবংশের অতুল ঐশ্বর্য্য ছিন্ন ভিন্ন হইল। বিলাত ফেরত অহিন্দু শ্বেতাম্বরের মুখে হিন্দু শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া, জজ সাহেব পোষ্য-পুত্র অগ্রাহ্য করিলেন। ইহা শাস্ত্র সঙ্গত অর্থ বটে, কিন্তু শ্বেতাম্বরের কথা অগ্রাহ্য করিলে, হিন্দু সমাজের মান থাকিত; এই জন্যই বলিতে হয় যে, বিদেশী বিধর্ম্মীর হাতে ন্যায় বিচার হয় না, পাপিষ্ঠা দক্ষিণা তেমন সোণার পোষ্য-পুত্রকে বিসর্জ্জন দিয়া, তার জলবালার জন্য ব্যাকুল হয়েছে। রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিয়া কাশীতে জলবালার শ্রাদ্ধের উদ্যোগ করে। শুনিলাম সেই ভণ্ড ব্রহ্মচারী ঠাকুর তাহাতে বাধা দিয়াছে। তার পরে আর দক্ষিণার অন্বেষণ পাওয়া যায় না। কেহ বলে অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কেহ বলে তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়াছে। বোধ হয় জলবালার মৃত্যু বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত তার সন্দেহ ঘুচে নাই। জীবন বাবু এপর্য্যন্ত নবনগরীর বাড়ীতে নির্ব্বিঘ্নে আছেন। দক্ষিণা নিরুদ্দেশ হইলে একপ্রকার মঙ্গলের বিষয় বটে।"

বিধু পড়িতে পড়িতে চাহিয়া দেখিল, যুবতীর চক্ষে জল পড়িতেছে। বিধু জানিত পরের দুঃখ শুনিলেই যুবতী কাতরা হয়। সে, তখনি কাগজ পড়া বন্ধ করিল। বিধুর মা আসিয়া বলিতে লাগিল "যারা কাগজ বিক্রী করে তাদের কি ধর্ম্ম কর্ম্ম নাই। রামের মা লেখা পড়া জানেন না বলিয়া কি এমন করিয়া ঠকাইতে হয়? আমি কি পয়সা দিই নাই যে দুঃখের কাগজ দিয়াছে। জননীর কথা শুনিয়া বিধু হাসি চাপিতে পারিল না। জননীকে খবরের কাগজের মাহাত্ম্য বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। সে, তা কোন ক্রমেই বুঝিল না, "কে জানে মা আমি এমন কথা তো কখন শুনি নাই, বলিতে বলিতে চলিয়া গেল। যুবতী, বিধুর কাণে কাণে বলিল "দিদি প্রকাশ করিও না আমিই সেই অভাগিনী জলবালা। আমার তিন কুলে কেউ নাই। বিধু বিস্ময় হইয়া জলবালার দুঃখের কাহিনী শুনিতে লাগিলেন, সে রাত্রি ইহাতেই কাটিয়া গেল। পরদিন অপরাহ্নে দুইজনে গৃহ মধ্যে

বসিয়া আছেন। বিধু বলিতেছে "দিদি আমার জননীর কপালে কলঙ্ক ছিল, তাহা কিরূপে খণ্ডন হইবে, কিন্তু আমি যেন জন্মে জন্মে এমন মা পাই, ওঁর গুণেই আমার সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা হইয়াছে। উনি সতী লক্ষ্মীকে বড় ভাল বাসেন, উনি যদি শুনিতেন যে তুমি দারগা বাবুর স্ত্রী নয়, তাহলে তোমাকে কখনই বাড়ীতে রাখিতেন না। কিন্তু দিদি, তুমি কেমন করিয়া এত অপমান বরদাস্ত করিলে? পাপিষ্ঠ নটচন্দ্র যখন আমার উপর অত্যাচার করিয়াছিল তখন যদি আমি একখানি ধারাল ছুরি আঁচলে বাঁধিয়া রাখিতাম, তাহলে পাপিষ্ঠ নিকটে আসিলেই উহার গলায় বসাইয়া দিতাম। জলবালা বলিল—"না দিদি তুমি জাননা দারগা বাবু আমার বড় হিতৈষী, আমি তাঁরে বড় ভালবাসি। তিনিই আমার দারুণ বৈধব্য-জ্বালায় জল দিবেন। আমি কেবল তাঁর মুখ চাহিয়া আছি।

বিধুমুখী ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিল এবং মনে মনে ভাবিল এ পাপিনী বাড়ী হইতে বিদায় হইলে বাঁচি ; আর মুখ ফেরাইয়া বলিল "এরূপে অধঃ-পাতে যাওয়ার চেয়ে বিধবা হইয়া বিবাহ করা ভাল।"

জলবালা হাসিয়া বলিল "আমি বিবাহের সকল উদ্যোগ করিয়াছি, কেবল শুভ-লগ্ন পাইলেই কার্য সম্পন্ন হয়।

বিধুমুখী বলিল "তবে কি সেই পাপিষ্ঠই বিধবা-বিবাহ করিবে? তার ঘরে সতী লক্ষ্মী স্ত্রী আছে, কর্ম্মস্থানে একটা বৈষ্ণবী আছে, আবার এই!"

জলবালা বলিল—"না—না, তিনি যে কন্যা কর্ত্তা, তিনি বাপের কার্য্য করিবেন। তিনিই উৎসর্গ করিয়া দিবেন।

বিধুমুখী বলিল, "তিনি যদি কন্যা-কর্ত্তা, তবে আবার বিবাহ কর্ত্তা কে? বর পাত্রটী কোথায়?।"

জলবালা বলিল "দিদি "বর পাত্র স্বয়ং অগ্নি ঠাকুর। তিনি ভিন্ন আর এ জগতে বিধবা-বান্ধব কে আছে বল? তোমার প্রতি শয্যা রচনার ভার দিয়া যাইব ; চারি পাঁচ টাকা খরচ করিলেই হইবে, আমার মা নাই, কে এ সকল উদ্যোগ করিবে? কিন্তু তিনি থাকিলে, হয় তো এই-বিবাহে কতই বাধা দিতেন ; এই কথা বলিতে বলিতে জলবালার চক্ষে শত ধারা বহিল, বিধু বিস্ময় হইয়া সান্ত্বনা করিতেছে এমন সময়ে দেখিল উঠানে নটচন্দ্র

উপস্থিত। বিধু বলিল "হতভাগাকে দেখিলে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায়। একটা কান গিয়াছে তথাপি লজ্জা নাই।"

নটচন্দ্র আজি মনের সাধে সাজিয়াছেন। তাঁর বয়স কত হইয়াছে তাহা জানিবার যো নাই। তাঁর পিতা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে মরিয়াছে, কোষ্ঠীখানি কীটে নষ্ট করিয়াছে, তবে বিধাতার শ্বেতচিহ্ন ঢাকিবার জন্য, মাথায়, গোঁপে এবং বুকের চুলগুলিতে গাঢ় কলপ দিয়াছেন। বাঁকা সীতায় চমৎকার শোভা হয়েছে। উদরটী নিতান্ত লম্বা বলিয়া একটী পিরান ঢাকা দিয়াছেন, কিন্তু পাছে বুকে কাল চুলগুলি ঢাকা পড়ে এইজন্য পিরানের বোদাম আঁটেন নাই। হাতের ছড়িটী ঘুরাইতেছেন।

ভুলু, তাড়াতাড়ি আসন দিয়া তামাক সাজিয়া ধরিল। নটু বাবু তারে ধমক দিয়া বলিলেন, "হুঁকা তফাৎ কর, আমি ঘুষ খোর হাকিম নই। আমি আজ তোমার বাড়ীতে জল-গ্রহণ করিব না। তুমি এখন খুনি মোকদ্দমার আসামী। ভুলু অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

নটু আবার বলিতেছে "খুন এবং গর্ব্ভপাত সমান কথা, তোমার বাড়ীতে গর্ব্ভবতী বিধবা আছে। আমি সঠিক সংবাদ পাইয়াছি।"

ভুলু বলিল "হুজুর! আমি ইহার কিছুই জানি না। যে ব্যক্তি ইহাকে রাখিয়া গিয়াছে আমি তারে আনিতে পাঠাইয়াছি, কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা করুন।" নটু বলিলেন "আমি কোন ওজর শুনিতে চাহি না। আমি স্বয়ং গর্ব্ভ পরীক্ষা করিব, স্বকর্ণে তার এজাহার শুনিব। সে স্ত্রীলোক কোথায়?"

এই গোলযোগের সময় রামের মা, এক বাজরা ঘাড়ে করিয়া হাজির হইল। ভুলু তাহাকে দেখিয়া বলিল "কই রামের মা, ইনি কোথায়? আমাকে যে ঘোর বিপদে ফেলিয়াছেন; মেয়েটীর যে গর্ব্ভ হয়েছে। রামের মা বলিল সে কি কথা ঠাকুর? উহাকে ভূতে পেয়েছে, আজি ছমাস কাল ভুগিতেছে, ভূতের ভয়ে গঙ্গাপার করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে আবার গর্ব্ভ কোথায়? আমি নিজে গিয়া মেজেষ্টর সাহেবকে বলিব যে, এ সকল মিথ্যা। এমন সতী লক্ষ্মীর কি গর্ব্ভ হওয়া সম্ভব?

ভুলু ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসিল "ইনি আসিয়াছেন ত? রামের মা উত্তর দিল "আসাআসি এখন ছমাসের পথ। ক্ষেপা শিয়ালে তার বুকের

মাস তুলে নিয়েছে। সেদেশে শিয়ালের কামড়ে দশজন মরেছে। ইনিও শয্যা-ধরা হয়েছেন।”

রামের মাকে দেখিয়া নটুবাবু ভুলুর হাত ধরিয়া বাহিরে নির্জ্জনে পরামর্শ আঁটিতে গেলেন। বিধু, গৃহমধ্যে রামের মাকে ডাকিয়া একটী পান এবং একটু অর্দ্ধ দগ্ধ দোক্তা দিল। রামের মা তাই বদনে দিয়া পা ছড়াইয়া বসিল এবং বলিতে লাগিল, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সোণার পুতুল, মুনির মন টলে যায়, কিন্তু মিনসের তেমন যত্ন কই? তিনি হয়ত এতক্ষণ কৃষ্ণকে জবাবও দিয়াছেন।

বিধূ মহা সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, দিদি! তোমার শাপ ফলেচে। কালি, কালী ঘাটে পূজা পাঠাব। বড় আহ্লাদের কথা। জলবালা বলিল, “কিসের আহ্লাদ বিধূ? তার সেই সতী লক্ষ্মী স্ত্রী বিধবা হবে বলিয়াই কি আহ্লাদ? আহা! এমন যন্ত্রণা যেন কাহারও না হয়।” দিদি! বিধাতা আমার শেষ আশাও ঘুচালেন।

বিধূ এ কথার ভাব বুঝিল না, বিরক্ত হইয়া জলবালার দিকে চাহিয়া রহিল। জলবালা বলিল “বিধূ! আমার একদণ্ড বাঁচিতে ইচ্ছা নাই। এই দেখ আমি দারুণ হলাহল সংগ্রহ করিয়াছি, ইহা আঁচলেই বাঁধা আছে, কিন্তু শুনিয়াছি আত্মঘাতে বড় পাপ হয়, সেই ভয়ে মরিতে পারিনা।”

বিধূ বলিল, “এখনই বা কি সুবিধা হইত? জলবালা বলিল “সেই পাপিষ্ঠ আমাকে আক্রমণ করিলেই আমি মরিতাম। সতীত্ব রক্ষার জন্য আত্মঘাত পাপকে ডরাইতাম না। তার পর বুঝিতাম, সেই ধর্ম্মরাজ আমাকে কোন বিচারে নরকে দিতেন। তা হইল না, বোধ হয় আমাকে চিরকাল এই যাতনা ভোগ করিতে হইবে।

জলবালার চক্ষে জল ঝরিতে লাগিল। বিধূ আঁচলে মুখ মুছাইয়া সান্ত্বনা করিলেন এবং রামের মায়ের হস্তে একটী টাকা দিয়া বলিলেন, নটচন্দ্রকে দেখিয়া আমার ব ই সন্দেহ হয়েছে; তুমি শীঘ্র রামঘোষের বাড়ীতে যাও, সেখানে আমাদের ইনি আছেন। নটচন্দ্র তাহা জানে না, জানিলে কখনই এখানে আসিত না। এই ব্যাগটী তাঁর হাতে দিও, ইহার মধ্যে তাঁর বহুরূপীর সাজ আছে। রামের মা তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল।

এদিকে নটচন্দ্র ভুলুকে লইয়া ঘরের দাওয়ায় উঠিলেন। কাপুরুষ ভুলু নটুর সঙ্গে কি মন্ত্রণা করিয়াছে, তা আমরা জানিনা, কিন্তু ভুলু বলিতে লাগিল, "হাকিম নড়ে তবু হুকুম নড়েনা। বাবু স্বয়ং একা আহার লইবেন, আর কেহ ঘরে থাকিতে পারিবে না।" জলবালা বিধুর কানে কানে বলিল, "দুর্গা বুঝি আবার দিন দিলেন। বিধু তার সে কথা শুনিল না। পাশের ঘর দিয়া জলবালাকে বাহির করিয়া দিয়া, আপনি সর্ব্বাঙ্গ বসনে আবৃত করিয়া, একাকিনী ঘরের মেজেতে বসিয়া রহিল। ভুলু স্বয়ং যাইয়া বাহির দিক হইতে পার্শ্বের ঘরের শিকল তুলিয়া দিল। ঠিক সন্ধ্যার সময় নটচন্দ্র ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং বস্ত্রাবৃতা রমণীকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি হাকিম, আমার নিকটে মিথ্যা বলিও না। তুমি বিধবা, তোমার গর্ব্ভ হইল কেন? তুমি সত্যকথা বল, তোমার কোন ভয় নাই।" বিধু, বসনের ভিতর হইতে, চম্পকদাম-বিনিন্দিত অঙ্গুলি সহ, সুগোল হস্তটী বাহির করিয়া, নিকটে যাইতে সঙ্কেত করিল। নটচন্দ্রের মস্তক ঘুরিয়া গেল। বিধুর নিকটে যাইয়া দুইটী জানু পাতিয়া একহস্তে ভর দিয়া, ঠিক নাড়ুগোপালের মত বিধুর মুখের নিকটে কান পাতিয়া রহিল। ভুঁড়িটী ভূমে লুটাইতেছে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। বিধু বলিতে লাগিল "বাবু আমি জমীদারের বিধবা স্ত্রী। হাইকোর্টে বিষয় ডিক্রী পাইয়াছি। গর্ব্ভের সন্দেহে কাশী যাইবার নাম করিয়া এই জঙ্গলে আসিয়াছি। যে সঙ্গে করিয়া আনিল, সে কালি মরিয়া গিয়াছে। শীতকালের গাঙ্গে আমার ভরাডুবি হইতেছে; কিন্তু আর ভয় করি না, বিধাতা আমাকে যখন তোমার হাতে তুলিয়া দিয়াছেন, তখন আমার সর্ব্বস্ব রক্ষা হইল।

নটু বলিলেন, এ কিরূপ কথা! আমি হাকিম, আমরা মফঃস্বলের হাইকোর্ট—আমি তোমাকে চালান দিব।

বিধু, মুখের আবরণ মুক্ত করিয়া মধুর হাসি হাসিল, অন্ধকারে ভাল দেখা গেল না, তথাপি নটু আত্মহারা হ'লেন। বিধু আবার বলিল, বাবু! আমি মানুষ চিনি, গলার স্বরে রসিক অরসিক বুঝিতে পারি। এই জঙ্গলের মাগীরা তোমার মর্ম্ম কি বুঝিবে? বিধাতা দিন দিলেই তুমি পরিচয় পাইবে। আমি ধনের কাঙ্গালিনী নই, মানুষের কাঙ্গালিনী; আমার

ধন ঐশ্বর্য্য জীবন যৌবন সকলি——আর কিছু বলিতে হইল না। নটচন্দ্র ভাবী সুখ-স্বপ্নে মজিয়া গেলেন। আহ্লাদে গদ্গদ্ হইয়া বলিলেন, আমি চিরকাল কলিকাতায় ছিলাম। আমাদের নাটকের দল ছিল। রসিকতার দরকার হইলেই আমাকে সাজাইত। হরিশ্চন্দ্র নাটকে আমি "ভদো" না সাজিলে মিষ্ট লাগিত না। আমি যখন রাঙা ধড়া পরিয়া, পোড়া বাঁশ হাতে নিয়ে দাঁড়াতেম, তখন মেয়ে গুলোর মুণ্ডু ঘুরিয়া যাইত। বিধু জিজ্ঞাসিল, নাটক ছাড়িলেন কেন? নটু প্রাণ ধরিয়া বলিতে পারিলেন না যে, বয়সের জন্য নাটক ছাড়িলেন। আবার হৃদয় উথলিয়া উঠিল, কণ্ঠ স্বরের পরিচয় দিবার জন্য ব্যগ্র হ'লেন এবং ভুলুর বাড়ী ছাড়িয়া গুপ্ত স্থানে বাস করিবার প্রস্তাব করিলেন। বিধু বলিল, তুমি যেখানে রাখিবে সেই খানে থাকিব, টাকার অভাব নাই, কিন্তু গঙ্গাপারে যাবনা।

নটুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন কি ব্যারাম যে গঙ্গাপারে যাইতে নিষেধ? বিধু বলিল, "আমার উপরে অপ দেবতার দৃষ্টি হইয়াছিল। এখন সে গোলযোগ মিটিয়াছে। তবে কি না, পারে যাইতে সাহস হয় না।

ভূতপ্রেত সম্বন্ধে নটুবাবুর দৃঢ় বিশ্বাস আছে। তিনি বহুতর গল্প শুনিয়াছেন এবং নিজেও কখন কখন অপদেবতার ছায়া মূর্ত্তি দেখিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে রামের মা যে কথা বলিয়াছিল, সে কথা তাঁর স্মরণ হইল। হৃদয়ে সামান্য ভয়ের সঞ্চার হয়েছে, সম্প্রতি কোন পথ অবলম্বন করিবেন, ইহাই ভাবিতেছেন এমন সময়ে ঘরের চালে মড় মড়্ করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে মেজেতে দুপ্ দাপ্ শব্দ, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিকট ধ্বনি। সাহসে ভর করিয়া একবার চাহিয়া দেখিলেন। তাহাতে আরও বিপরীত হইল। একটা দীর্ঘাকার মূর্ত্তি "হা-হা শব্দে যতই হাসিতে লাগিল, ততই তার সেই বিকট বদনের গহ্বর হইতে ঝলকে ঝলকে অগ্নি বাহির হইতে লাগিল। তিনি আর দেখিতে পারিলেন না, চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বাহির হইতে দ্বার বন্ধ করা হইয়াছে। তিনি সজোরে কপাট নাড়া দিতে লাগিলেন, সেই সময়ে বোধ হইল যেন, তাঁর মস্তকে কে প্রস্রাব ত্যাগ করিতেছে। ও দিকে ভুলু ঠাকুর দ্বার খুলিয়া

দিলেন। নটচন্দ্র বেগে বাহির হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিলেন। ভুলু ঠাকুর দ্বার খুলিবার সময় ঘরের মধ্যে সেই মূর্ত্তি দেখিয়া আর স্থির হইতে পারিলেন না। নটু বাবুর পাছে দৌড় দিলেন। নটচন্দ্র পাছের দিকে চাহিতে সাহস করিলেন না, তাঁর বোধ হইল যেন ভূতের দল পাছু পাছু ছুটিতেছে এবং পৃথিবীকে উলট্ পালট্ করিতেছে। তিনি চক্ষু দুটী মুদিত করিয়া ছুটিলেন, কিন্তু তাতেও নিস্তার নাই। ভুলু ঠাকুর নীরসকণ্ঠে বিকৃত স্বরে "ধল্লেরে বাবা শব্দে চীৎকার ছাড়িতেছে।" নটু তাহা বুঝিল না, ভাবিল ইহাই সেই ভূতের উপদ্রব। সামান্য দূর যাইয়া কিঙ্কর-সর্দ্দারের বাড়ীর উঠানে আছাড় খাইয়া পড়িলেন। ভুলুর ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। দুজনের জ্ঞান চৈতন্য নাই। কিঙ্কর-সর্দ্দার, শঙ্কর ওঝার পুত্র; ভৌতিক বিদ্যায় ইহাদের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি আছে। নানাপ্রকার ঝাড়ান পোড়ান করাতে ইহাদের চৈতন্য হইল। গ্রামের প্রবীণ-বর্গ ক্রমে আসিয়া জুটিলেন এবং কিঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু তোমাদের অধিকারে ভূতের উৎপাত হইল কেন?

কিঙ্কর বিনীতভাবে উত্তর দিল 'এটা বিদেশী ভূত, হঠাৎ কোন গতিকে আসিয়া পড়িয়াছে। ভালরূপ প্রতিকার না হইলে তাড়াইতে পারিব না। সে রাত্রি কাটিয়া গেল। ভুলু ঠাকুর অল্প দিনেই আরাম হ'লেন, কিন্তু নটচন্দ্রের কপাল ভাঙ্গিল। তিনি দিনে দুইবার মূর্চ্ছা যাইতেন এবং মূর্চ্ছার পূর্ব্বে "বাপ্‌রে ধল্লেরে ইত্যাদি শব্দে চীৎকার করিতেন। তিনি বলিতেন যে, ভুলু ঠাকুরের বাড়ীর সেই বিকট মূর্ত্তি সর্ব্বদা তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য আইসে, ডাক্তার বৈদ্য কিছুই প্রতিকার করিতে পারিল না। নটচন্দ্রের সঞ্চিত অর্থ সেই পাঁচ শত টাকা উড়িয়া গেল। সর্ব্বশেষে তিনি যোগী সন্ন্যাসীর উপরে নির্ভর করিলেন। নটচন্দ্রের দুর্দ্দশা দেখিয়া গ্রামের লোক মনে মনে মহাসন্তুষ্ট হইল। এদিকে গ্রামে জনরব হইল যে একটা দারুণ ভূত আসিয়া ভুলু ঠাকুরের বাড়ীতে আড্ডা করিয়াছে, কেহ তাহার বাড়ীর দিকে তাকাইতে সাহস করে না। জলবালা নির্ব্বিঘ্নে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

জলবালার নিকটে একছড়া মতির মালা ছিল। তাহা বিক্রয় করায়

যথেষ্ট অর্থ হয়। ইহাই মূলধন করিয়া বিধুর স্বামী গঙ্গাতীর-অঞ্চলে কারবার খুলিলেন। জলবালা নিতান্ত অনাথিনীর মত রহিলেন না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

কুলাঙ্কক দলবল সহ জেলে গিয়াছেন। দক্ষিণার বিরুদ্ধে মিথ্যা চুরির দাবি দেওয়ার এই কুলাঙ্কক এবং জীবন ধরা পড়েন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দেখিলেন "উহারা দণ্ড পাইতে পারে এরূপ প্রচুর প্রমাণ নাই। তিনি জীবনকে বলিলেন "তুমি যদি সত্য কথা বল তাহলে তোমার অপরাধ ক্ষমা করিব জীবন ইহাতেই সমস্ত গুপ্ত কথা প্রকাশ করে। অন্যথা কুলাঙ্ককের দণ্ড হইত না। এক্ষণে জীবন বাবু দক্ষিণার শূন্যপুরীতে প্রবেশ করিলেন।

কুলাঙ্কক রায়ের বিস্তারিত পরিচয় এই স্থানে দেওয়া আবশ্যক। কুলাঙ্কক কায়স্থকুলের গোষ্ঠীপতি, এর পুত্র কন্যা না থাকায় চল্লিশ বৎসর বয়সে তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও ফল হইল না, নূতন গৃহিণীর মৃত-বৎসা দোষ হইল। এই সময়ে পূর্ব্বদেশীয় একজন ব্রাহ্মণ এই গ্রামে আসিয়াছিলেন, তিনি শ্মশান যাগের প্রস্তাব করেন, কিন্তু কুলাঙ্কক গোঁড়া-বৈষ্ণব, তিনি প্রাণান্তে ইহাতে সম্মত হইলেন না। এই গ্রামে আর এক-জনের মৃত-বৎসা রোগ ছিল। তাহারা সন্ধান পাইয়া ঐ ব্রাহ্মণের দ্বারা শ্মশান যাগ করায়, তাহাদের কার্য্য-সিদ্ধ হইল। এবারে আর গৃহিণীকে থামাইতে পারিলেন না. কুলাঙ্কক স্বয়ং শ্মশান যাগের উদ্যোগ করিয়া দিলেন। আমরা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ ঘটাইয়া বিদ্যা প্রকাশ করিতে ছাড়িনা সত্য, কিন্তু এরূপ অনেক বিষয় আছে যে, এ পর্য্যন্ত আমরা তাহার কিছুই বুঝিতে পারি

না। শ্মশান যাগের পর কুলাঙ্কক-পত্নী একটী কন্যা প্রসব করিলেন, কিন্তু তাঁহার কোন বিঘ্ন হইল না। আবার তিন বৎসর পরে আর একটী কন্যা হইল। প্রথমটীর নাম গরবিনী এবং কনিষ্ঠা কন্যা হেমলতা। পিতা মাতার আদরে গরবিনী ফুলিয়া উঠিল। তার কথায় কথায় আব্দার, কাহারেও ভয় করিত না। গরবিনী কখন বা রাধাকান্ত দেবের পীতবসন কাড়িয়া আনিয়া খেলা-ঘর সাজাইতেছে, কখন বা রাধারাণীকে ফেলিয়া দিয়া তার জায়গায় আপনার একটী পুতুলকে বসাইয়া দিতেছে। গরবিনীর অত্যাচারে সকলেই অস্থির হইল, কিন্তু বাবু ইহাকে কিছু বলিতে পারিতেন না। শ্মশান যাগের ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন যে, গরবিনী চামুণ্ডার অংশে জন্মিয়াছে, স্মৃতরাং কর্ত্তা গিন্নীর বিশ্বাস হইল যে, গরবিনীর কার্য্য কলাপ দেব-লীলার সামিল। ব্রাহ্মণের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি হইল, এই স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন। রাধাকান্তদেবের পূজক ঠাকুরের ইহাতে বিষম ঈর্ষ্যা হইল, তথাপি কিছু বলিতে পারিলেন না। গরবিনীর পক্ষপাত দোষ ছিল না, সে, শক্তি এবং বৈষ্ণবের প্রতি সমভাবে অত্যাচার করিত। একদিন ঐ বাঙ্গাল ব্রাহ্মণ দিবাভাগে নিদ্রাভিভূত হয়েছেন, গরবিনী তাহা দেখিয়া একটী কুকুর ছানা আনিয়া ঠাকুরের লম্বা দাড়িতে বাঁধিয়া দিল। ব্রাহ্মণ ঘুমের ঘোরে যতই টানা-টানি করিতেছেন ততই সেই সরমা-সুত তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিল ব্রাহ্মণ রক্তাক্ত কলেবরে কর্ত্তার নিকটে নালীশ করিলেন। কর্ত্তা ভয়ে জড় শড় হইলেন। পূজক-ঠাকুর সুযোগ বুঝিয়া বলিলেন "ঠাকুর যে এতদিন গরবিনীকে চামুণ্ডা বলিতেন, তাহাতে আমার প্রতীত হয় নাই, কিন্তু আজি সকল সন্দেহ দূর হইল তবে গরবিনী চামুণ্ডা নয়, উনি মহিষ-মর্দ্দিনী। ঠাকুর আজ এই বিপুল কলেবর কম্বলে ঢাকিয়া, নাসিকার গভীর গর্জ্জনে বাড়ী কাঁপাইতেছিলেন। আমরা ভাবিলাম অরণ্য-মহিষ আসিয়াছে। তাহার পরেই গরবিনীর কল্যাণে আমরা নিষ্কৃতি পাইয়াছি বালিকার কুকুরটী আজি সিংহের কাজ করিয়াছে। পূজকের এরূপ কথা বড় একটা সংলগ্ন হইল না, কিন্তু কর্ত্তার কানে খুব মিষ্ট লাগিল।

গরবিনীর বিবাহ দিবার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া একটী কুলীন বালককে আনা হইল। তাহার নাম মতিলাল। মতির যেমন রূপ তেমনি গুণ, এবং

বিলক্ষণ বুদ্ধিমান। গৃহিণীর আহ্লাদের সীমা রহিল না। পুত্রের ন্যায় মতিকে প্রতিপালন করিলেন। বিবাহের কাল উপস্থিত হইলে পর, কর্ত্তাবাবু আদ্যরসের কথা উত্থাপন করিলেন। গৃহিণী রাগে অধীরা হইয়া বলিলেন, তাহ'লে আমি গলায় দড়ি দিয়া মরিব। আমি প্রাণ থাকিতে সতীনের উপরে কন্যা দিব না। এদিকে পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তি লোপ হয়। শত শত বালিকাকে যাবজ্জীবন দগ্ধ করিয়া এরা গোষ্ঠীপতি হইয়াছেন, এই বিপুল মান সম্ভ্রম রক্ষা করিতে না পারিলে জীবন বৃথা হয়। কর্ত্তাবাবু ভাবিয়া আকুল হ'লেন।

পরম ভাগবৎ গোস্বামী ঠাকুর কর্ত্তাবাবুকে যেরূপ পরামর্শ দিয়া এই বিপদে উদ্ধার করেন, তা আমরা বহুপূর্ব্বেই বলিয়াছি। আদ্যরসের নিয়ম মতে কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কন্যা দিতে হয়। এদিকে কায়স্থের পুত্রগত কুল। প্রথমে কুলীনের কন্যা গ্রহণ না করিলে, তিনি কুলীন হইতে পারিবেন না, সুতরাং এই কারণে সতীনের উপরে কন্যা দিতে হয়। গোস্বামী ঠাকুর প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া একটী কুলীন বালককে আনিলেন। মতির কুল-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সেই বালিকাটী প্রয়াগের ত্রিধারার পথে বৈকুণ্ঠে গেল। গৃহিণী নিষ্কণ্টক হইয়া গরবিনীর বিবাহ দিলেন। গরবিনী মতিলালকে চাকরের সামিল ভাবিত। এই মাল্য-বদল কাণ্ডটা সে গ্রাহ্য করিত না। একদিনের জন্যও মতিকে দেখিয়া মাথায় কাপড় দেয় নাই। মতির সাক্ষাতে সকলের সঙ্গেই হাস্য কৌতুক করিত। একদিন মতির মস্তকে হুঁকার জল ঢালিয়া দিল, অন্যদিন দুর্ব্বাক্য বলিল। গৃহিণী ইহাতেও কিছু বলিলেন না; হাসিয়া আকুল হ'লেন। মতিলাল আর সহ্য করিতে পারিল না। বাহির বাড়ীতে রাত্রিযাপন করিতে লাগিল। ক্রমে এই কথা গৃহিণীর কানে উঠিল, তিনি রাগে অধীরা হইয়া মতিকে অন্তঃপুরে আনিলেন। মতি তার দুঃখের কাহিনী বলিতে অবকাশ পাইল না। পুরবাসিনীরা চারিদিকে ঘিরিয়া ভর্ৎসনা যুড়িল। এক রসবতী বলিলেন, এমন পদ্মফুল কি তোমার মনে ধরিল না? আর একজন বলিল, কর্ত্তাবাবু ভ্রমর আনিতে ভিমরুল আনিয়াছেন। দাসীগুলাও মতিকে ছাড়িল না, মতি অন্তরের অনল চাপিয়া রাখিতে পারিল না, চক্ষু পথে বাহির হইল। কর্ত্তাবাবুর ভাগিনেয়ী বিনো-

দিনী, মতির দুঃখ বুঝিয়াছিল। সে বলিল, "মামি মা! মতির দোষ নাই, গরবিনী উহাকে শ্রদ্ধা করে না।" গৃহিণী এই কথা শুনিয়া জ্বলিয়া গেলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "গরবিনী কি তোদের মত ছোটলোকের মেয়ে যে, স্বামীর খোষামোদ করিবে? কেন আমার কিসের অভাব? এক রাশি টাকা খরচ হয়েছে, মানুষ করেছি, সে দিন পাস দিইয়ে আনিলাম,—তার উপরে আবার কথা; এবারে সেই ঘটক মিন্‌সে একবার এলে হয়,—তারে খুব দশ কথা শুনিয়ে দিবো।"

বিনোদিনী ভয়ে কথা কহিল না। দারুণ আদ্যরসের কল্যাণে বিনোদিনীর জননী লক্ষ্মীছাড়া কুলীনের হাতে পড়িয়াছেন। কর্ত্তা বাবু তাঁরে একখানি ক্ষুদ্র বাড়ী করিয়া দিয়াছেন, এবং তিনি প্রতিপালন করেন; সুতরাং বিনোদিনী কোন্ সাহসে মামীর কথার উত্তর করিবেন। আবার ঘটনাক্রমে বিনোদিনী বড় মানুষের ছেলের স্ত্রী হইয়াছেন। এইজন্য গরবিনীর মনে মনে আক্রোশ আছে। বিনোদের স্বামী হীরালাল বিনোদকে দেখিতে পারেনা, কখন কখন প্রহার করে, বিনোদিনী তার পায়ে ধরিয়া কাঁদিলেও সে ফিরিয়া চাহে না, তথাপি গরবিনী ইহাতে বিপরীত বুঝিয়াছে। গরবিনীর চক্ষে হীরালালের রূপ অপেক্ষা গুণ বেশী—হীরালাল, স্ত্রীলোকদের সঙ্গে কথা কহিবার সময় ইংরাজি বলিয়া ফেলে, একটু ব্রাণ্ডি বদনে দিলেই বাঙ্গালা কথা ভুলিয়া যায়। এই সমস্ত নানাবিধ গুণ আছে, তবে সে নিজে বড় মানুষের সন্তান এই জন্য গরীবের মেয়েকে দেখিতে পারেনা। বিনোদিনী তার মনের মত হয় নাই—ইহাই গরবিনীর দৃঢ় বিশ্বাস। অন্যপক্ষে মতিলালের কোন গুণ নাই, সে বাবু নয়, আমোদ আহ্লাদ জানেনা,—গান বাজনার কাছে যায় না, কেবল বই লইয়া বসিয়া থাকে এরূপ জানোয়ারের প্রতি গরবিনীর কি শ্রদ্ধা হইতে পারে? তবে মতিলাল দেখিতে সুন্দর এবং সুশ্রী বটে, কিন্তু ইহাতেই ফল কি? বিশেষতঃ মতিলাল অন্নদাস বলিয়াই তার উপরে গরবিনীর বিষম ঘৃণা হয়। গৃহিণী যে দিন মতিলালকে শাসন করিলেন, সে দিন মতিলাল গরবিনীর গৃহে রাত্রি-বাস করিতে গেলেন, কিন্তু গরবিনীর ভাব ভঙ্গি দেখিয়া তাঁর মনে ঘৃণা হইল। পরদিন প্রাতঃকালে অতি সঙ্গোপনে দেশত্যাগ করিল, এবং বহরমপুরে যাইয়া কোন

দানশীলা রমণীর আশ্রয় পাইল। সেখানে থাকিয়া কলেজে পড়িতে লাগিল।

মতি চলিয়া যাওয়ায় সকলেই দুঃখিত হয়, গৃহিণীর চক্ষেও জল পড়িল, কিন্তু গরবিনীর ভাব স্বতন্ত্র। সহস্র দোষ থাকিলেও সে হিন্দু বালা, সতীত্ব ইহাদের প্রাণের সঙ্গে গাঁথা আছে। মতিলাল বিদায় হইল বলিয়াই সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। মনে মনে স্থির করিল "হীরালালকে দেখিতে ভাল বাসি—দূর হইতে দেখিব, তার কণ্ঠ স্বর মিষ্ট—দূর হইতে গান শুনিব, ঘনিষ্টতা রাখিব না। হীরালাল আমার জন্য লালায়িত হইয়াছে, সে আমাকে অন্তরের সহিত ভালবাসে, কিন্তু তাই বলিয়া আমি কি জাতি কুল হারাইব? তা কখনই হবেনা। আমার কপাল ভাল হইলে বিধাতা হীরালালের সঙ্গে আমার বিবাহ দিতেন। সংসারে সতীত্বের বাড়া সামগ্রী নাই। এইরূপ গরবিনী আপনার হৃদয়কে দৃঢ় করিল।

হীরালাল এই গ্রামে সখের দলের কর্ত্তা। "কৃষ্ণ কালি" নাটকে তিনি নিজে কৃষ্ণ সাজিয়া থাকেন। কুলাঙ্গকের বাড়ীতে এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। লোকে লোকারণ্য হইয়াছে, বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা উপযুক্ত স্থানে বসিয়া নাটক শুনিতেছে। গরবিনী হেমলতা এবং বিনোদ প্রভৃতি সকলেই একস্থানে বসিয়াছে। হীরালালের কৃষ্ণ বেশ বড়ই সুন্দর হয়েছে, তাতে আবার তার কণ্ঠস্বর বড় মিষ্ট। এ বিষয়ে সে একজন নিপুণ লোক। তার বক্তৃতায় চারিদিক হইতে ধন্যবাদ হইতেছে। কিন্তু গরবিনীর মুখে কথা নাই, সে চিত্ত-পুত্তলিকার মত হীরালালের দিকে চাহিয়া আছে। সখি-বেষ্টিতা রাধারাণী, রঙ্গস্থলে উপস্থিত হলেন, দর্শক-বৃন্দ আনন্দে করতালি ধ্বনি করিল, কিন্তু এ দৃশ্য গরবিনীর ভাল লাগিল না, কোথা হইতে হিংসা আসিয়া তার হৃৎপিণ্ডে শুচ বিঁধিতে লাগিল। বালিকা আত্মসম্বরণ করিয়া দৃঢ় হৃদয়ে চক্ষু ফিরাইল। এই সময়ে কৃষ্ণ-রূপী হীরালাল বলিতেছেন, "শ্রীমতি! তুমি কুলকামিনী হইয়া কি প্রকারে এই রাত্রিকালে বিজন বনে আসিয়াছ? সতীত্ব স্ত্রীলোকের পরম ধন? আমি পর-পুরুষ, ছি! তোমার কি ব্যাভিচারে ঘৃণা নাই? পাপে ভয় নাই? যাও এইদণ্ডে স্বামীর নিকটে যাও।" শ্রীমতি ঈষৎ হাস্যের সহিত উত্তর দিলেন, "নাথ! পাপিষ্ঠ আয়ান

আমাকে বিবাহ করিয়াছে বলিয়া কি সে আমার স্বামী? আমি পিতার কথায় সেই পাপিষ্ঠের গলায় মালা দিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু আমি যে মনে মনে তোমার চরণে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। আমি যদি তোমার চরণে বঞ্চিত হই, তবে আগুণে পুড়িব, যমুনায় ঝাঁপ দিব, তথাপি আয়ানের নিকটে যাবনা।"

শ্রীকৃষ্ণ আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না, রাধারাণীর হাত দুটী ধরিয়া আপনার বামভাগে লইলেন। যুগল রূপের মাধুরিতে, গায়ককুল মত্ত হইয়া মিলন-গীত ধরিল। পুরবাসিনী বৃদ্ধারা উলুই দিলেন, শাঁখ বাজালেন। সকলের মহা আনন্দ, কিন্তু অভাগিনী আর বসিতে পারিল না। সে দ্রুত-বেগে পুরমধ্যে যাইতেছে এমন সময়ে বিনোদিনী তার অঞ্চল ধরিয়া বলিল, "কোথা যাও? এখনো যে ঢের বাকি আছে।" গরবিনী রাগে অধীরা হইয়া বলিল, "তোর বড় অহঙ্কার হয়েছে? যদি পরমেশ্বর থাকেন, শীঘ্র এই অহঙ্কার চূর্ণ হবে"। বিনোদিনী আঁচল ছাড়িয়া দিয়া গৃহিণীর মুখপানে চাহিল। তিনি বলিলেন, "বাছা! পাগলের কথা কিছু মনে করিওনা।

নাটক শুনিয়া অবধি গরবিনীর মন আরো বিকৃত হইল। একাকিনী বিরলে বসিয়া চিন্তা করিত। গৃহিণী ভাবিলেন, জামাতার বিরহে গরবিনী যাতনা পাইতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ কর্ত্তার নিকটে গরবিনীর চাপা-সতীত্বের বর্ণনা করিয়া অশ্রুজল ফেলিলেন। কর্ত্তাবাবু চারিদিক আঁধার দেখিয়া চারিদিকে দূত পাঠাইলেন, বলিয়া দিলেন যে ব্যক্তি মতিকে আনিবে সে বিলক্ষণ পুরস্কার পাইবে। গরবিনীর সতীত্ব সংবাদে কেহই আশ্চর্য্য হইল না; কেননা গরবিনী যে দাক্ষায়ণীর অংশ-সম্ভূতা তা প্রায় সকলেই জানিয়াছে। দূত বহরমপুরে যাইয়া, পুরস্কারের লোভে গরবিনীর সতীত্ব কাহিনী এরূপ ভাবে বর্ণন করিল যে, মতিলাল আপনার বুদ্ধিকে শত বার ধিক্কার দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ দূতের সঙ্গে শ্বশুর বাড়ীর দিকে ছুটিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, গরবিনী প্রণয় পরীক্ষার জন্য প্রকাশ্য যতই অনাদর করুক, তিনি আর তাহাতে ভুলিয়া কখনই মনক্ষুণ্ণ বোধ করিবেন না।

এ দিকে রাত্রি দশ দণ্ড অতীত হইয়াছে, গরবিনী আপনার গৃহে একা-কিনী বসিয়া কিছু ভাবিতেছে। হাতে একখানি বই আছে, বইখানি "কৃষ্ণ-

কালী নাটক"। গরবিনীর আজি নূতন বেশ, নাটকে রাধারাণীর যেরূপ সজ্জা দেখিয়াছিল, আজি গরবিনী ঠিক সেইরূপ সাজিয়াছে; এমন-সময়ে মতিলাল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গরবিনী মতিকে দেখিয়া জ্বলিয়া গেল, ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইল। মতিলালের হাতে হুঁকা ছিল, ভাবিল, গরবিনী তামাকের গন্ধে বিরক্ত হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ হুঁকাটী বৈঠকের উপরে রাখিয়া মতিলাল বলিতে লাগিল, "গরবিনি! আমি ঘোর মূর্খ, আমি তোমার মনের ভাব বুঝিতে পারি নাই বলিয়া তোমকে কষ্ট দিয়াছি.—তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আজি অবধি প্রতিজ্ঞা করিলাম, তুমি সত্য সত্য অপমান করিলেও আমি তোমারে ছাড়িয়া কোথাও যাইব না, পদাঘাত করিলেও পায়ে জড়াইয়া থাকিব।"

গরবিনী বলিল, "যার ঘৃণা লজ্জা নাই তার মৃত্যুই ভাল।" মতি ইহাতে কান দিল না, আবার বলিল, "গরবিনি! তোমার পতিভক্তির কথা শুনিয়া আমার বড় আহ্লাদ হয়েছে, প্রাণ দিলেও ইহার পরিশোধ হয় না"—কিন্তু গরবিনী এ দিকে আরম্ভ করিল, "আঃ আমার ইচ্ছা হয় আমি বিষ খাই। ছোট মুখে বড় কথা আর সহ্য হয় না। হা পরমেশ্বর! তুমি যে মাটিতে রাধারাণীকে গড়িয়াছিলে, আমার জন্যে কি সেই মাটি তুলিয়া রাখিয়াছিলে?"

মতির মস্তক ঘুরিয়া গেল, আবার রাধারাণীর বেশ দেখিয়া মনে মনে মহা সন্দেহ হইল; কিন্তু কন্দর্পের অপার মহিমা! গরবিনীর মুখপানে চাহিয়া সকলি ভুলিল। খাটের নিম্নে বসিয়া গরবিনীর পা দুটী জড়াইয়া ধরিল। পায়ে সাপ জড়াইলে লোকে যেরূপ করিয়া থাকে, গরবিনী সেইরূপে সবলে পাদুটী ছাড়াইয়া লইল। তাহার ধমকে মতিলাল বৈঠকের উপরে পড়িয়া গেলেন। কপাল খরধারে কাটিয়া রক্ত বাহির হইল, কলিকায় গুলের আগুণ ছিল মুখে এবং বুকে পড়িয়া দগ্ধ হইয়া গেল। মতিলাল জ্বালায় অস্থির হইল দেখিয়া গরবিনীর হাসির ঘটা বাড়িল।

মতিলালের আর সন্দেহ রহিল না। তিনি কৃষ্ণ-কালী নাটকের কথা জানিতেন, হীরালালকেও চিনিতেন। রাগে অধীর হইয়া বলিলেন, "পুণ্যবতি! তোমার পিতা কুলব্রত পালনের জন্য বালিকা বলিদান দিয়াছেন, তুমিও আজি কুলটা ব্রত রক্ষার জন্য স্বামী হত্যা করিলে। এই পুণ্যেই তুমি

হীরালালকে পাইবে,—আর পদাঘাতের দরুন পুণ্য-ফলটী বেশী পাওনা রহিল। বিধাতা অবশ্যই ইহার পরিশোধ দিবেন।

গরবিনী ইহাতেও নম্র হইল না, বলিতে লাগিল, "মুখের দোষে মুখ পুড়িয়া গেল, আমি লাথি মারি নাই, কিন্তু মুখের দোষে লাথি মারিতে ইচ্ছা হয়; অন্নদাস জানোয়ার, হীরালাল বাবুর গোলামের যোগ্য নয়," এইরূপে আরও অনেক কথা বলিল, কিন্তু মতি সে কথা শুনিতে পাইল না, দ্রুতবেগে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকালে কেহ আর তাহারে দেখিলনা। এবারেও গরবিনীর সতীত্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ ভাবে রহিয়া গেল।

দোলযাত্রার পূর্ব্বদিনে গরবিনী মতিকে বিসর্জ্জন দিয়াছে। মতির চাক্‌চিক্য নাই বলিয়া বালিকার কোমল চক্ষু হীরার জ্যোতিতে ঝলসিয়া গিয়াছে। সাপের মাথায় প্রকৃত মাণিক থাকেনা, (কেবল পতঙ্গ কুলের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য, বিধাতা তার ফণাতে এক প্রকার জ্যোতি দিয়াছেন), তাহলে সে কখন ভুলিত না।

এখানে দোলে বড় ধুম। চাঁচরের রাত্রে নানাবিধ রোশনাই, সিঁড়ি, যুঁই ফুলের ঝাড় আদি অগ্রে করিয়া রাধাকান্তদেব গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। সকলেই ইহাতে ব্যস্ত, জননীগণ আজি সন্তানের ভোজনকালে তার নিকটে বসিতে পারিতেছেন না। আবাল বৃদ্ধ বণিতা চাঁচর লইয়া মাতিয়াছে। কিন্তু হতভাগিনী কোথায়? সে ইহার ত্রি-সীমায় আসে নাই। নির্জ্জন স্থানে বসিয়া বসুমাতাকে নখাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিতেছে। কিন্তু ইহাতে তার দোষ নাই, সে সরল ভাবে হীরালালের মূর্ত্তি চিন্তা করিতেছিল। সতীত্ব গৌরব, ঘৃণা, লজ্জা, কুল-মর্য্যাদাদি সকলে একত্রে জুটিয়া অভাগিনীকে বিরক্ত করিতে লাগিল; সে আর সহ্য করিতে পারিলনা। একে একে সকলকে ধরিয়া প্রথমে পদদলিত করিল; অবশেষে নখাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। ইহাতেই ভূমে আঁক পড়িয়াছে। গরবিনী এইরূপে ঘোর যুদ্ধ করিতেছে এমন সময়ে হেমলতা আসিয়া তার হাত ধরিয়া টানিল, এবং বলিল, "দিদি! শীঘ্র এসো, চাঁচর বাহির হয়েছে।" ইহারা দুই জনে রাজ পথে আসিয়া দেখিল, রাধাকান্তদেব চতুর্দ্দোলে উঠিয়াছেন। ব্রাহ্মণ বাহকেরা তাঁহাকে বাহিরে আনিয়াছেন। এ

দিকে রাজপথে, ঠাকুর বাড়ীতে এবং সর্ব্ব স্থানে লোকে লোকারণ্য হয়েছে। ইহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব অতি বিরল। যুবকেরা দল বাঁধিয়া স্ত্রীলোকদের গায়ে পড়িতেছে, চক্ষে আবীর দিতেছে, এই সূত্রে কোথায় বা ঘোর দাঙ্গা হেঙ্গাম হইয়া গেল। কেহ কেহ অতর্কিত ভাবে বালক বালিকার অলঙ্কার খুলিয়া লইতেছে, কেহ ধরা পড়িতেছে। ইহার মধ্যে অধিকাংশ স্ত্রীলোক ভক্তি-পূর্ণ-হৃদয়ে রাধাকান্তদেবকে দর্শন করিতেছে। ইহাদের অন্য দিকে মন নাই। আজি যেন ইহারা লজ্জা সরম ভুলিয়া গিয়াছে। বাস্তবিক ইহারাই পবিত্র হৃদয় লইয়া জগতে আসিয়াছে। অযোধ্যা-বাসী কতকগুলি পাহারাওয়ালা শান্তি-রক্ষার জন্য এখানে নিযুক্ত আছে। ইহারা রামচন্দ্রের দেশীয় লোক বলিয়া মহা অহঙ্কার করে। তাঁর উপরে এদের দাবী দাওয়া বেশী। কিন্তু প্রভু এ গুলিকে কিস্কিন্ধ্যা হইতে আনিয়াছিলেন—কি ইহারা অযোধ্যার আদিমবাসী তা আমরা এতকাল বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু পাহারাওয়ালার পোষাক পরিধান করায় আজি সে সংশয় মিটিয়া গেল। যাহাদের শরীরে কিস্কিন্ধ্যার শোণিত ছিল, তাহারা উলম্ফন প্রলম্ফন করিয়াও স্থির হইল না। স্ত্রীলোক দেখিয়া মুখ খিচাইতে লাগিল, কেহ বা আঁচল ছিড়িয়া দিল। স্কুলের বালকেরা শাস্ত্রপুরাণ মানে না, ইহাদের প্রভাব জানে না, সকলে দল বাঁধিয়া পাহারাওয়ালাদের প্রতি অত্যাচার করিল।

গগণের পশ্চিম উত্তর কোণে পবনদেবের বাসস্থান, এই জন্যই ঐ কোণকে বায়ুকোণ বলে। দলিত কজ্জল-বর্ণ মেঘরাজ এই সময়ে পবনদেবের উচ্চ মন্দিরে বসিয়া, মাথা উচ্চ করিয়া চাঁচর দেখিতে-ছিলেন। পবনদেবের সঙ্গে পাহারাওয়ালাদের কি সম্পর্ক আছে তা আমরা ঠিক বলিতে পারি না কিন্তু তিনি পাহারাওয়ালাদের অপমান দেখিয়া রাগে উন্মত্ত হলেন। মেঘ রাজের সঙ্গে একজোট হইয়া, যেন সৃষ্টি ধ্বংশ করিবার জন্য এই দিকে ছুটিলেন। এর আস্ফালনে বড় বড় গাছ পালা ভাঙ্গিয়া পড়িল। জলদ রাজ শীলাবৃষ্টিতে সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। রাধাকান্তদেব মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। দর্শক-মণ্ডলির বড়ই দুর্দ্দশা হইল। আমোদে মত্ত হইয়া

কেহই আকাশের দিকে তাকায় নাই। অকস্মাৎ বিভ্রাট উপস্থিত হওয়ায় কে কোন্ দিকে ছুটিল তাহার ঠিকানা রহিল না।

কুলাঙ্ককের ঠাকুর বাড়ীর সন্নিকটে একটী জনশূন্য পুরী আছে। ব্রহ্মশাপের ভিটা বলিয়া কেহ ইহার ত্রিসীমায় যায় না। এই দুর্যোগেও কেহ ইহাতে আশ্রয় লইল না। কিছু দিন পূর্ব্বে একটা উদাসীন গ্রামে আসিয়াছে, সে শ্মশানে মড়ার মাথা পাড়িয়া শুইয়া থাকে, কুকুরের সঙ্গে এক পাতে খায়। তার কদাচার দেখিয়া লোকে স্থির করিয়াছে যে উহাকে পিশাচে পাইয়াছে। উদাসীনটী নির্জ্জন স্থান দেখিয়া এই পুরীর মধ্যে উপরের চোর-কুঠরিতে রাত্রি বাস করেন, একথা কেহই জানিতে পারে নাই। এই ঝড় জলের সময়ে উদাসীন, মানুষের কণ্ঠ স্বর শুনিয়া চাহিয়া দেখিলেন, নীচের দালানে হীরালাল বাবু গরবিনীর সঙ্গে প্রবেশ করিলেন। হীরালালের হাতে বাতি আছে, উদাসীন ইহাদিগকে চিনিতেন।

গরবিনী অধোবদনে ছিল এবং বলিতে লাগিল, "হীরালাল আমার ইচ্ছা না থাকিলে তুমি ধরিয়া আনিতে পারিতে না, আমি প্রাণ থাকিতে তোমাকে ভুলিতে পারিলাম না, সকলি আমার কপালের দোষ। তুমি মনে করিলে আমাকে রক্ষা করিতে পারিতে, কিন্তু তা করিলে কই ?।"

হীরালাল বলিল, "গরবিনী! তুমি আমার প্রাণের চেয়ে বাড়া—আমি তোমার জন্যে সাপের মুখে বাঘের মুখে যাইতে পারি, তুমি এখনও আমার মন জানিলে না, ইহাতেই বড় দুঃখ হয়। শশী বাবুর স্ত্রীকে আমি এতদূর ভাল বাসিতে পারি নাই, সেও তেমন নয়, শেষ রাখিতে পারিল না, তথাপি আজি কালি সে কলিকাতার মধ্যে নাম বাহির করিয়াছে।"

গরবিনী সিহরিয়া উঠিল, এবং বলিল, "ইহাকেই কি বলে রক্ষা করা ? আমি কি তবে বেশ্যা হব ? হায়! আমি বলিলাম যে, তুমি আমাকে ঘৃণা করিলে আমি রক্ষা পাইতাম, কেননা কেবল তোমার উপরেই আমার মন পড়িয়াছে। ও সেই কারণে আমার প্রাণে বড়ই আশঙ্কা হয়েছে।" "আমি থাকিতে কিসের আশঙ্কা ? আমি এই প্রাণ তোমার পায়ে বিক্রয় করিলাম, এই বলিয়া হীরালাল বাবু নানাবিধ শপথ করিলেন।

গরবিনী বলিল, "কলঙ্কের আশঙ্কা; কলঙ্কিনী হইয়া বাঁচার চেয়ে মরা ভাল।" কিসের কলঙ্ক? এই নির্জ্জন পুরীর সংবাদ কে জানিবে, এখানে কে আছে? হীরালাল এই কথাটী যেমন বলিয়াছেন, অমনি সেই উদাসীন উত্তর দিলেন "রাধাকান্ত দেব।"

ইহারা দুই জনেই চমকিয়া উঠিল। এবং উঠিয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। এই সময়ে গরবিনী চীৎকার করিয়া বলিল, "হীরালাল! এই দেখ, প্রভু রাধাকান্ত আমার প্রতি মুখ-তুলিয়া চাহিলেন, ঐ দেখ ঐ দেখ, তুমি সাবধান হও।" হীরালাল দেখিল, ভীষণ কাল সর্প গরবিনীকে দংশন করিয়া বাহিরে যাইতেছে, তার হাতে ছড়ি ছিল, ভুজঙ্গের মধ্য-দেহে আঘাত করিলেন, কিন্তু সে মরিল না, সরিয়া পড়িল। এ দিকে গরবিনীর পাদ-পৃষ্ঠ রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে, সর্প সংঘাতিক আঘাত করিয়াছে। হীরালাল বুঝিল, গরবিনীর আসন্নকাল উপস্থিত, আর উহার সঙ্গে সম্পর্ক কি? তথাপি ভদ্রতা করিয়া বলিলেন, "গরবিনী শীঘ্র পালাও, আমি অন্য পথে প্রস্থান করি।" প্রথমে গরবিনীর মরণে সাহস দেখা গিয়াছিল, এক্ষণে আর সে ভাব নাই, সে কাতর ভাবে বলিল "আমার পা পাথরের মত ভারি হইয়াছে, মাথা টল টল করিতেছে, চলিতে পারি না, তুমি আমাকে ধরে নিয়ে চল।" পাপিষ্ঠ উত্তর দিল, "গরবিনি! "তোমার কথায় আমার জ্ঞান জন্মিয়াছে, আমি আর পরস্ত্রীকে স্পর্শ করিব না, না হইলে তোমাকে কাঁধে লইয়া বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিতাম।" গরবিনী এবারে কাঁদিয়া ভগ্ন-স্বরে বলিল, "আমার মাকে দেখিবার জন্য প্রাণ আকুল হইতেছে, ঠাকুর বাড়ীর বাবাজি সাপের ঔষধ জানেন, তাঁরে খবর দিলে আমার প্রাণরক্ষা হয়। আমি আর দাঁড়াইতে পারি না, আমার মা"—আর কথা বাহির হইল না। হীরালাল কি এতই নির্ব্বোধ যে উহাকে বাঁচাইতে যাইয়া আপনি ধরা পড়িবে? তবে শেষ ফল বুঝিবার জন্য একটু ইতস্ততঃ করিতেছে, এমন সময়ে সেই উদাসীন চোরা-কুঠরী হইতে বাহির হইয়া গরবিনীর নিকটে আসিল। এদিকে গরবিনী দারুণ গরলে জর্জ্জরিত হইয়া ঢলিয়া পড়িল। উদাসীনকে দূরে দেখিয়া হীরালাল পলায়ন করিল। ঝড়

জলে পথ চিনিতে না পারিয়া খিড়কীর-দ্বার দিয়া বাহির হইল। এই পথে সেই কোমর-ভাঙ্গা সর্পটা পড়িয়াছিল, নীরবে হীরালালের পায়ে দংশন করিল। খীড়কীর চারিদিকে প্রাচীরে ঘেরা, বাহিরে যাইবার যো নাই। নিরর্থক ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার বাটীর মধ্যে আসিল, কিন্তু সদরদ্বারে পেঁছিবার পূর্ব্বেই বিষে জর জর হইয়া পড়িয়া গেল, অনেকক্ষণ চৈতন্য রহিল না। শেষে যৎকালে আবার জ্ঞান হইল, তখন বুঝিল একজন স্ত্রীলোকের কোলে মাথা রাখিয়া ভূমে পড়িয়া আছে। হীরালাল কাতরে মা-মা শব্দ করিল। যার কোলে ছিল, সে উত্তর দিল "ভয় নাই! ভয় নাই! প্রভু রাধাকান্ত আমাদের প্রাণ দিলেন, তিনি স্বয়ং এখানে আসিয়াছেন।"

হীরালাল দেখিল, গরবিনী কথা কহিতেছে। তখনই উঠিয়া বসিল, শরীরে বিলক্ষণ বল পাইয়াছে, আর ভয় কি? গরবিনী বলিল, "আমরা মরিয়া প্রাণ পাইলাম বলিয়া আশ্চর্য্য হই নাই, কিন্তু এঁর উপদেশে আমার জ্ঞান হয়েছে, আজি আমার ধর্ম্ম রক্ষা হইল, অদ্য হইতে তুমি আমার পিতা, আমি তোমার কন্যা। এঁরে প্রণাম কর।" এ কথায় হীরালালের শ্রদ্ধা হইবে কেন? সে যদি দ্রব্যগুণে প্রাণ পাইয়া থাকে, তাতে উদাসীনের গৌরব কি? বরং সে একবার ভাবিল যে এই হতভাগাটা তার সুখের পথে কণ্টক হইয়াছে, এখনও ইহাকে তাড়াইতে পারিলে কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে।

উদাসীন ইহা বুঝিয়া বলিল, "বৎস হীরালাল! সতীত্ব রত্ন হিন্দু সমাজের সর্ব্বস্বধন। অথবা রত্নই বলি কেন? সতীত্ব হিন্দু সমাজের মজ্জা, এই মজ্জাতেই প্রাণ আছে। মুসলমানেরা অস্থিমাংস দগ্ধ করিয়াছে, তথাপি এই মজ্জাগত প্রাণ নষ্ট করিতে পারে নাই। তুমি কায়স্থ-সন্তান হইয়া কোন্ প্রাণে ইহাতে বিষ মিশ্রিত করিতে চাও? এই জন্যই কি বিধাতা তোমাকে রূপ গুণ দিয়াছেন? সাপে সাপ খায়, কিন্তু তুমি কি মানুষ হইয়া মানুষ খাইবে?"

এই সময়ে গরবিনী বলিল "সাপের মাথায় যে মণি থাকেনা, কেবল ভুওয়া আলো থাকে, তা আমি আজি জানিলাম।"

হীরালাল অধোবদনে প্রস্থান করিল। গরবিনীও গৃহে গেল। আজি

হইতে গরবিনীর মতি গতি ফিরিল, কিন্তু মতিলাল আর ফিরিল না। চট্টগ্রামের সীমান্ত প্রদেশে যাইয়া, মতিলালের জ্বর হয়। এখানে ডাক্তার বা ভাল বৈদ্য নাই, হাতুড়িয়ারা অঞ্জলি ভরিয়া বিষাক্ত ঔষধ খাওয়াইয়া দেয়। ইহাতেই তার মৃত্যু হইল। এখানে দুই একজন কায়স্থ ছিল. ইহারা উহার মৃত দেহ শ্মশানে লইয়া গেল কিন্তু দাহ করিতে পারিল না। ঘোরতর বৃষ্টি বাদল উপস্থিত হওয়ায় উহারা মড়া ফেলিয়া পলাইল। কুলাঙ্কক এই সংবাদ পাইলেন এবং কুশপুত্তলিকা দাহ করিবার উদ্‌যোগে ছিলেন। তার পরেই এই মোকদ্দমার বিভ্রাট ঘটিয়াছে।

কুলাঙ্ককের দ্বিতীয় কন্যা হেমলতার চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইল তথাপি বিবাহ হয় নাই। আদ্যরস না হইলে কর্ত্তার সাতপুরুস নরকস্থ হয়, আবার আদ্যরস করিতে গেলে গৃহিণী বিরস হন। গরবিনীর কল্যাণে একটী বালিকারে বৈকুণ্ঠধামে পাঠান হয়েছে, কর্ত্তাবাবু এবারেও তাহাই করিতে চাহেন, কিন্তু গৃহিণী বলেন সকলের ভাগ্যে পুণ্য কার্য্য সহ্য হয় না। সুতরাং এই গোলযোগে হেমলতা অনূঢ়া অবস্থাতেই রসবতী হইল। ইহার পরে যখন জীবন বাবু এখানে বাসা করিলেন, তখন আরও পাকিয়া উঠিল। জীবন যে এপথে কৃষ্ণ বিষ্ণুর মধ্যে একজন, তা আমরা পুর্ব্বেই পরিচয় দিয়াছি। আবার জীবনের সঙ্গেই হেমের বিবাহের প্রস্তাব হওয়ায় সোণায় সোহাগা হইল। তবে হিন্দু সমাজের পবিত্র নিয়মানুসারে কোর্ট-সিপ নাই বলিয়াই জাতি কুল রক্ষা পাইয়াছে, না হলে কুকুর কি পূজার অপেক্ষায় প্রসাদ কোলে করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে?

ছয় মাস পূর্ব্বে ইহার কোন জ্বালা ছিল না, উহার বিচারে কোকিলের চেয়ে কাকের জিত ছিল; বলিত, কাক পাঁচ রকম ডাক ডাকিতে পারে, আর কোকীলের এক "কু কু" বই পুজি নাই। জীবন যে কোন্ পথে ইহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল, তা বালিকা জানিতে পারিল না। হেমলতার হৃদয় অরাজক রাজ্য, সুতরাং জীবন নির্ব্বিঘ্নে ইহার অধীশ্বর হইলেন। কিন্তু হেমলতা গরবিনীর মত নির্ব্বোধ নয়। সতীত্ব যে হিন্দুবালার প্রাণের অধিক ধন, তা বিলক্ষণ জানিত। জীবনকে

পতি কামনা করিয়া কামেশ্বর মহাদেবের পূজা মানসিক করিয়াছে। ফুলে অক্ষর সাজাইয়া "হেমলতা" মালা গাঁথিয়া জীবনের উদ্দেশে মহাদেবের চরণে অর্পণ করিয়াছে, তথাপি উহার মনের কথা কেহ প্রকাশ পায় নাই। জীবন বাবু, বিজয়া দশমীর বিসর্জ্জনের সময়ে হেমলতাকে মহাদেবের ঘরে একাকিনী পাইয়া মস্তক পাতিয়া দিয়াছিলেন। সেই দিন সোমবার, বালিকা সমস্ত দিন উপবাস করিয়া অপরাহ্নে পূজা দিতে আসিয়াছে। দাসীরা বিসর্জ্জনে মাতিয়াছে, ইহাতেই একাকিনী আসিতে হইয়াছে। হেমলতা জীবনের সঙ্গে বাক্যালাপ করিল না। আজি আর "হেমলতা" মালা ছড়াটী শিবের চরণে দেওয়া হইল না, জীবন ভূমি হইতে কুড়াইয়া লইয়া গলায় পরিলেন। বালিকা সত্বরে প্রস্থান করিল। ইহাও নিতান্ত নীতিবিরুদ্ধ কাজ—এই ভয়েই হিন্দুরা বালিকাকালে পাত্রস্থ করে।

ইহার কিছুদিন পরেই কুলাঙ্কক কারাবদ্ধ হলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষি দিয়া জীবন বাবু বাড়ী পরিত্যাগ করিলেন। হেমলতার বিবাহ-প্রসঙ্গ চাপা পড়িল।

কুলাঙ্ককের পুরোহিত প্রেমদাস গোস্বামী ঘোরতর গোঁড়া বৈষ্ণব, কিন্তু এঁর ভগ্নি রামমণি শাক্ত কুলের কুলবধূ। রামমণির পতিপুত্র নাই। বয়স চল্লিশ বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছে। এঁর শ্বশুরের পূর্ব্ব পুরুষ ভগবতী দক্ষিণা-কালীর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রামেই সেই ঠাকুর-বাড়ী। মন্দির নাট মন্দির আদি দেখিলে বোধ হয় পূর্ব্বকালে জগদম্বার বিলক্ষণ পসার ছিল। লোকে বলিয়া থাকে এখানে নর বলি হইয়াছে। এখন কিন্তু দিন চলা ভার। কুলাঙ্ককের শাসনে গ্রামে জবাফুল থাকে না; বিল্বপত্রের একাংশে বিষ্ণুর বাস, অকারণে বেলগাছ কাটিতে নাই—এই জন্য এক এক আদ্যশ্রাদ্ধে তিন তিন বৃষ কাষ্ঠের ব্যবস্থা করিয়া গ্রামটীকে নিষ্কণ্টক করা হয়েছে। এক্ষণে প্রজারা বেল খাইয়া নদীর জলে বীজগুলি ফেলিয়া আসে, নাহ'লে জরিমানা হয়।

জগদম্বা আজিকালি রামমণির কুপোষ্য হইয়াছেন। তাঁর রুধির নাহ'লে চলেনা; রামমণি বিলাতি কুষ্মাণ্ড বলিদান দিয়া নিয়ম পালন করেন

এবং প্রত্যহ গঞ্জনা দিয়া বলেন, "অজ্জুয়ো না দেখাইলে দুঃখ ঘুচিবে না"। সম্প্রতি কুলাঙ্গক কয়েদ হওয়ায় রামমণি আহ্লাদে অধীরা হলেন এবং রুদ্রাক্ষ মালা গলায় দিয়া কপালে রক্তচন্দন লেপিয়া ভৈরবী মূর্ত্তিতে কুলাঙ্গকের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। গৃহিণী প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দুঃখের কাহিনী বলিতে লাগিলেন। রাম মণি কহিলেন, "বাছা আর বলিতে হইবে না, আমি সমস্ত জানি; সর্ব্বনাশীর জ্বালায় আমি অস্থির হয়েছি। এমন সর্ব্বনেশে দেবতা আর নাই, তার কোপে পড়িয়াই কর্ত্তার এই দুর্দ্দশা; এখন প্রাণ বাঁচিলে হয়। আমি কোন মতেই রাক্ষসীকে শান্ত করিতে পারি নাই—আজি একমাস কাল আমাকে ঘুমাইতে দেয় নাই, প্রতি রাত্রেই স্বপ্নে দেখি যেন কর্ত্তার ঘাড়ে পা দিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই রাধাকান্ত দেব কি দেবতা নয়? উনিও দেবতা; তবে ইনি শান্ত শিষ্ট, কাহারো উপরে রাগ তাপ নাই; কিন্তু সর্ব্বনাশীর সে স্বভাব নয়। আর তোমরা যে বলিলেও বুঝিতে পার না—বৃন্দাবনের নন্দরাণী এই সর্ব্বনাশীকে পূজা করিয়াই তো রাধাকান্তকে পায়। আয়ান, যে দিন রাধাকান্তের প্রাণবধ করিতে যায়, সে দিন ঐ সর্ব্বনাশীই তো রাধাকান্তকে আঁচল ঢাকা দিয়া রক্ষা করে।

হেমলতা বলিল, "কালীর আবার আঁচল কোথায় আছে, উনি যে উলঙ্গী। তবে তোরাই বল, আমার কথায় কাজ নাই।" এই বলিয়া রামমণি একটা ঘোরতর ঝঙ্কার দিল। গৃহিণী পায়ে ধরিয়া শান্ত করিলেন, জগদম্বার পূজার পরামর্শ হইল। পুরোহিত একথা জানিতে পারিলেন না। গৃহিণী সন্ধ্যার পরে রাধাকান্তদেবকে প্রণাম করিতে যাইয়া, ভক্তিভাবে মনে মনে বলিলেন. "ঠাকুর আমি প্রাণের দায়ে শত্রুর উপাসনা করিতে যাইতেছি. তুমি ইহাতে রাগ তাপ করিও না, আমি তোমার তিনগুণ পূজা দিব।"

পরদিবসে গৃহিণী কন্যা দুইটাকে লইয়া জগজ্জার বাড়ীতে উপস্থিত হ'লেন। পাছে রক্ত চন্দন জবাফুল আদি দেখিতে হয়, সেজন্যে চক্ষু মুদিয়া প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, মা! বড় দায়েই তোমার দ্বারে আসিয়াছি।"

আজি রামমণি বড় ব্যস্ত, ঠাকুর বাড়ী পরিষ্কার করিলেন এবং সদরে খিল আটিয়া দিলেন; এমন সময়ে নাট মন্দিরের পার্শ্বে একজন গান ধরিল :—

এ-সরোজ পদে মরি কত মাধুরি—
মাতিল জগৎ আজি সুধার সৌরভে—উজলিল রবিশশী, হাসে দিবা বিভাবরী।
জলদ মৃদু গরজে, মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে, বিরাজে বাণী সরোজে, বীণা-যন্ত্রে ঝঙ্কারী।
সাগর সমীর সঙ্গে, নাচে কত রঙ্গে ভঙ্গে, গায়রে গঙ্গাতরঙ্গে, কল কল লহরী॥

কন্যা দুইটী গান শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইল। বালকের কণ্ঠস্বর বুঝিয়া গৃহিণী উহাদিগকে লইয়া চলিলেন; কিন্তু গিয়া দেখিলেন, পক্ক শ্মশ্রু জটা-ধারী সন্ন্যাসী গান গাইতেছে। বৃদ্ধের মুখে এমন চমৎকার গান শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। এ দিকে পূজক পূজায় বসিলেন, গৃহিণী আর বিলম্ব করিলেন না—সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দিতে বলিয়া মন্দিরে গেলেন। কন্যারা ভিক্ষা দিতে গেল, গরবিনীর হাতে ভিক্ষা পাত্র দেখিয়া বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বলিলেন, তোমার হস্তে ভিক্ষা লইব না—জলে ফেলিয়া দাও। গরবিনী বিষণ্ণ বদনে বলিল, "হেম! আমি এই জন্যই মরিতে চাই, বিধবা হইয়া পৃথিবীতে থাকিতে নাই, তুমি আসিয়া ভিক্ষা দাও।"

সন্ন্যাসী গরবিনীর বদন নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "না তুমি বিধবা নও, তোমার শরীরে বৈধব্য লক্ষণ কিছুই নাই।"

হেমলতা বলিল, "ঠাকুর! বিদ্যা প্রকাশ না করিলে মান থাকিত। দিদি সত্যই বিধবা।"

সন্ন্যাসী উগ্রস্বরে বলিলেন, "বালিকে! চপল মতি বালিকার প্রণয় বুদ্‌বুদের মত। যে দিন আমার কথা মিথ্যা হইবে, সে দিন গগণে সূর্য্যোদয় হইবে না। এই গরবিনী অবশ্যই সধবা।"

হেমলতা চারিখানা নভেল পড়িয়াছে, সন্ন্যাসীর ধমকে ভুলিবে কেন? বিশেষতঃ যে ব্যক্তি মতির মৃত্যু সংবাদ আনিয়াছে সে কখনই মিথ্যা

ঘলে না। বালিকা ভাবিল, সন্ন্যাসী কিছু পাইবার ফিকির করিয়াছে। তাঁহাকে অপ্রতিভ করিবার জন্য বলিল, "ঠাকুর! আমি স্বধবা কি বিধবা?

সন্ন্যাসী বলিলেন "তুমি স্বধবা।" হেমলতা হা হা শব্দে হাসিয়া বলিল, "না ঠাকুর! তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে আইবুড়ো বল; কনে সাজিয়া বিবাহ করিতে আমার বড় সাধ হয়।"

সন্ন্যাসী বলিল "আর বিবাহ দিতে পারি না, এবারে নিকা কিম্বা সাঙ্গা হবে। কিন্তু জীবন থাকিতে তাহাই বা কিরূপে হইতে পারে?"

গরবিনী বলিল, "সে কি ঠাকুর! হেমের যে মূলে বিবাহ হয় নাই? তোমার গণনা সমস্তই মিথ্যা।"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "ইহাতে আমার দোষ নাই। দেব দেব কামেশ্বর গাঁজার ঝোঁকে গোল বাধাইয়াছেন। তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া হেমকে জীবনের গলায় গাঁথিয়া দিয়াছেন।" গরবিনী বলিল, "তাহ'লে হেম এখানে থাকিবে কেন?" সন্ন্যাসী বলিলেন, "হেমের কায়াটী এখানে পড়িয়া আছে, আসল হেম, ফুলের মালা হইয়া জীবনের কণ্ঠে ঝুলিতেছে।"

হেমলতা এই সকল কথা শুনিয়া ঘাড় হেট করিল, লজ্জায় কথা কহিতে পারিল না। গরবিনী ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "ওরে কলঙ্কিনি! মুখে কথা নাই কেন? আমরা এ কথা আগে জানিতে পারিলে জীবনকে কুকুর দিয়া খাওয়াইতাম।" হেমলতা এতক্ষণ কথা কহে নাই, অধোবদনে ছিল; এবারে গরবিনীর বাক্য সহ্য করিতে পারিল না। বলিল, "দিদি! শিয়াল কুকুরকে খাওয়াইবার সাধ কি মিটে নাই?"

মতিলালের মৃত দেহ দাহ হয় নাই, তারে শিয়াল কুকুরে খাইয়াছে, সেই জন্যই এই প্রসঙ্গটী হইল; "গরবিনী তাহা বুঝিতে পারিয়া রাগে জ্বলিয়া উঠিল এবং বলিতে লাগিল, আমি কুশ-পুত্তলিকা দাহ করিয়া শুদ্ধ হইব; কিন্তু তোর মত ত অসতী নই? বরং সন্ন্যাসী ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কর্?

দুই ভগিনীতে ভাব প্রণয় যথেষ্ট আছে, অথচ ঝগড়াও করে। সন্ন্যাসী ইহা বুঝিয়া বলিল, "তোমরা দুজনেই নিরপরাধী, কারও কিছু দোষ নাই। বিশেষতঃ গরবিনীর চমৎকার পতিভক্তি, মতি মরিবার

পূর্ব্বে গরবিনী তাহাকে দগ্ধ করিয়া ছাড়িয়াছে। গরবিনীর হাতে হাউই বাজি ছিল, গরবিনী আগুন লাগাইয়া ছাড়িয়া দেয়, মতি জ্বালায় অস্থির হইয়া ঝড় জল বজ্রাঘাত মানিল না, দ্রুতবেগে চট্টগ্রামের প্রান্তসীমায় যাইয়া পড়িয়াছিল। এখন আর কুশপুত্তলিকা দাহ না করিলেও চলিতে পারে!"

গরবিনী বলিল, "ঠাকুর! তথাপি আমি ওর মত অসতী নই।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি উদাসীন সন্ন্যাসী, তোমাদের বিবাদ বাধাইতে আসি নাই, তবে সত্য কথা বলাই আমাদের ব্রত। বালিকা হেমলতা আজি পর্য্যন্ত ছল চাতুরী শিখে নাই, রাধারাণী সাজিতেও জানে নাই, হীরার চাকচিক্যে ভুলিয়া মতিকে জলে ভাসাইতেও পারে নাই, চাঁচরের রাত্রে হীরালালকে লইয়া বিজন পুরীতে প্রবেশও করে নাই, তবে সে কি প্রকারে সতী হইবে?"

গরবিনী রাগে গরম্ গরম্ করিয়া বলিল, "ঠাকুর! এই কি তোমার সত্য কথা? হীরালাল যে আমার সন্তান, সে আমাকে মা বলিয়াছে।"

গরবিনী হেমলতার মুখপানে চাহিল। হেমলতা সময় পাইয়াছে, ছাড়িবে কেন? হাসিতে হাসিতে বলিল, "তবে কি সন্ন্যাসী ঠাকুরের কথা আমার বেলাই সত্য হবে? আর এতেও তোমার জিত আছে, তুমি মরা ভাতার ফিরে পাবে। আমার কেবল কলঙ্কই সার।"

গরবিনীর সর্ব্বাঙ্গ জলিয়া গেল, রাগে আত্মহারা হইয়া বলিতে লাগিল, "এই ভণ্ড সন্ন্যাসীর কথায় আমার কিছুই ক্ষতি নাই। এ গণ্ডমূর্খের যদি দৈবশক্তি থাকিত, তাহ'লে আমার মনের কথা জানিত। আমি যে বিধবা হইয়াও কেন এখন প্রাণ রাখিয়াছি, তাহা জানিলে পাগলের মত প্রলাপ বাক্য বলিত না। কি উপায়ে আমি সেই পতির চরণ দুটী পাইব, তাহাও বলিয়া দিতে পারিত। যে মহাপুরুষের কৃপায় আমি চরিতার্থ হয়েছি, পতি যে কি পদার্থ তাহা জানিয়াছি; তিনি যদি সদয় থাকেন, তাহ'লে আমি অবশ্যই স্বামীর চরণ পাইব। আমি পৃথিবীতে ঘরকন্নার জন্য লালায়িত নই। ছল-চাতুরী-পূর্ণ সংসারে এইরূপ সন্ন্যাসীর বিদ্যা খাটিতে পারে, কিন্তু আমি যেখানে যাইয়া তার পাদুটী ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিব, সেখানে এরূপ মিথ্যাবাদী সাক্ষীর কথা কেহই শুনিবেনা। আমার এই দেহ কুশপুত্তলিকার সঙ্গে একত্রে দাহ হইবে।"

গরবিনীর ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া হেমলতা স্তম্ভিত হইল, কিন্তু সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিল, "গরবিনী! তুমি রাধারাণী সাজিয়া চিতায় উঠিবে কি?"

গরবিনী ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া বলিল, "তোমার মত কুচক্রী চণ্ডাল জগতে নাই। তোমার আবার সন্ন্যাস আশ্রম কেন?"

সন্ন্যাসী বলিল, "গরবিনী! তুমি অনায় রাগ করিও না। আমি তোমার মঙ্গলের জন্যই বলিতেছি। মতিলাল কখনই মরে নাই, তুমি চিতা-রোহণ করিলে যদি সে নির্ব্বোধ তোমার পা দুটী ধরিয়া সাধিতে যায়, তাহলে আবার কি তার কপাল ফাটাইয়া দিবে? তাই সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, হুকা বৈটকটা যেন নিকটে না] থাকে।"

গরবিনীর পূর্ব্ব-কথা মনে পড়িল, আর সহ্য করিতে পারিল না। জীবন যেন তার ভার বোঝা হইল। ভূমে বসিয়া অধোবদনে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিল এবং অতি কাতরভাবে বলিল, "হেম! আমি বড় চণ্ডালিনী, আমার ন্যায় পাপিষ্ঠা জগতে নাই; আমি অকারণে সন্ন্যাসীর নিন্দা করিয়াছি। স্বহস্তে আত্মঘাতিনী হইয়া এপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। আমি আর এ মুখ কারেও দেখাব না।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "গরবিনী! পাপের বোঝা ভারি করিতে চাও কেন? একেই তো স্বধবার মরণে অধিকার নাই, তাতে আবার আত্মঘাতে ঘোর মহাপাতক।" গরবিনীর অবস্থা দেখিয়া হেমের হৃদয় গলিয়া গেল, সে কাঁদিয়া বলিল, "দিদি! সন্ন্যাসী ঠাকুর মানুষ নয়, ওঁর সকল কথা মিলিয়াছে। মতিলাল অবশ্যই বাঁচিয়া আছে। তুমি আর কাঁদিও না, মতি কোথায় আছে তার সন্ধান কর।"

গরবিনী সে কথা মানিল না, কেবল কাঁদিতে লাগিল। হেম যাইয়া গৃহিণীকে ডাকিয়া আনিল। গৃহিণী আসিয়া আর সন্ন্যাসীকে দেখিলেন না, অন্বেষণ করিয়াও পাইলেন না। ইহাতে আরও ভক্তি বাড়িল। "মহাপুরুষ আর একবার গরবিনীকে দর্শন দিবেন, এইরূপ আশ্বাস দিয়াছিলেন।" গরবিনী সেই আশার উপর নির্ভর করিয়া প্রাণ রাখিল; তিনি আসিলেই, সে বিধবা কি না, এই সন্দেহ ভঞ্জন হইবে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বঙ্গদেশের নবদ্বীপ গ্রাম মা-বাগ্‌বাদিনীর রাজধানী। প্রবাদ আছে যে এই স্থানে তিনি প্রত্যহ আড়াইদণ্ড কাল অবস্থিতি করেন। তাঁর অধিকাংশ বরপুত্র এই স্থানকে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। পতিত-পাবন গৌরাঙ্গদেব এইস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া সমগ্র ভারতে অমৃত-সিঞ্চন করিয়াছিলেন। এইস্থানের পণ্ডিতেরাই বেদ স্মৃতি আদি মন্থন করিয়া ন্যায়-শাস্ত্ররূপ অমৃত তুলিয়া গিয়াছেন। সেই অমৃতের প্রভাবেই তাঁরা সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা এড়াইয়া, এই জরা-মরণসঙ্কুল ধরণীতে অমরত্ব ভোগ করিয়া গিয়াছেন। একজন মহাপুরুষ শিষ্য-মণ্ডলিকে পাঠ দিতেছেন, এমন সময়ে তাঁর ত্রিশ বৎসরের পুত্র দেহত্যাগ করিল। তাঁর ইহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, অন্য চারিজন শিষ্যকে শব-দাহের অনুমতি দিয়া আবার পড়াইতে লাগিলেন। ঐ চারিজন শ্মশানের কার্য্য শেষ করিয়া আসিলে পর, তাহাদিগকে অম্লান বদনে বলিলেন, "পুথি লইয়া আইস, আমি তোমাদের পাঠ দিয়া স্নান করিব।" শিষ্য চারিজন পড়িতে বসিল, কিন্তু গৃহিণীর আর সহ্য হইল না—তিনি গর্ব্বিত ভৎর্সনে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আমার সর্ব্বস্ব ধন নীলমণি গেল! তথাপি তোমার চক্ষে একবিন্দু জল বাহির হইল না! অন্য-পর লোকের চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসিয়া যাইতেছে!" বাস্তবিক ঠাকুরের আর কেউ ছিল না, কেবল এই মৃত পুত্রের একটী শিশু ছিল। শিশুর নাম বাণু। বাণু, পিতামহীর অঞ্চল ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। ঠাকুরটী ব্রাহ্মণীর কথায় ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণি! আমার ভুল হইয়াছে, পুত্র শোকে যে কাঁদিতে হয় তাহা আমার মনে ছিল না; কিন্তু এখন হইতে সতর্ক থাকিব, তোমার ঐ "বাণুর" বেলায় আর ভুলিব না।" অর্থাৎ সেই একমাত্র বংশধর বাণুর মৃত্যু হইলে, তিনি কাঁদিবেন, এই বলিয়া গৃহিণীকে সান্ত্বনা করিলেন।"

আর এক ঠাকুরের গৃহিণী, রাঙা সুতা হাতে বাঁধিয়া "আয়তি" রক্ষা করিতেন। গৃহে কিছুরই সংস্থান ছিল না; প্রাতঃকালে বলিলেন, "ঠাকুর! আজিকার উপায় কি?" কে এ কথার উত্তর দিবে? ঠাকুরটী তখন জীবাত্মাকে লইয়া পরমাত্মার পিছে পিছে ব্রহ্মলোকে ছুটিতেছিলেন। কেবল তেঁতুল গাছের উপরে শূন্য-দৃষ্টিপাত করিলেন। ব্রাহ্মণী তেঁতুল পাতা সিদ্ধ করিয়া মধ্যাহ্নে অন্ন দিলেন। ঠাকুর তাহাই বদনে দিয়া পরমাহ্লাদে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রাহ্মণি! এ অমৃত-দ্রব্য কোথায় পাইলে?" পতিব্রতা সভয়ে সত্য কথা বলিলেন এবং আপনার দুর্ভাগ্যের জন্য আক্ষেপ করিলেন। ব্রাহ্মণ তাহাতে মহা বিস্ময় হইয়া বলিলেন, "যার গৃহে এরূপ অমৃত বৃক্ষ আছে, তার আবার দুর্ভাগ্য কোথায়?" একদা নবদ্বীপ পতি এই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন, "কিছু অসঙ্গতি আছে কি?" ন্যায় শাস্ত্রের কোন অংশের ভাব-সংগ্রহ না হইলে তাহাকে "অসঙ্গতি" বলে; ঠাকুর তাহাই বুঝিলেন এবং রাজার কথায় উত্তর দিলেন, "আমার আবার অসঙ্গতি কিসের?" রাজা আবার বলিলেন, "অর্থের অসঙ্গতির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।" এবারে ঠাকুরের মহা রাগ হইল এবং উগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "মহারাজ! বার বার এরূপ অপমান করিবেন না; কাব্য অলঙ্কার শেষ না করিয়া কেহ আমার চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ করে না।" রাজা ভাবিলেন, "কি বিপদ! ঠাকুর শাস্ত্র অর্থের কথাই ধরিয়াছেন।" ইহার পরে তিনি আর তাঁহাকে কিছু না বলিয়া যথেষ্ট অর্থ দিলেন। কিন্তু গঙ্গাতীরে পূজা করিবার সময় অর্থের থলিয়াটী সেই স্থানে রাখিয়াছিলেন; আনিতে মনে হইল না। ব্রাহ্মণী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন স্মরণ হইল এবং অম্লান মুখে শ্লোক আওড়াইতে লাগিলেন. " চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনং যৌবনং চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তি যস্য সঃ জীবতি।"

এখন আর সেরূপ পাগল দেখা যায় না। ভারতের ভাগ্যগুণে, একদিকে খৃষ্টান মিসনরি—অন্যদিকে ব্রাহ্মভ্রাতারা সভ্যতার আলোক জ্বালিয়া দিয়াছেন। হিন্দুয়ানির কুসংস্কার সান্নিপাতিক বিকারের মত সাংঘাতিক রোগ। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা ইহাতে বেশী অভিভূতা। সেই জন্য খৃষ্টান-কুমারী বিবিলুক উপযাচিকা হইয়া অন্তঃপুরের রোগদের চিকিৎসা করেন।

ব্রাহ্মণবালিকা সরলার রোগ কোনমতে সারিল না। সরলার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর। বিবিলুক তাহাকে লইয়া বিব্রত হইলেন। সর্ব্বশেষে গল্পচ্ছলে ঝাড়ান মন্ত্র ধরিলেন। বিলাতের কুলাঙ্গনাগণের সুখ ঐশ্বর্য্যের কথা পাড়িয়া বলিলেন, স্ত্রীলোকেরা যখন পুরুষদের সঙ্গে যুগল হইয়া নৃত্য করে, তখন পৃথিবীকে স্বর্গ বলিয়া ভ্রম হয়। সরলা বলিল, "ছি! ছি! স্বামীর সঙ্গে নাচ? ছি! কি ঘৃণা!" বিবি বলিলেন, "স্বামীর সঙ্গে কেন? আপনার ইচ্ছামত পুরুষ বাছিয়া লইবে। স্বামী, অন্য স্ত্রীর সঙ্গে নাচিতে পারেন, যদি তাঁর ভাগ্যে কেহ না জুটে, তবে তিনি সভায় বসিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত করুন। তানাহলে আর স্ত্রী-স্বাধীনতার গৌরব কি?" সরলা বলিল, "তুমি অসতী কুলটার কথা পাড়িলে কেন? আমরা এদেশে তাদের মুখ দেখি না। বিবলুক হাসিয়া বলিলেন, পরপুরুষের সঙ্গে নাচিলেই কি কুলটা হয়? সতী কি আমোদ করিতে পাইবে না? সরলা বিস্ময় হইয়া বলিল, এরূপ "স্ত্রীলোক কি সমাজে আদর পায়? স্বামী কি তাহাকে ঘরে লয়? বিবি স্বগর্ব্বে বলিলেন, বরং স্বামী পরস্ত্রী-গমন করিলে স্ত্রী তাহাকে আইনানুসারে পরিত্যাগ করিতে পারে, এবং অন্য পুরুষকে বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু, নাচ তামাসার জন্য স্ত্রীকে কিছু বলিবার যো নাই। তবে ব্যভিচারিণীর পক্ষে স্বতন্ত্র কথা। স্বামীত্যাগের কথা শুনিয়া হিন্দুবালা শিহরিয়া উঠিল এবং বলিল, "তবে কি বিবাহ পিঠালির আঁক? পৃথিবীর সুখের জন্যই কি বিবাহ! পরকালে কি কোন সম্পর্ক নাই! আমরা কি পশুপক্ষীর মত?

বিবিলুক আরও বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এই জন্যই তোমাদিগকে অসভ্য বলে। সংসারের বাজে কথা ঈশ্বরের পাকা খাতায় তুলিতে চাও? এখানে ধোপায় কাপড় কাচে, নাপিত কামাইয়া দেয়, এরাও কি আমাদের সঙ্গেসঙ্গে স্বর্গে যাবে? তাই তুমি পরকালে স্বামীর সঙ্গে সম্বন্ধ বজায় রাখিতে চাও। কি ভ্রম! কি কুসংস্কার!

সরলা কাণে হাত দিয়া বলিল, "আমরা জন্ম জন্ম অসভ্য হইতে স্বীকার আছি, তথাপি পরকালে স্বামীর আশা তুলিতে পারিব না, সেই আশ্বাসে পৃথিবীর সকল যন্ত্রণা সহ্য করি।"

বিবিলুক বুঝিলেন, সরলার উদ্ধারের আশা নাই। তিনি নীরবে প্রস্থান করিলেন।

সরলার মাতুল বিধু বাবু, অলক্ষ্য স্থানে থাকিয়া এঁদের কথা বার্ত্তা শুনিলেন। বিধু বাবু একজন ব্রাহ্ম, এই গ্রামেই এঁদের সমাজ আছে। গ্রামের লোক সমাজের মাহাত্ম্য জানে না বলিয়া, ইহাকে ব্রহ্মজ্ঞানীর আখ্‌ড়া বলিয়া থাকে।

খৃষ্টান মিশনরি, এবং ব্রাহ্ম সম্প্রদায়, উভয়েই ভারত হিতৈষী। দুই দলের এক ব্যবসা হইলে পরস্পর বৈরভাব হয়। সম্প্রতি মিশনরিরা স্ত্রী শিক্ষা উপলক্ষে হিন্দুদের অন্তঃপুর দখল করায়, ব্রাহ্ম ভ্রাতারা বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে বিধু বাবু সরলার ভাব গতিক দেখিয়া সমাজের দিকে ছুটিলেন।

সমাজপতি ধমু বাবু, ভক্তবৃন্দকে লইয়া তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় মাতিয়াছেন দেখিয়া বিধু সহসা কথা কহিতে পারিলেন না। এখানে সাকার নিরাকারের তর্ক উঠিয়াছে। ভ্রাতারা সকলেই নিরাকারবাদী। সংপ্রতি একটী বালক ধর্ম্ম-তৃষ্ণা নিবারণ জন্য এখানে আসিয়াছে। ভ্রাতারা একে একে সাকার উপাসনার দোষ দেখাইলেন; তথাপি বালকের মন উঠিল না। সর্ব্বশেষে ধমু বাবু গভীরস্বরে বলিলেন, "বন্ধুগণ! আমি তর্ক বুঝি না, শাস্ত্র মানি না; কিন্তু যতদিন আমি সাকার দেব দেবীর ফাঁদে জড়িত ছিলাম, ততদিন আমার ভয়ে প্রাণ কাঁপিত। ইহাদের শাসনে নিদ্রা হইত না। তার পরে যে দিন শুনিলাম, ব্রহ্ম নিরাকার, তাঁর চক্ষু কর্ণ আদি কিছুই নাই, আমি সেই দিনেই সমাজের খাতায় নাম লিখাইয়া বগল বাজাইয়া বেড়াইতেছি।"

বালক ইহাতেও বুঝিল না। বিধু বাবু তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "হা মূর্খ! সাকার দেবতারা মানুষের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দোষ খুঁজিয়া বেড়ান, কথায় কথায় পাপ লিখেন, তাঁদের ঘুষ যোগাইতে যোগাইতে জীবন কাটিয়া যায়; কিন্তু নিরাকারের দরবারে কোন উৎপাত নাই। তিনি চক্ষেও দেখেন না, কাণেও শুনেন না, দণ্ড দিতেও পারেন না। আমরা প্রাণ ভরিয়া পাপ করিলেও তাঁহাকে হিসাব নিকাশ দিতে হইবে না। এখন বুঝিলে তো!" বালকের মুখে কথা সরিল না। আর একজন ভ্রাতা বলিলেন, "এই জন্যই আমরা বিভুকে দয়াময় বলি। এরূপ না হইলে কি আমাদের পোষায়? যে পাষণ্ডেরা

এরূপ উদার ধর্ম্মে বাধা দেয়, তাদের মাথা কাটিলে রাগ যায় না। হিন্দু সমাজের বিষ দাঁত নাই, কেবল মিশনরিরা বাদী হইয়াছে, ইহাদিগকে পরাজয় করিলেই জগতে ধর্ম্ম-ডঙ্কা বাজাইতে পারি।"

এই সুযোগে বিধু বাবু সরলার কাহিনী পাড়িয়া চক্ষের জল ফেলিলেন এবং বলিলেন, "সরা প্রভৃতি বালিকারা কুৎসিত কদাকার হইলে আমরা কোন কথাই বলিতাম না। দুষ্ট মিশনরিরা সমাজ সাগরের মণি-মুক্তা-প্রবালাদি লইয়া গেল—আমরা কি তবে কড়ি গোঁড় কুড়াইয়া পীরের দরগা সাজাইব? তাহলেই কি এই ধর্ম্মের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা হইবে?"

এই সময়ে দুই তিনটি বাল-বিধবা, ব্রজ গোপীকাদের মত মিশনরির বাঁশরি সঙ্কেতে পসরা সাজাইয়া অকূলে ভাসিয়াছে। সুতরাং বিধু বাবুর কথা সকলের হৃদয়ে বাজিল। বালকেরা মাথা ধরিয়া ভাবিতে লাগিল।

ধন্নু বাবু বলিলেন, "আমি লজ্জা ভয়ে ঘরের কথা প্রকাশ করি নাই, কিন্তু আর চাপিয়া রাখিতেও পারিনা—আমার সহোদরা ভগিনী বিমলা বিধবা হওয়া অবধি কেবল ব্রত নিয়ম লইয়া পশুর আচারে আছে। গুরু পুরোহিতের কুহকে কেবল পূজা আহ্নিক লইয়া শরীরপাত করিল। বাবার মৃত্যুতে আমি নিষ্কণ্টক হয়েছি, তথাপি উদ্ধার হইল না, আমার জীবনে ধিক্! ধন ঐশ্বর্য্যে ধিক্!

কেহ উত্তর দিল না, সকলেই বিধু বাবুর মুখের দিকে তাকাইল। সুরেন্দু বাবু ইহাদের মধ্যে বিজ্ঞ। পরস্ত্রী-হরণ দোষে কারাগারে প্রবেশ করেন, পরে আপীলে মুক্ত হন, সেই অবধি এঁর খ্যাতি প্রতিপত্তির সূত্রপাত হইয়াছে। এই বিধু বাবু গম্ভীর বদনে বলিলেন, "বন্ধুগণ! আমরা ধর্ম্মের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছি, প্রাণপণে বিভুর কার্য্য সাধন করিব।"

এই কথায় বালকেরা লাফাইয়া উঠিল। যুদ্ধ বিক্রম করিয়া সদ্য সদ্য সরলা বিমলাকে উদ্ধার করিতে প্রস্তুত। বিধু উহাদিগকে নিরস্ত না করিলে, সেই দণ্ডেই হিন্দু সম্প্রদায় রসাতলে যাইত। বিধু বলিলেন, "ধর্ম্মবলে কার্য্য সমাধা হবে, আমরা পাপিষ্ঠদের মত লাঠি তলোয়ার ধরিব কেন? ইহাতে ধনও চাহি না। বিভুর কৃপায় কৌশলে কাজ উদ্ধার

হবে। তাঁর কার্য্যে মিথ্যা চাতুরিতে দোষ নাই, ইহাতে তাঁর ঢালা হুকুম আছে। পুলিষ পদে পদে প্রতারণা করিয়া চোর ডাকাইত ধরে, তাতে তাদের প্রশংসা বাড়ে। ধন্নু বাবু সরলার উদ্ধার করুন, আমি বিমলার ভার লইলাম। উভয়ে উভয়ের সাহায্য করিব, অথচ কাক পক্ষী জানিবে না।" সকলেই ইহাতে সায় দিল, এবং মন্ত্রণা চলিতে লাগিল।

জগতে সকলেই সুখের পন্থা খুজিয়া বেড়ায়। ইংরাজজাতির সুখ দেখিয়া আমাদের মন টলিল; ইংরাজের পদাঙ্ক ধরিয়া রহিয়াছি। ইংরাজ স্বাধীনতা-সুধায় অমর, আমরা তাদের প্রসাদ পানে ঢল ঢল। পোড়া কপালে অমরত্ব নাই, লাভের মধ্যে মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছি। মাতালের মুখে দুর্গন্ধ হয়, কিন্তু সে নিজে তা বুঝিতে পারে না, আমাদেরও বোধ হয় সেই দশা ঘটিয়াছে। ইংরাজের আইন আদালত স্বাধীনতা-ধাতুতে গঠিত; আমরা সেই ধুয়া ধরিয়া স্ব স্ব প্রধান হইতে চাই। ইংরাজের আইন অনুসারে মানবজীবনের ভিতর পিঠ বাহির পিঠ আছে। ভিতর পিঠ স্বাধীন, তাহা ভাই সাহেবদের অন্দরের মত মনুষ্যের অগম্য। ইহাতে সহস্র দোষ থাকিলেও বলিবার যো নাই; বলিলেই আদালতে দাঁড়াইতে হইবেক।

এই বিষম সঙ্কটকালে হিন্দুসমাজ রক্ষা করা সাধারণ কাজ নয়। এ অঞ্চলে তত্ত্বনিধি এবং বিদ্যানিধি এই ভার লইয়াছেন। তত্ত্বনিধি কাজের লোক নয়, যাবজ্জীবন অধ্যয়ন করিয়া সময় নষ্ট করিয়াছেন। বিদ্যানিধির সে দোষ নাই, তিনি বুঝিতেন যে সাবেক শাস্ত্র সংহিতা পুরাতন পাঁজির মত অচল হয়েছে। এক্ষণে স্বয়ং দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া নূতন সংহিতা করিয়াছেন। তাহাতেই দেশ চলিতেছে, তত্ত্বনিধি ঢেরা সই দিয়া থাকেন। বিদ্যানিধিকে কলম ধরিতে হয় না।

নব সংহিতার বিধি—ব্যবস্থা অতি চমৎকার। এরূপ না হইলে হিন্দুয়ানি রক্ষা করা ভার হইত। দেবোদ্দেশে বলিদান না করিয়া বৃথা মাংস ভোজন করিলে তৎক্ষণাৎ জাতিচ্যুত হইবে, কিন্তু মদের সঙ্গে মুরগীর মাংসে দোষ নাই। বিদ্যানিধি ঠাকুর ইহার টিকায় লিখিয়াছেন মদিরা দেশাচারের সামিল, তার পর নেশার অবস্থায় মুরগী ভক্ষণ

জ্ঞানকৃত পাপ নয়। ইহা ছাড়া বিধবার ভ্রূণ হত্যা আদি কয়েকটী সামান্য পাপ দেশাচারের মধ্যে ধরিয়াছেন। ইহার টিকায় বলেন "এরূপ ব্যবস্থা না করিলে প্রকারান্তে বিধবা বিবাহে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এই সংহিতার জন্য বিদ্যানিধি দেশে মাননীয় ছিলেন।

সংপ্রতি শঙ্কর চাটুর্য্যের জামাই ব্রহ্মণ্য দেব বিলাত হইতে ফিরিয়াছেন। শঙ্কর ধনাঢ্য লোক, কন্যা বই আর তাঁর কেউ নাই। তিনি জামাতাকে গৃহে লইতে চাহেন। বিদ্যানিধিকে পাঁচ শত টাকা দিলেই সকল গোল চুকিয়া যায়। বিদ্যানিধি গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া দিব্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন যে, ব্রহ্মণ্যদেব জাহাজে উঠেন নাই, সমুদ্রে ভাসেন নাই, রেল গাড়িতে বিলাত যাত্রা করেন, সিমলা পাহাড় পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, সেখানে মন্দাকিনী নদী আছেন, নদীর এপারে যোগী ঋষির স্থান, অপর পারে বিলাত। ইনি এপারে বাসা করিয়া ছিলেন। এ সকল ব্যাপার বিদ্যানিধির চক্ষের দেখা।

শঙ্কর বাবু অতি নির্ব্বোধ লোক, বিদ্যানিধির দয়া বুঝিলেন না। বরং বলিলেন, "শাস্ত্রমতে যদি জামাতা পতিত হন, তবে তাঁর সঙ্গে আমি নিজে মজিতে চাহি না। স্ত্রী পুরুষে কাশী যাইব। তবে ভাল ভাল পণ্ডিত আনিয়া ইহার ব্যবস্থা লইব। শঙ্করের কথায় বিদ্যানিধি জ্বলিয়া উঠিলেন।

বিদ্যানিধি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি মহাবিরক্ত ছিলেন। ইহাদিগকে নাস্তিক খৃষ্টান বলিয়া গালি দিতেন। কিন্তু ব্রাহ্ম ভ্রাতাদের গুপ্ত মন্ত্রণার পর যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্য দক্ষিণা হস্তগত করিয়া সুর ফিরাইবার চেষ্টায় আছেন। এদিকে ভ্রাতারা খোল করতাল লইয়া আখ্ড়ায় সংকীর্ত্তন জুড়িয়াছেন। দেশের লোক ভাবিল বিদ্যানিধির উপদেশে বালকগুলার মতি গতি ফিরিতেছে। বিদ্যানিধি সামান্য লোক নহে।

অপরাহ্নে তত্ত্বনিধি ঠাকুর আমাদের বিধু বাবুকে লইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে বিদ্যানিধি উপস্থিত হইলেন। দুইবার নস্য গ্রহণের পর বলিলেন "দাদা! শঙ্করকে লইয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

সরলস্বভাব তত্ত্বনিধি বলিলেন, "শঙ্করের বড় বিপদ, আহা! তার কন্যাটীর জন্য আমার চক্ষে জল পড়ে। কন্যাটী রূপবতী, গুণবতী, এবং সতী সাধ্বী। এরূপ পতিব্রতার মনে ব্যথা দিতে নাই।

বিদ্যানিধি "হা হা শব্দে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দাদা! তোমার কি কাণ্ড জ্ঞান নাই? যে পাপিষ্ঠা কন্যা সেই খৃষ্টান-পতির জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছে, যার জাতিকুলের ভয় নাই, খৃষ্টানের সঙ্গে বাহির হইয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছে, সেই 'হল' সতী লক্ষ্মি! তবে আর কুলটা কে? আমি নিশ্চয় জানি যে, কেবল মা-বাপের চক্ষের জল দেখিয়া যাইতে পারে নাই. মড়ার মত পড়িয়া আছে।"

তত্ত্বনিধি বলিলেন, "খৃষ্টান কে, শুনিলাম ব্রহ্মণ্য দেব খৃষ্টান হয় নাই। খৃষ্ট উপাসককে খৃষ্টান বলে। আমি ইহার অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি।" এই কথায় বিদ্যানিধি জলিয়া উঠিলেন। তিনি জানিতেন যে, তত্ত্বনিধির অর্থরোগ আছে। শব্দার্থের জন্য মাথা কোটাকুটি করেন। শাস্ত্র চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে এই উৎকট রোগ জন্মিয়াছে। বিদ্যানিধি বিকট ধমক দিয়া বলিলেন, তুমি কোনদিন ব্রহ্মজ্ঞানী গুলাকেও অখৃষ্টান বলিবে। আমি সে দিন তোমাকে খৃষ্টানের অর্থ বুঝাইয়া দিয়াছি—যারা নাস্তিক যারা দেবতা ব্রাহ্মণ মানে না, তারা পাকা খৃষ্টান। বিদ্যানিধি রাগের বশে দক্ষিণার কথা ভুলিয়াছেন, তানাহলে আজি আর ব্রাহ্মভ্রাতাদের নিন্দা করিবার কথা নয়। তত্ত্বনিধি ধমকে ভুলিলেন না, বলিলেন, "ব্রহ্মজ্ঞানীরা তো নাস্তিক নয়, উহারা ব্রহ্ম উপাসনা করে, তবে খৃষ্টান বলি কেন? ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে নাস্তিক হয় না।" বিদ্যানিধি হাসিয়া বলিলেন, "উহারা আমাদের ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলে না, ম্লেচ্ছ দেবতাকে ব্রহ্ম বলে। আমি উহাদের কারসাজি বিলক্ষণ জানি। লোক ভুলাইবার জন্য দেবতার নাম জাল করিয়াছে। কৃষ্ণের বদলে খৃষ্ট, ঈশ্বরের বদলে যীশু, আর ব্রহ্মার বদলে ব্রহ্ম বলিয়া থাকে।"

তত্ত্বনিধি বলিলেন, "যদি ব্রহ্মজ্ঞানীরা খৃষ্টান হয়, তবে তো হিন্দুয়ানি অনেক কাল গিয়াছে, তা'হলে আর ব্রহ্মণ্যদেবের অপরাধ কি?"

বিদ্যানিধির চমক ভাঙ্গিল, তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ভাই! আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করিয়াছি। খৃষ্টানের মধ্যে শাক্ত, বৈষ্ণব, দুইটী সম্প্রদায় আছে। সাহেবেরা শাক্ত, ইহারা শূকর, গরু কিছুই বাছে না। আর ব্রহ্মজ্ঞানীরা বৈষ্ণব, ইহারা অখাদ্য খায় না। বিলাত না গেলে শাক্ত

খৃষ্টান হয় না। ব্রহ্মণ্য দেব বিলাত ফেরত লোক, খাঁটি খ্রীষ্টান অর্থাৎ শাক্ত খৃষ্টান। বিলাতের বাতাস লাগিলে খৃষ্টান হয়, আবার ব্রহ্মণ্য দেবের বাতাস লাগিলে হিন্দুয়ানী নষ্ট হয়। ব্রাহ্ম সম্প্রদায় বৈষ্ণব খৃষ্টান, এদের দোষ মারাত্মক নয়। তারপর আবার উহারা আমার উপদেশে খোল করতালে কীর্ত্তন জুড়িয়াছে। আরও একটী নিগুঢ় কথা আছে, বিলাতী বিবিরা শিক্ষা দিবার ছলে লোকের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে, এবং তাহাদের কুমন্ত্রণায় দুই তিনটী ব্রাহ্মণ বালিকা কুলের বাহির হইয়া খৃষ্টান হইল। ইহাকেই জানানা-মিশণ বলে। ইহা নিবারণ করা বড় কঠিন ব্যাপার, কেননা বালিকা গুলা শিক্ষা শিক্ষা করিয়া ক্ষেপিয়াছে। কিন্তু ঐ মিশনরি বিবিরা ব্রাহ্মদলের চক্ষের বিষ। ব্রাহ্মদল ঘরের ছেলে, ইহারা যদি বালিকাদিগকে শিক্ষা দেয়, তাহারাও সুস্থির হইবে এবং বিবিরা পলাইবে। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া আমি ব্রাহ্মদলকে উদ্ধার করিলাম। ইহাদের দ্বারা অনেক কাজ হবে, আর যদু বাবু একজন প্রসিদ্ধ দাতা।

তত্ত্বনিধি বলিলেন "শঙ্কর বাবু কি কৃপণ? না তাঁর জামাতার এতই মারাত্মক দোষ! আমিতো দেখিতেছি, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।

বিদ্যানিধি বলিলেন, শঙ্করের দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছে। আমার দোষ নাই। আমি বলিয়াছিলাম যে, "আমি সর্ব্ব-সমক্ষে শপথ করিয়া বলিব ব্রহ্মণ্য দেব বিলাতে যায় নাই, নদীর এ পারে দ্বারকা পুরীতে থাকিয়া কাজ শেষ করিয়া আসিয়াছে। নদীর এ পারে দ্বারকা আর ও পারে বিলাত। আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি। কিন্তু পাঁচশত টাকা নগদ চাই। ইহাতে যা উত্তর করিলেন তাতেই সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গিয়াছে, উত্তরটা শুনুন; "আমি টাকা দিতে কাতর নই কিন্তু ছল কপটে হিন্দু সমাজকে মজাইতে ভরসা হয় না। পরকালের ভয়ে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। জামাতা যদি পতিত হইয়া থাকেন আমি কন্যাকে ত্যাগ করিয়া কাশীবাস করিব। দাদা! আশীর্ব্বাদ করুন। আমি উহাকে অন্নে ছাড়িব না। উনি যেমন শঠ, আমিও তাঁহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছি। আজি ওরে চক্ষের জলে ভাসিতে হবে। আমি ওর কথায় সায় দিয়াই ওর বুকে শেল বিঁধিব।

তত্ত্বনিধি নাসিকা কুঞ্চিত করাতে চক্ষু মুদিয়া গেল এবং বলিলেন, ভাই! শঙ্করের পরকাল আছে আর আমাদের কি তা নাই। তোমার সঙ্গে আমিও মজিলাম। বড় কু-সঙ্গ। বিদ্যানিধি হাসিয়া বলিলেন, ইহাতে আমাদের তিলমাত্র পাপ হবে না। কেননা ইহাই আমাদের উপকারক, তথাপি যদি ভয় হয় সভায় নীরব থাকিবেন। বিদ্যানিধি তোমার ভরসায় চলে না। সঙ্গে রাখি বলিয়াই অন্ন পাইতেছো।

বিদ্যানিধি কুক্ষণে এই মর্ম্মভেদী কথাটী বলিলেন। তত্ত্ব-নিধি যেমন সরল, যেমন উদার, আবার তেমনি রাগী।

অপরাহ্নে ইহারা দুইজনে শঙ্কর বাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত হলেন আজি অনেক লোকের সমাগম হয়েছে। শঙ্কর বাবু বিদ্যানিধিকে হিতৈষী বলিয়াই জানেন, পণ্ডিত বলিয়া মানেন। তাঁর জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন, ইহাতে আরও কৃতজ্ঞতা বাড়িয়াছে। বিদ্যানিধি সভামধ্যে শঙ্করের বিস্তর প্রশংসা করিয়া বলিলেন, এরূপ সাধু সদাশয় এবং ধার্ম্মিক লোক কলিকালে দেখা যায় না। ধর্ম্মের জন্য দুধের বালিকা কন্যাকে বৈধব্য সন্তাপে দগ্ধ করা কি সহজ কথা! জামাতা জীবিত থাকিতে, কন্যার বৈধব্য, উঃ মনে করিতে বুক ফাটে!

শঙ্কর, ত্রাস্তভাবে "সে কি মহাশয়! এরূপ অমঙ্গল কথা কেন! জামাতার যে গতি কন্যারও তো সেই গতি হবে। বিদ্যানিধি বলিলেন তাহলে তো উত্তম হতো। শাস্ত্র তা বলে কই?

পতিত-পতি মৃতের সামিল। পতিত-পতির অনুসরণ করিলে চতুর্দ্দশ পুরুষ নরকস্থ হয়। পিতৃলোকেরা এই কন্যার অঞ্চল ধরিয়া ঝুলিতেছেন। "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ" ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বচনে মাথার দিব্য দেওয়া হইয়াছে।

শঙ্করের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল, মুখে বাক্য সরে না। ইনি পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন।

কলেজের প্রধান পণ্ডিত বিষ্ণুশর্ম্মা এখানে আছেন। বিদ্যানিধি তাঁরে চিনেন না। ইনি বিনীতভাবে বলিলেন, ঠাকুর! নষ্টে মৃতে বচনের শেষভাগে "পতিরণ্য বিধিয়তে শব্দ আছে"। ইহা যে বিধবা বিবাহের

ব্যবস্থা। আপনি কি তবে আমাদের দলের লোক? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিষ্য? কিন্তু এখানে তো সে ব্যবস্থা খাটেনা।

বিদ্যানিধি রাগে অগ্নি অবতার হইয়া, বিদ্যাসাগরের উপরে গালাগালির শীলাবৃষ্টি করিলেন এবং সদর্পে বলিলেন, আমার ব্যবস্থা ষাঁড়ের কণ্ঠ, ইহা যে কাটিতে চায় সে কখনই হিন্দু নহে।

পণ্ডিত ধীর প্রকৃতির লোক, তিনি উত্তর করিলেন, কাটা কাটির কথা নয়, ব্যবস্থাটী খাটে না। ব্রহ্মণ্যদেব পতিত হয় নাই। আমি বেশ জানি এই ব্রহ্মণ্যদেব হিন্দু রাজার সঙ্গে বিলাতে গিয়াছিল, হিন্দুর জাহাজে বাস করিত, কেবল হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়াছে।

বিদ্যানিধি পণ্ডিতের পরিচয় লইয়া চীৎকারের মাত্রা বাড়াইলেন এবং বলিলেন, আজি কালি অনেক সাহেব নিরামিস খায়, তাই বলিয়া কি তারা খৃষ্টান নহে। গঙ্গাজল গঙ্গা ছাড়িয়া খালে বীলে মিলিয়া গেলে কি আর মাহাত্ম্য থাকে? বিলাতের বাতাসে খৃষ্টান হয়।

পণ্ডিত বলিলেন, ঠাকুর! আপনি আর্য্য-সন্তান হইয়া কি আর্য্য ভাব ভুলিয়া গেলেন, ব্রহ্মণ্যদেবের পবিত্র জীবনপূর্ণ-চর্ম্ম-কমণ্ডলুতে কি ম্লেচ্ছ-বিন্দু প্রবেশ করিতে পারে? হীরক খণ্ডকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিলেও অপকৃষ্ট ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত হয় না।

বিদ্যানিধি এ দিকে অসুবিধা দেখিয়া নিজ মূর্ত্তি ধরিলেন। "কি! এত বড় স্পর্দ্ধা আমাকে আর্য্য সন্তান বলিয়া গালি দেও? আর্য্য আচার্য্য একই কথা! তবে কি আমি গ্রহ-বিপ্র? তুমি কালেজের খৃষ্টান, খৃষ্টানকে ব্রহ্ম শাপ লাগেনা বলিয়াই পার পাইলে। না হ'লে এই যজ্ঞোপবীত ছিড়িয়া তোমাকে এই দণ্ডে ভস্ম করিতাম। নাস্তিক বেল্লিক বেটা বলে কি না "আমি আর্য্য-সন্তান" তুই বেটা নিজে আর্য্য তোর সাত পুরুষ আর্য্য।

ইহাতে পণ্ডিতের চিত্ত বিচলিত হইলনা। ইনি তত্ত্বনিধির আত্মীয়। তত্ত্বনিধি বৃদ্ধ কালে এই পণ্ডিতের ভাগিনেয়ীকে তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করেন। বেদব্যাসের কথায় সন্দেহ করিতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু কে কবে তৃতীয় পক্ষের মামাশ্বশুরের কথা অবিশ্বাস করে! আবার তত্ত্বনিধি ঠাকুর নিতান্ত সরল স্বভাব এ ব্যবসার উপযুক্ত লোক নহেন। উপস্থিত ব্যাপারে তাঁর হৃদয়

বিচলিত হয়েছে। বিদ্যানিধির দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন যদি বেদ বিধি সত্য হয়, যদি সর্ব্ব শক্তিমান ঈশ্বর ন্যায় বিচার করেন, তবে এই নির্দ্দোষী ব্রহ্মণ্য দেবের ব্রহ্মশাপ, দারুণ বাড়বানলের মত, বিলাতি জল বাতাস ভেদ করিয়া উঠিবে। আর সেই পতি পরায়ণা সাধ্বী বালিকার অশ্রুজল বিপুল হলাহল হইয়া বিশ্ব সংসার ধ্বংশ করিবে। তত্ত্বনিধির মুখে ফেণা উঠিতেছে, চক্ষু রক্তবর্ণ হয়েছে। তাঁর এই রৌদ্র ভাব দেখিয়া অনেকের মনে আতঙ্ক হইল। কিন্তু কুটিল-মতি বিদ্যানিধি দয়া ধর্ম্মে টলিলেন না। পরের কাছে কাজ লইবার জন্য পরকালের কথা মুখে আনেন বলিয়া কি কাজ ভুলিবেন। মনে মনে চিন্তা করিলেন, এখন রাগারাগি করিলে সকল কার্য্য পণ্ড হয়, অধিকাংশ লোক ঐ দিকে টলিয়াছে। সংপ্রতি পাকা কৌশল চাই। এরূপ ভাবিয়া, তত্ত্বনিধি ঠাকুরের পা দুটী ধরিলেন, এবং গদ গদ বাক্যে বলিলেন, দাদা! একটু পায়ের ধুলা দাও।

শঙ্কর বাবুকে আমি সহোদরের মত স্নেহ করি ওঁর কন্যার ভাবি দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া আমার দেহে প্রাণ ছিল না আমি ক্ষিপ্তের ন্যায় কত কথাই বলিয়াছি, তথাপি তোমার ব্যবস্থার উপর দ্বিরুক্তি করিতে পারি নাই। আহা! তোমার এত দয়া না হ'লে বা জগদীশ্বর তোমাকে এত উচ্চ করিবেন কেন?

আমি অহঙ্কার করিয়া বলিতে পারি যে, ব্যবস্থা পত্রে তোমার স্বাক্ষর থাকিলে হবিষ্যের সঙ্গে গো মাংস চালাইয়া দেওয়া যায়। বৃদ্ধ পাদরি কৃষ্ণ বন্দ্যোর পৌত্রের উপনয়ন হয়! ব্রহ্মণ্যদেবের তো অতি সামান্য দোষ বিশেষতঃ ও ব্যক্তি যে অখাদ্য খাইয়াছে, তা তো আমরা কেউ দেখিতে যাই নাই। এ দেশে এমন কে আছে যে, আপনার মত খণ্ডন করে আপনি আমাদের বেদব্যাস। আপনি স্মার্ত্ত বাগীশ।

বিদ্যানিধির বাক্ চাতুরির ফল ফলিল। অনেকেই তত্ত্বনিধির দিকে তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া পরস্পর কাণাকাণি করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মভ্রাতারাও এই সুযোগে নাসিকা কুঞ্চিৎ করিয়া বলিলেন, আমরাও এরূপ খৃষ্টানের জল গ্রহণ করিব না।

গোল মিটিল না বরং বাধিয়া উঠিল। হাটে মাঠে সর্ব্বত্রে এই বিষয়ের আন্দোলন চলিতে লাগিল।

শঙ্কর বাবু কালের উপযুক্ত লোক হইলে এই সুযোগে দল বাঁধিয়া দলপতি হইতে পারিতেন।

কেননা সমাজের ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা বদনে বসন ঢাকা দিয়া শঙ্করকে কৃতার্থ করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি খৃষ্টান সংস্পৃষ্ট অন্নে পরের জাতি মজাইতে সাহস করিলেন না। ইহাতে আরও শত্রু বৃদ্ধি হইল। কুলীন পুত্র মাণিক চাঁদ এক জন দেশ মান্য লোক, তাঁর পদার্পণে চণ্ডাল পবিত্র হয়। গুলির আড্ডায় তাঁর পৃথক হুঁকার বন্দোবস্ত আছে। ইনিও এক দিন মৌতাতের অনাটন প্রযুক্ত শঙ্করের বাড়ী পবিত্র করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু শঙ্কর বাবু স্পর্শ মণি চিনিতে পারিলেন না, নুড়ি পাথর বলিয়া ফেলিয়া দিলেন। নতুবা গুলিখোর বলিয়া মাণিককে ঘৃণা করিবেন কেন? মাণিক সগর্ব্বে বলিল, তুমি খৃষ্টান বলিয়াই তোমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিলাম নতুবা সামান্য ব্রাহ্মণের বাড়ীতে পা ধুই না। তুমি ছোটলোক, তুমি আড্ডার মহিমা কি বুঝিবে? আড্ডায় ছোট লোকের সমাগম নাই। কুলাচার্য্য ঘটকগণ ইহার মর্ম্ম জানে। কুলীনের ছেলে খুজিবার জন্য অগ্রে এই আড্ডায় আসিয়া থাকে।

শঙ্কর বাবু ধূর্ত্ত বিদ্যানিধিকে চিনিয়াছেন কিন্তু তাড়াইতে পারেন নাই। তত্ত্বনিধির প্রতি তার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। বিদ্যানিধি, এই সরল ব্রাহ্মণকে আবার মিষ্টবাক্যে ভুলাইয়াছেন।

শঙ্কর বাবু কন্যাটীকে জামাতার হস্তে সমর্পন করিয়া কাশী যাইতে পারিলেন না। বিদ্যানিধি ঠাকুর মত ফিরাইলেন বটে, কিন্তু তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে, ইনি গঙ্গাজল হাতে লইয়া দিব্য করিলেও প্রতীতি হয় না।

পতি অনুরাগিনী কন্যাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়াও সামান্য ব্যাপার নহে। এইরূপ উভয় শঙ্কটে পড়িয়া, অনেক চিন্তা এবং পরামর্শের পর, পণ্ডিতমণ্ডলীর সভা করাই স্থির করিলেন। পণ্ডিতেরা একত্র হইলে সর্ব্ববাদী সম্মত ব্যবস্থা হইতে পারিবে। ইহাতে মহা সভার আয়োজন হইতে লাগিল, বিদ্যানিধি উপযাচক হইয়া তাহাতে যোগ দিলেন, এবং সময়ে সময়ে যোগী ঠাকুরের নিকটে হাজিরা দিতে লাগিলেন। এই যোগী পাঠকের পরিচিত। ইনি সেই কুলাঙ্গারের কন্যা দুটীর গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া এদেশে আসিয়াছেন। এখানেও পসার প্রতিপত্তি বিলক্ষণ হয়েছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

নির্দ্দিষ্ট দিনে পণ্ডিত মণ্ডলীর সভা বসিল। ক্রমে ক্রমে পাঁচ শত অধ্যাপক জড় হইলেন। এদের কোলাহলে গ্রামে কাণ পাতা ভার। লোকে বুঝিল বিচার আরম্ভ হয়েছে।

মুণ্ডিত মস্তক প্রকাণ্ড পেট ঠাকুরেরা সকলেই বক্তা, একটীও শ্রোতা নাই, এই দুঃখে সকলেই অস্থির—কাজেই ক্রমশঃ চীৎকারের মাত্রা বাড়াইলেন, তাতেও পরস্পর কেউ কম নয়। সভাতে নির্ব্বাক থাকা বড় অপমান, প্রাণ থাকিতে তাহা কেহ সহ্য করিতে পারে না। মুখে ফেনা উঠিতেছে কাছা খুলিয়া গিয়াছে, বাহ্যজ্ঞান নাই বলিলেই হয়। এক একবার পশ্চাৎদিকে চারি পাঁচ হাত পিছে হটিতেছেন, আবার ব্যাঘ্রের মত প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখে আসিতেছেন, মধ্যে মধ্যে নস্যের সামুক আছড়াইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, হয় তো সেই সময়ে একেবারে দিগম্বর মূর্ত্তি, হাতাহাতির বাকী থাকে না, তথাপি শ্রোতা হওয়া হবেনা। কখন কখন ভূদেবগণের অজ্ঞাতসারে প্রস্রাব নিঃসরণ পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। এমন, সময়ে অশীতিবর্ষ বয়স্ক জগৎগুরু ভট্টাচার্য্য ঠাকুর উপস্থিত হলেন। উপস্থিত পণ্ডিতবর্গের বার আনা এঁর শিষ্য। সকলে উঠিয়া প্রণাম করিলেন, গোল থামিল। চাষারা বলাবলি করিল, "এই বুড়া ঠাকুর বুঝি ভট্টাচার্য্য মহলের দারোগা। এখানে ঠাকুরেরা শাস্ত্রের হাট বসাইয়াছিল. এখন আর কারো মুখে কথা নাই।

জগদ্গুরু বিজ্ঞ পণ্ডিত এবং ন্যায় পরায়ণ। এঁর কথায় বিরক্তি করে এমন লোক সভাতে কেহ নাই। ইনি ব্রহ্মণ্য দেবের বিচার আরম্ভ করিলেন এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন, কলিযুগে বিচার কার্য্য ঘোর বিড়ম্বনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ব্রহ্মণ্যদেব

অনায়াসে বলিলেন, উনি ম্লেচ্ছ দেশে গিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু অখাদ্য খান নাই। যদি ওঁর কথা সত্য হয়, তাহলে এই ঘোর অনাচারের কালে কেবলমাত্র সমুদ্র গমন দোষে ওঁরে সমাজচ্যুত করা ঘোর পক্ষ-পাতের কথা। তবে ওঁর কথাগুলি মিথ্যা হইলেও হইতে পারে। এক্ষণে যদি আমাদের পূর্ব্বকালের মত ক্ষমতা থাকিতো, তাহ'লে এই দণ্ডে বেদমন্ত্রে অগ্নি প্রজ্বলিত করিতাম, অথবা তৈল কটাহ দিতাম। অবশ্যই পরীক্ষায় ধরা পড়িতেন। সংপ্রতি এরূপ ভীষণ কাল উপস্থিত যে একটি যোগীঋষিও দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে আর ব্রাহ্মণকে নষ্ট করিয়া ফল কি? কেমন হে ব্রহ্মণ্যদেব, "তুমি যে অনাচার কর নাই তদ্বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে কি।

সভাস্থ সকলেই নীরব। বিদ্যানিধি ছাত্র নহেন, কিন্তু ইনি আবার এঁর মন্ত্র শিষ্য। বেগতিক দেখিয়া ব্রহ্মণ্য দেবের উত্তর দিবার অগ্রেই ব্যগ্রভাবে বলিলেন, ঠাকুর! আপনি কি যোগীঠাকুরের কথা শুনেন নাই। ইনি ত্রিকালজ্ঞ সিদ্ধ পুরুষ।

জগদ্গুরু, হাঁ শুনিয়াছি, কিন্তু বিশ্বাস হয় না। আজি কালি ভণ্ডের ভাগই বেশী। তবে প্রত্যক্ষ দেখিলে বলিতে পারি। তিনি কোথায়?

বিদ্যানিধি বলিলেন, প্রভো! আমার প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুগ্রহ। তবে এক্ষণে এখানে আনিতে পারিবো না। দুই দিন অবধি সমা-ধিতে আছেন। তাঁর সমাধিও অদ্ভূত কাণ্ড। তিনি এই নিকটেই আছেন।

সমাধির নামে সকলেই দেখিতে ব্যগ্র হলেন। বিদ্যানিধি তাহাই চাহেন। জগৎগুরু প্রভৃতি সকলেই বিদ্যানিধির পাছে পাছে একটী বট বৃক্ষ তলে উপস্থিত হইলেন। বিদ্যানিধি স্বহস্তে কোদালী লইয়া মৃত্তিকা খনন আরম্ভ করিলেন। সকলে অনিমিষ নয়নে দেখিতেছেন দুই হাত মাটির নীচে হইতে মৃত-কল্প যোগীরাজকে তুলিলেন। অনে-কেই ভাবিল যোগী আর জীবিত নাই। কিন্তু বিদ্যানিধি কিরূপ প্রক্রিয়া করিলেন বলিতে পারি না। যোগীরাজ চক্ষু চাহিলেন, এবং কথা কহিতে লাগিলেন। দর্শক বৃন্দের মুখে কথা নাই, সকলেই আশ্চর্য্য

মানিলেন। বিদ্যানিধি এই জন্যই সকলকে এই ব্যাপার দেখাইলেন। পরে যোগীরাজকে সঙ্গে লইয়া সভামণ্ডপে আসিলেন। এবং বলিলেন, আমার প্রতি বিশেষ করুণা আছে বলিয়াই আমি এই সাহস করিলাম। নতুবা কার সাধ্য এই সমাধি ভঙ্গ করে।

দার্শনিকেরা এইগুলাকে ভেল্কি বলে, জগৎগুরু সে কথা ভুলিয়া যোগীর সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করিলেন। ইহাতে আরও মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। বিপুল জটাভার শান্ত প্রকৃতি অথচ ঢল ঢল বদনখানী দেখিয়া না ভুলেন এমন লোক নাই। সর্ব্বশেষে হতভাগ্য ব্রহ্মণ্য দেবের কথা উঠিল। এবং গুরু যেরূপ দায়ে ঠেকিয়াছেন তাহাও বলিয়া দিলেন।

যোগীবর ব্রহ্মণ্য দেবের উপর রক্ত রক্ত-কটাক্ষ কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন, ওরে দুরাত্মন! তুই আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াছিস, আবার সমাজ-মজাইবি কেন? আমি দিব্য চক্ষে তোর কার্য্য কলাপ দেখিতেছি, তোর তুষানলেও নিস্তার নাই। ব্রহ্মণ্য দেব বলিলেন, "হা ভগবান! তবে কি সত্যের আদর নাই! কলিতে যোগী ঋষিরাও মিথ্যা চাতুরির বশ। ন্যায় বিচার কি দেশ ছাড়া হয়েছে?

যোগীবর, রাগে অধীর হইয়া বলিলেন, ওরে পাপিষ্ঠ! শত শত কলি একত্র হলেও ব্রহ্মাগ্নিকে ঢাকা দিতে পারে না। যদি তোর প্রাণের আশা থাকে তবে এই দণ্ডে এ-স্থান পরিত্যাগ কর। এ খৃষ্টানী নয়। বেদোক্ত যোগ বড়ই কঠিন কথা। এই দণ্ডে তোর ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হবে। দশ দিক আঁধার দেখিবে, আর এই অপামর সাধারণ সকলেই প্রত্যক্ষ দেখিবে যে তুমি স্বমুখে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণ হারাবে। আর যদি তুমি নিরপরাধী হও তোমার কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু বাপু হে! যুবকেরা ম্লেচ্ছ সংস্পর্শে এই দেশেই নষ্ট হয়, আর তুমি সাত সমুদ্র পারে ম্লেচ্ছদের রান্নাঘরে বাস করিয়া জাতি বাঁচাইয়া আসিয়াছ একথা কি কেহ বিশ্বাস করিতে পারে।

এখনও সতর্ক হও আমার পরীক্ষা বড় কঠিন কথা। যোগ বলে অগ্নি প্রজ্বলিত হবে আর তোমার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হবে। এখনও সাবধান!

ব্রহ্মণ্য দেব গম্ভীরভাবে বলিল "আমি এইরূপ পরীক্ষাই চাই। যদি

সংসারে সত্যের মাহাত্ম্য থাকে, তাহাহইলে আমি মৃত্যুকে ডরাই না।

যোগীর কার্য্য দেখিয়া সকলেই স্তব্ধ হইয়াছে, তাঁর কথায় কে অবিশ্বাস করিবে। স্বয়ং শঙ্কর বাবু. কাঁদ কাঁদ ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁর মুখে কথা সরিল না। এদিকে অন্তঃপুরে ঘোর ক্রন্দন কোলাহল উঠিল। শঙ্কর বাবুর কন্যা লজ্জা সরমে জলাঞ্জলি দিয়া এলোথেলো পাগলিনীর মত বাহির বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কন্যার জননী কন্যার সঙ্গে সঙ্গে আছেন, কিন্তু কন্যাকে প্রবোধ দিতে পারিতেছেন না। ব্রহ্মণ্যদেব, পতিব্রতা পত্নীকে বিরলে লইয়া বুঝাইতে গেলেন। আহা! পতিপ্রাণা সতী কি সেকথা শুনিতে চায়! ব্রহ্মণ্যদেবের পা দুটী চক্ষের জলে ভিজাইয়া দিল, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল. "পরীক্ষায় কাজ নাই। আমি তোমার যন্ত্রণা দেখিতে পারিবো না, আমার কপালে পতি সেবার সুখ নাই। আমাকে এ জন্মেরমত বিদায় দাও, তারপর তুমি স্বচ্ছন্দে—আর কথা সরিল না। বোধ হয় বালিকা বলিতেছিল আবার বিবাহ করিয়া সংসার ধর্ম্ম করিও। কিন্তু কোমল জিহ্বায় কি সেই বজ্রবাণী বাহির হয়—বাক্‌বাদিনীর বীণাযন্ত্রে কি রণ বাদ্য বাজিয়া থাকে?) বালিকা মোহ বিহ্বলা হইল। গৃহিনী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। শঙ্কর বাবু তাড়াতাড়ি কন্যাকে কোলে লইয়া অন্তঃপুরে সুশ্রুষা করিতে গেলেন। ব্রহ্মণ্যদেব ভগ্ন-হৃদয়ে আবার যোগীর সম্মুখে উপস্থিত হলেন। তাঁর অটলভাব, তিনি পরীক্ষার জন্য যোগীকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কন্যাটির যাতনা দেখিলে পাষাণ গলিয়া যায়। বাস্তবিক সভাস্থ অধিকাংশ লোকের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল কিন্তু চণ্ডাল-প্রাণ বিদ্যানিধির হৃদয় বিচলিত হইবার নহে। হিন্দুয়ানী রক্ষার জন্য শত শত স্ত্রী হত্যা করিতে তিনি কুণ্ঠিত নহেন। যোগীকে বলিলেন প্রভো আর বিলম্ব কেন? পাষণ্ড নাস্তিকেরা একবার হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য দেখুক।

যোগীরাজ বলিলেন, আমি প্রস্তুত আছি। কেবল তিনটি খাঁটি ব্রাহ্মণ চাই। তাঁরা স্নান করিয়া আসুন।

বিদ্যানিধি জিজ্ঞাসা করিলেন, খাঁটি ব্রাহ্মণ কিরূপ?

যোগী। না না, সে সামান্য কথা। এই সাধারণ ব্রাহ্মণ হলেই হইবে। তবে যেগুলা অখাদ্য খায়, মদ্য পান করে, ম্লেচ্ছ সংসর্গে থাকে, সেইগুলাকে বাদ দেওয়া চাই।

বিদ্যা। কেন? তাতে কি পরীক্ষার বিঘ্ন হবে?

যোগী। পরীক্ষার বিঘ্ন! সে তো সামান্য কথ! তাদের নিজের প্রাণ নিয়ে টানাটানি। তৎক্ষণাৎ মুখে রক্ত উঠে পঞ্চত্ব পাবে।

দূর হউক এখন সে পতিত ম্লেচ্ছের কথা থাকুক এদিকে বিলম্ব হয়, তিনজনে স্নান করুন। বিদ্যানিধির মুখ শুকাইল। কথা সরিল না। তাঁর দলে অনেকগুলি মণ্ডিত-মস্তক লম্বোদর আছেন, কিন্তু কেহই ঘাড় তুলেন না। বিদ্যানিধি আবার প্রশ্ন করিলেন, প্রভো! সংসর্গ দোষে কি বিপদের আশঙ্কা আছে? যোগী বলিলেন, না—তাতে ভয় নাই, কিন্তু ঐরূপ পতিত ব্রাহ্মণের সঙ্গে আহার ব্যবহার থাকিলে চলিবে না।

এইবারে ব্রাহ্মণের দল পলাইবার পন্থা খুঁজিতে লাগিলেন। এদিকে ব্রহ্মণ্যদেব বলিলেন দেব! আমার ভাগ্যে কি কেবল বজ্রের কড়মড়ি সার! কই তো বিন্দুপাং দেখি না তবে কি আপনিও সত্যের গৌরব রাখিলেন না।

যোগী বেশী উত্তেজিত হইয়া বিদ্যানিধির দলের সার্ব্বভৌমকে বলিলেন, "তুমিই স্নান কর। সার্ব্বভৌমের গাত্রকম্প উপস্থিত নামাবলী খসিয়া পড়িল। কণ্ঠ য়নের ধমকে মাথার তুলসি উঠিয়া গেল। কপালের অর্দ্ধচন্দ্রের অর্দ্ধভাগ মুছিল। গলদঘর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গের গঙ্গা মৃত্তিকা গলিয়া গেল। কম্পিত স্বরে বলিলেন, "আমাকে ক্ষমা করুন। আমি ডাক্তারের ঔষধ খাইয়াছি, তাতে অখাদ্যের কিছুই বাকী নাই। এই সময়ে অন্য ব্রাহ্মণেরা হিন্দুয়ানীর চিহ্ন লোপ করিতে লাগিলেন পইতা কোমরে গুঁজিলেন। যোগী তথাপি বিদ্যালঙ্কারকে ধরিলেন। তিনি বলিলেন "আমার পুত্রেরা ব্রহ্মজ্ঞানী, আহারের বিচার নাই হয় তো কোন সময়ে আমাকে মজা-ইয়াছে। তর্কালঙ্কার বলিলেন দোহাই গোশাঞি! ব্রহ্মহত্যা করিবেন না। আমি পংক্তি ভোজনে ভাত খাই। পংক্তিতে এমন অনেক মহাপুরুষ থাকেন যে, উইলসনের হোটেল ভিন্ন তাদের আহার হয় না। যোগী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তবে কি ব্রহ্মণ্যদেব সীতাঠাকুরুণের বরপুত্র। নাহলে ইহারা

তো সাগরপারে যায় নাই ইহাদের মুখ পুড়িল কেন ? । হায়! সমাজে একটী ব্রাহ্মণও মিলিল না। আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত মানিক চাঁদ এখানে ছিলেন। যোগীর কর্ক্কশ ভৎসন তাঁর প্রাণে সহিল না। সন্মূখে আসিয়া বলিলেন ঠাকুর! আজ্ঞা হয়তো আমি স্নান করিতে প্রস্তুত আছি। আমি নিকোষ কুলীণ, শূদ্রের জলগ্রহণ করিনা। শুঁড়ীকে আনিয়া এইদণ্ডে এবিষয়ের প্রমাণ দিতে পারি। হোটেলের সাহেব আমার শাসনেই ব্রাহ্মণ বাবুর্জি রাখিয়াছে, নাহ'লে সেখানে একাকার হইতো। আমি সেখানে ইতর শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সঙ্গে একপংক্তিতে আহার করি না। বিদ্যানিধির পুত্র মধুভক্তকে দেখাইয়া বলিল, এইজন্য এঁর সঙ্গে হোটেলে ঘোর দলাদলি বাধিয়াছে। মানিক, সুরার প্রসাদে আনন্দ লহরিতে ভাসিতেছে, তার সকল কথা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। মধুভক্ত সগর্ব্বে বলিল, "আমাদের দলের লোকতো হোটেলের বাবুর্চি। আমার জনাই এখন পর্য্যন্ত হোটেল আছে, নাহ'লে তিন দিনে উঠিয়া যাইতো। আমার বাপ হিন্দু সমাজের কর্ত্তা, উনি আঁটাআঁটি করিলে কার সাধ্য সেখানে যায়। কেবল আমার জন্য পারেন না ব'ইতো নয়।

ঘোর বিশৃঙ্খল দেখিয়া বিদ্যানিধি, কৌশলক্রমে এই দুই জনকে স্থানান্তর করিলেন। নাহ'লে আরও অনেক গুহ্য কথা প্রকাশ হইতো।

আমাদের শঙ্কর বাবু, কন্যাকে সুস্থ করিয়া বাহিরে আসিয়াছেন। তিনি এই কপটাচার্য্যাদের কেলেঙ্কার শুনিয়া বলিলেন, "আমি সমাজে থাকিতে চাই না"। একঘরিয়া হওয়াই পরম মঙ্গলের কথা।

যোগীরাজ, সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি যোগবলে ভূত ভবিষ্যৎ, প্রত্যক্ষের ন্যায় দেখিতে পাই। আমি এই ব্রহ্মণ্য দেবের কাহিনী বিলক্ষণ জানি। ইনি সত্য সত্যই হিন্দু রাজার সঙ্গে বিলাতে গিয়াছিলেন। তুষারে ক্লেদ থাকা সম্ভব হইলেও ইহার চরিত্রে দোষ স্পর্শে নাই। বিদ্যানিধির কপটতা প্রকাশ করিয়া দিবার জন্যই আমি পরীক্ষার ভাণ করিয়াছিলাম।

আজি কালি ভারতে কাপট্য এবং ভণ্ডামীর প্রাদুর্ভাব দেখিয়া বোধ হয় কলির পূর্ণাবস্থা। ভণ্ডেরা যৎকিঞ্চিৎ স্বার্থের জন্য জগতের চক্ষে ধূলা দিতেছে। শাস্ত্রের বিপরীত অর্থ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অথচ দুরাত্মা-

দের এমনি কৌশল যে, সমস্ত দোষের ভাগ নিরীহ ভাল মানুষের ঘাড়ে চাপাইয়া দেয়। অমৃত প্রসবিনী লতার অঙ্কুর উৎপাটন করে। পাপিষ্ঠেরা বিচার করিতে চাহে না। বিচারের নাম শুনিলেই অহিন্দু বলিয়া অজ্ঞ লোকের মনে ধাঁধা লাগাইয়া দেয়। একেই তো জগতে অজ্ঞের ভাগ শতকরা নব্বই জন। বাকী দশ জন বুদ্ধিমান এবং বুদ্ধিমানের চিন্তাশক্তি আছে কিন্তু তাঁদের মধ্যে তিনজন চিন্তাশক্তির চালনা করেন কি না সন্দেহ। তাঁদের আবার চিন্তা-কুসুম অন্তরেই মিলাইয়া যায়, ফল ধরে না।

কপটী গোঁড়ারা স্বার্থের অনুরোধে কথায়২ বিধর্ম্মী রাজার দোষ দেয়। লোক দেখাইয়া হিন্দুয়ানীর জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আর কখন কি এই পূণ্যভূমে, বিধর্ম্মী রাজা ছিলনা? বৃষপর্ব্ব আদি দৈত্যবংশ কি আর্য্যধর্ম্ম মানিয়া চলিতো? তবে তারা বৃহস্পতি-পুত্র কচকে বধ করিয়া তার মাংস শুক্রাচার্য্যের ভোজনপাত্রে কি প্রকারে দিল? শুক্রঠাকুর দৈত্যের রন্ধন খাইয়াছিলেন বলিয়াই তো কচকে উদরস্থ করিলেন। সেই কচ কি সামান্য ব্যক্তি? অমর-গুরু বৃহস্পতির পুত্র, কিন্তু তিনি সকলের সম্মতিতে দৈত্য দেশে থাকিয়া বিদ্যা শিক্ষা করেন। ইহা মহাভারতের লিখন। কিন্তু কচের কি জাতি গিয়াছিল? সে দিন বৌদ্ধ-বিপ্লবে ভারতে একাকার হয়। পুরীতে আজি পর্য্যন্ত তার নমুনা দেখা যায়। প্রাচীন ঋষিরা এই সমস্ত গুরুতর ব্যাপার সামঞ্জস্য করিয়া দেশ রক্ষা করিলেন, আর আজি কি না জনকতক গোঁড়া জুটিয়া সমুদ্র গমন দোষে ব্রাহ্মণকে পতিত করিতে চায়। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি ব্রহ্মণ্যদেবের অন্য দোষ নাই। পরম নিষ্ঠাবান্ হিন্দু রাজার সঙ্গে বিলাতে গিয়াছিল মাত্র। হায়! এ-কি সামান্য আক্ষেপ! বেচারা হিন্দুর জাহাজে হবিষ্যান্নে প্রাণধারণ করিয়াছে, এই অপরাধে উইলসন হোটেলের ম্লেচ্ছের উচ্ছিষ্ট—গো-অস্থি চর্ব্বণ-কারীর দল তাহাকে সমাজ-চ্যুত করিতে চায়? হা—ধর্ম্ম! তুমি কোথায়! দেবরাজ ইন্দ্রের ভাণ্ডারে কি আর দধিচির অস্থি নাই! না—তিলক নামাবলির জলুষে তাঁর চক্ষেও ধাঁধা লাগিয়াছে!

ভণ্ডেরা আবার জগতকে ভুলাইবার জন্য কলির ঘাড়ে দোষ চাপায়। কিন্তু কলির প্রভাব না থাকিলে কি এরূপ ছল চাতুরী এত অধর্ম্ম পরিপাক পাইতো? ইহাতে না হয় জগত ভুলিল, কিন্তু চিত্রগুপ্ত ভুলিবে না, সে, তার খাতার পাতায় পাতায়, এই জুয়াচুরী লিখিয়া রাখিতেছে। পরকালে চাতুরী খাটিবে না। গোঁড়াদের প্রস্তর হৃদয়ে তুষারস্তূপ ঢাকা থাকিলেও রক্ষা নাই। যমরাজের এক চক্ষু সূর্য্য, অন্যটী অগ্নি। তুষার বাষ্প হইয়া উড়িবে, আর পাথর পুড়িয়া ছাই ভস্ম হ'বে আর রেণু রেণু হইয়া নরকে পড়িবে।

ইহারা কি সংসারের সামান্য ক্ষতি করিতেছে? যাহারা বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলাতে যায়, তারা এক একটী অমূল্য রত্ন. ইহারাই আশা ভরসার স্থল কিন্তু আজি ভারত-মাতা আপনার ধনে আপনি বঞ্চিত। ঐ সকল অমূল্য রত্ন বাহিরে ফেলিয়া উইঢিপি কোলে লইয়া বসিয়া আছেন। উইঢিপির কি সামান্য বিক্রম ঘরে যে সকল রত্ন আছে. সেগুলিকেও মাটি চাপা দিয়া রাখিতেছে।

সচরাচর দেখা যায়, গণ্ডমূর্খ কুষ্মাণ্ডগুলা ঘরে বসিয়া, গাঁজা গুলি খায়, আর মাতা পিতার অস্থি দগ্ধ করে। ইহাদের কনিষ্ঠ সহোদরেরা কৃতি কুশল হইলেই হিংসায় জ্বলিয়া মরে। ঘরে তিষ্ঠিতে দেয় না। আবার-উহারাও "স্থান ত্যাগেন দুর্জ্জন" বলিয়া সরিয়া পড়ে। আমাদের সমাজ সংসারেও ঠিক সেই অবস্থা ঘটিয়াছে।

ইহারা আপনার পায়ে আপনি কুড়ালি মারিতেছে। জানিয়া শুনিয়া ঘরের ধন বাহিরে ফেলিতেছে। বাস্তবিক উহারা ঘরে স্থান পায় না বলিয়াই তো পরের মাকে মা বলে, পরের বেশ ভূষায় সংসাজে। নতুবা উহারা কি এতই অবোধ, যে, এই সামান্য কথা বুঝেনা যে, রাজহংসের দলে মিশিতে গেলে কোকিলের কত দুরবস্থা হয়।

গোঁড়াদের কুহকেই সর্ব্বনাশ হইল, নতুবা সরলভাবে ইহার সহস্র উপায় করা যায়। সমুদ্র গমনের দোষ মার্জ্জনা করিলে ম্লেচ্ছদেশেও হিন্দুয়ান রক্ষার ব্যবস্থা হয়। বালকগণের মনে যদি সমাজে ফিরিবার আশা থাকে তাহ'লে তারাও সাবধানে চলিতে শিক্ষা করে। গোঁড়াদের মধ্যে বোধ হয়

বাব আনা লোক জানে না যে, যবন পূর্ণ কাবুল দেশেও সহস্র সহস্র হিন্দু আছে। সেদিন আরও প্রকাশ হইয়াছে যে, নিবীড় ম্লেচ্ছ দেশে চন্দন তুলসীধারী আর্য্য সন্তানেরা বহুকালাবধি বাস করিয়া বেদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছে। তবে কি না তাহারা গোপনে গোপনে উইলসনের হোটেলে যাইতে জানে না এই অপরাধেতাহারা হিন্দু নামের অধিকারী হইতে পারে কি না সন্দেহ।

প্রসঙ্গ ক্রমে বহুদূরে আসিয়াছি। ভণ্ড গোঁড়াদের অত্যাচারে নানা কথা বলিতে হইল। নতুবা ব্রহ্মণ্যদেবের সম্বন্ধে ইহার কোন কথাই খাটে না। ব্রহ্মণ্যদেব সমাজে প্রবেশ করিলে বরং উহার হিন্দুয়ানীর হানি হওয়া সম্ভব। বর্ত্তমানকালে সমাজচ্যুত হওয়াই সৌভাগ্য।

জগৎগুরু এতক্ষণ নীরব ছিলেন, এক্ষণে বলিলেন আমিও ইচ্ছাপূর্ব্বক সমাজচ্যুত হইলাম। হিন্দুর ধর্ম্ম-সমাজে ঘোর সংক্রামক রোগ উপস্থিত। জাতিতে থাকিলে রোগে ধরিবার সম্ভাবনা; আমি নাম কাটাইয়া ব্রহ্মণ্য-দেবের দলে মিশিলাম।

তত্বনিধি প্রমুখ বহুতর ব্রাহ্মণ জগৎগুরুর অনুগমন করিলেন। যাঁদের ধাতুতে রোগের লক্ষণ প্রকাশ হইয়াছে তাঁরাই বাদ পড়িলেন। বিদ্যানিধি ঠাকুর ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগকে লইয়া প্রবল দল বাঁধিলেন। কিন্তু শঙ্কর বাবুর দলের নাম হইল খৃষ্টানের দল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

শীতকাল নবদ্বীপের নীচে ভাগিরথীর বড় শোভা। উপরে মাঠের উপরে ম্যাজিষ্ট্রর সাহেবের তাম্বু পড়িয়াছে, তিনি মপস্বলে আসিয়াছেন। একটী ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব চুরী যায়। ব্রাহ্মণ পুলিষে সংবাদ দিয়াছিল। পুলিষ চোর ধরিতে পারে নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণকেই ধরিয়া অনিয়াছে। তাহারা বলে

ব্রাহ্মণের নালিশ মিথ্যা। ব্রাহ্মণের গৃহে যা ছিল চোরে লইয়াছে। বাহিরে যাহা কিছু ছিল পুলিষের পেটে গিয়াছে, এক্ষণে আর কিছুই নাই। একটী দয়ালু বারিষ্টার বিনা বেতনে আজি ব্রাহ্মণকে পুলিষের গ্রাশ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। সেই বারিষ্টার সাহেব একাকী অপরাহ্নে গঙ্গার ধারে বেড়াইতেছেন ও গ্রাম হইতে অনেক দূরে আসিয়াছেন। এমন সময়ে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত তত্ত্ববোধ আসিয়া বলিল, কেমন সাহেব! চিনিতে পারেন কি?

সাহেব। এ কি তত্ত্ববোধ! তোমার বাঘছাল, এবং জটা ভস্ম কোথায়? গুরুদেবের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছো নাকি!

তত্ত্ববোধ। পাগলামী ভাল লাগেনা। তাতে কোন সুখ নাই, এবারে আমি তোমাদের পথে চলিবো।

সাহেব। ছি ছি! তত্ত্ববোধ! তুমি পরম নিধি হাতে পাইয়া ফেলিয়া দিয়াছ। গুরুদেব কোথায়?

তত্ত্ববোধ। আপনি এ ললিত বাঙ্গালা ভাষা কোথায় শিখিলেন।

সাহেব। ইহাও সেই গুরুদেবের কৃপায়। কিন্তু বালক কালে এই সুরেই যন্ত্র সাধা ছিল। বিলাতে যাইয়া সাহেব হইবার জন্য তিন পাক চড়াইয়া দিয়াছিলাম। গুরুদেব, আমার হৃদয়-তন্ত্রীর তিনটি গ্রন্থি খুলিয়া দিয়াছেন।

কথোপকথনের সময় এরা দাঁড়াইলেন না, ক্রমেই দূরে যাইতেছেন। এমন সময়ে দুইটী স্ত্রীলোক অপর দিক হইতে আসিল। তত্ত্ববোধ, সাহেবের কথায় কাণ্ না দিয়া একদৃষ্টে উহাদিগকে দেখিল, উহারাও সাধ্যানুসারে মুখ লুকাইয়া সরিয়া পড়িল। ইহাতে তত্ত্ববোধের প্রতি সাহেবের বড়ই ঘৃণা হইল। মুখে কিছু না বলিয়া হেঁট মুখে দাঁড়াইলেন, এবং ফিরিয়া আসিবার উপক্রম করিলেন। তত্ত্ববোধ, আরও একটু অগ্রে যাইতে অনুরোধ করিলেন। সাহেব, বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন "ওদিকে যাইয়া তোমার কোন লাভ নাই। স্ত্রীলোক দুইটী এদিকে গিয়াছে, তুমি উহাদের পশ্চাতে যাও। হা ভগবন! মহাদেবের ষাঁড় আজি গো-মূত্রের লোভে গাভীর পশ্চাতে ছুটিতেছে। তত্ত্ববোধ, বলিল "সাহেব ক্ষান্ত হও, আর বিদ্যা প্রকাশে

কাজ নাই। পশু না হয় তাঁর নিজের স্বভাব ত্যাগ করিতে পারে নাই, কিন্তু তুমি মানুষ হইয়া পশু হইলে কেন? "দুইটী স্ত্রীলোক কোথায় দেখিলে? উহাদের একটী যে. সাড়ে চারি হাত লম্বা, নাসিকার নিম্নভাগে নিবিড় গোঁফ স্ত্রীলোকের কি ঐরূপ সতেজ চঞ্চল ভাব হয়। আর ঐ দেখ নল খাগড়া বনের নিকটে গঙ্গাতে একখানি ক্ষুদ্র তরণী ভাসিতেছে। এখানে জন মানবের সমাগম নাই। আধ ক্রোশ দূরে লোকের বাস। যাত্রীর নৌকা এমত স্থলে কখনই আসে না। আমার মনে বড় সন্দেহ হয়েছে। নাহলে সাধে কি ঐ দিকে যাইতে বলিতেছি। শ্বেতাম্বর বলিল "তবে কি এখানা চোর ডাকাইতের নৌকা? তাহ'লে পুলিষে খবর দেওয়া উচিত"। তত্ত্ববোধ বলিলেন, তা'হলে অফ্রিকার ঐ ব্রাহ্মণের মত জেলে যাইবে কে? কিন্তু এরা ডাকাইত নয়, ডাকাইত দিনমানে দেখা দেয় না। আর তাহ'লে আমিই বা এত ব্যগ্র হবো কেন? তাদের অতি ক্ষুদ্র অপরাধ, তারা পেটের জ্বালায় চুরী করে। সে হিসাবে সংসারে বারো আনা লোক ডাকাইত। সাহেব সিহুরিয়া বলিলেন, "তবে কি নর-হত্যা! তত্ত্ববোধ উত্তর দিল "না না তাও নয়, মৃত্যুতো সকলেরই আছে, তবে দু-দিন অগ্র পশ্চাৎ। সাহেব বলিল, তবে হারিলাম, আইনে তো এর চেয়ে বেশী অপরাধ নাই। তত্ত্ববোধ বলিল, সাহেব! যাতে লোকের পরকাল নষ্ট হয় তাই বেশী অপরাধ। জন্ম জন্মান্তরে তার ভোগ ভুগিতে হয়। এখানে সেই আশঙ্কা আছে। অতি অল্পক্ষণেই টের পাবেন, আর সাহায্য করিতে প্রবৃত্তি না হয় চলিয়া আসিবেন। সংপ্রতি আমার সঙ্গে আসুন। তত্ত্ববোধ নৌকার দিকে চলিল. সাহেবও পাছে পাছে আছেন। প্রায় বিশ হাত বাকী থাকিতে দেখিলেন, একটী স্ত্রীলোক নৌকা হইতে মুখ বাড়াইয়া কাতর-কণ্ঠে চীৎকার আরম্ভ করিল "মা মা! তুমি কোথায় গেলে! শীঘ্র এসো! ও-গো হরির মা! তুই কোথায়! নৌকার ভিতরে আর একটা কর্কশ-কণ্ঠ কি কথা কহিতেছে, ভাল বুঝা গেল না।

আরো নিকটে গিয়া সাহেব হ্যাট কোট খুলিলেন, এবং বনমধ্যে উভয়ে লুকাইলেন এবারে কর্কশ কণ্ঠ বুঝিতে পারা গেল।

"ভগ্নি! আমরা ব্রাহ্মণের মত চণ্ডাল নহি; আমরা ব্রাহ্ম, ধর্ম্মই আমাদের প্রাণ, আমরা বিভূর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করেছি। তিনি তোমাকে আমার হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। আমি প্রাণ থাকিতে, তোমার অমঙ্গল হইতে দিব না। তুমি কুপথে গেলে, আমি তাঁর নিকটে মুখ দেখাইতে পারিবো না। আমরা সকল সহ্য করিতে পারি, কিন্তু বিভূর গুপ্ত অভিপ্রায় সাধনে বাধা দিলে, রাগে উন্মত্ত হই। তোমার কি ধর্ম্মপথে মন যাবে না? পরকালের কি ভয় নাই? বিভূ কি এইরূপ যৌবন নষ্ট করিবার জন্য তোমাকে দিয়াছেন?

নারীকণ্ঠের উত্তর। বাবা! ক্ষান্ত হও আর যাতনা দিওনা—আমি সত্য বলিতেছি, জগদীশ্বরের দোহাই দিয়া বলিতেছি আমি মানব কন্যা।

পুরুষ। আমি কি তা জানি না? না তোমার সুখ্যাতির কথা শুনি নাই। তাতেই তো আরও দুঃখ হয়। তোমার কিছু ভয় নাই, মনের কথা খুলিয়া বল, আমি ভ্রম সংশোধন করিয়া দিতেছি। বল-প্রকাশ আমাদের ধর্ম্ম নয়।

নারী। তবে প্রেত পিশাচের শাস্ত্র আমার কাণে ঢালেন কেন? আপনি পিশাচ মন্ত্রে দীক্ষিত বলিয়া কি আপনার হৃদয়ে দয়া ধর্ম্ম নাই।

পুরুষ। কি! পিশাচ—মন্ত্র! ব্রাহ্ম ধর্ম্মের তুল্য কি আর ধর্ম্ম আছে? তুমি কি এ ধর্ম্মের মাহাত্ম্য শুন নাই। তবে তোমার মামা এত-কাল কি উপদেশ দিয়াছেন? এখনো হিন্দুয়ানীরদিকে এত টান! ধন্য কুহক!

নারি। আমি যদি ঘুণাক্ষরে জানিতাম ইহাতে সতীত্ব ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে হয়, তাহ'লে ব্রহ্মপদের লোভ দেখাইলেও বাড়ীর বাহির হইতাম না। আমি বালিকা, তোমাদের ছল চাতুরী বুঝি নাই। আমি কুল-কন্যা, স্বামী আমার ইষ্টদেবতা, স্বামী অনুরাগ আমার ধর্ম্ম, আর স্বামীর চরণ-সেবাই সার কর্ম্ম। মামা নিরাকার ব্রহ্মের উপদেশ দিতেন, তাতে আমার প্রাণ তুষ্ট করিত না, আমি সেই স্বামীকে ব্রহ্মের আকার ভাবিতাম, লজ্জায় প্রকাশ করি নাই। আচ্ছা, বাবা! তুমি সত্য বল! আমাদের

পুরাতন পরমেশ্বর কি আর নাই ? তিনি কি তোমাদের জ্বালায় জগৎ ছাড়িয়া দিয়াছেন ?

পুরুষ। ইহাকেই বলে স্ত্রীলোকের বুদ্ধি ! তিনি অনাদি, অনন্ত, অক্ষয়, অব্যয়, তিনি আবার কোথায় যাবেন ?

নারী। তবে কি তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে ? বৃদ্ধকালে উন্মাদ হয়েছেন ?

পুরুষ। কি ! ব্রাহ্মের সম্মুখে বিভুর নিন্দা ! তুমি উন্মাদের কি লক্ষণ দেখিলে ?

নারী। উন্মাদ নাহ'লে তাঁর মঙ্গলময়ী বিধিব্যবস্থা নষ্ট করিলেন কেন ? আহা ! পরস্ত্রীকে মাতৃজ্ঞান, পরপুরুষে পিতৃ বুদ্ধি ইত্যাদি পবিত্র ভাব কোথায় গেল ? আর মানুষকে যদি শিয়াল কুকুর করাই তাঁর সাধ হয়ে থাকে, তবে আবার বোধ-শক্তি দিলেন কেন ?

পুরুষ। এতেই বলে অল্প বুদ্ধির নানা দোষ। মনে যদি ধর্ম্ম-বল থাকে, তবে বিভুর কৃপায় পর-পুরুষকে আপনার স্বামী করিতে কতক্ষণ লাগে ! আমার সেই বল আছে বলিয়াই তো আমি তোমাকে ধর্ম্ম-পত্নী করিয়াছি। তোমার স্বামী থাকিলে এরূপ ঘটিত না।

বালিকা। অতি কাতরে "ওরে পিশাচ ! এই কি তোর ধর্ম্ম জ্ঞান ! আমি যে বিবাহিতা. আমার স্বামী বর্ত্তমান আছেন।

পুরুষ। সে, বিবাহও নয়, আর সে স্বামীও নয়। যে জন্মাবধি মুখ দেখিল না, কোথায় আছে তার ঠিকানা নাই, সে আবার কিসের স্বামী ? সে বিলাতে গিয়া মরিয়াছে।

বালিকা। তোমার পায়ে পড়ি তুমি তাঁর নিন্দা করিও না। আমি পৃথিবীতে তাঁরে দেখিতে না পাই, তাতে কিছু ক্ষতি নাই। তাঁহার চরণ দুইখানি ভাবিতে ভাবিতে মরিতে পারিলে. তাঁহারে অবশ্যই পাইব।

পুরুষ। বুঝিলাম তুমি ভাল কথার কেউ নয়। আমি তোমাকে ধর্ম্ম-পত্নী করিয়া কুকর্ম্ম করিয়াছি। তুমি আমাকে লইয়া নরকে ডুবিবার চেষ্টায় আছ। কিন্তু তা পারিবে না। আমি কোন্ প্রাণে সহ-ধর্ম্মিনীর

দুর্দ্দশা দেখিবো। হে করুণাময় বিভু! আর আমার অপরাধ নাই? আমাকে বল প্রকাশ করিতে হইল—

এই সময় ঘোর চীৎকার হইতে লাগিল, "তুমি আমার বাপ, না হয় আমাকে কেটে ফেল, আমার সতীত্ব নষ্ট করিও না দোহাই জগদীশ্বর! ইত্যাদি কত কথাই শুনিতে পাওয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে সাহেব প্রস্তুত ছিলেন, এতক্ষণ বালিকার উদ্ধার হইতো, কিন্তু তত্ত্ববোধ তাঁর কাণে কাণে বলিয়াছিল, শেষ না দেখিয়া কোন কাজ করা ভাল নয়। আবার সাহেবের মনেছিল যে, অসভ্য বঙ্গ মহিলার সতীত্বের দৌড় কতদূর হইবে? কেনই বা এত পরিশ্রম স্বীকার করিবো। কিন্তু আর থাকিতে পারিলেন না। বালিকা সবেগে গিয়া ছত্‌রির বাহিরে আসিয়া "মধুসূদন! আমার ধর্ম্ম রক্ষা কর" বলিতে বলিতে গভীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। কাপুরুষ পশ্চাতে আসিয়াছিল কিন্তু জলে পড়িতে সাহস করিল না। এদিকে সাহেব প্রচণ্ড বেগে এক লাফে গঙ্গায় পড়িয়া ডুব দিলেন। তত্ত্ববোধ তাড়াতাড়ি নৌকায় উঠিয়া পাষণ্ড ব্রাহ্মকে ধরিলেন। ইংরাজি তিন মিনিটের পর দেখা গেল, সাহেব মৃত-কল্প বালিকাকে হস্তে লইয়া ভাসিয়া উঠিলেন। নৌকায় তুলিতে আর বড় কষ্ট হইল না। পাষণ্ড ব্রাহ্ম, অগ্রে ভয়ে কাঁপিতেছিল, এক্ষনে বালিকার শরীরে প্রাণ নাই বুঝিয়া কপট কান্না যুড়িল এবং বিনা প্রশ্নে পরিচয় দিল, "বালিকাটী আমার ব্রাহ্মণী ছিল, উহার মাতুল আবার আমার সহোদরাকে বিবাহ করিয়াছিল তারাও সঙ্গে আসিয়াছে, সংপ্রতি গ্রামের মধ্যে দেব দর্শনে গিয়াছে, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে। আমি মৃত দেহ স্বগ্রামের ঘাটে লইয়া যাইয়া সংকার করিবো। প্রায় সন্ধ্যা হইল আর আমি আপনাদিগকে থাকিতে বলিতে পারি না। এ স্থানটী বড়ই সঙ্কটময়। আপনি সাহেব হইয়া আমার মৃত পত্নীকে স্পর্শ করিলেন, একথা প্রকাশ হইলে আমার জাতি কুল যাইবে। আপনি শীঘ্র সরিয়া যাউন।

এঁরা পাপিষ্ঠের কথায় কাণ না দিয়া বালিকার পবিত্র-দেহ মস্তকে তুলিলেন। দুই তিন পাক ঘুরিবামাত্র তার নাক মুখ দিয়া জল বাহির হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ শুশ্রূষা করিয়া দেখিলেন, বালিকার মৃদু নিশ্বাস বহিতেছে। ক্রমে চৈতন্য হইল, কিন্তু এখনও চক্ষু মুদিত ছিল ও অধরোষ্ঠ নড়িতেছিল। মুখের নিকটে কাণ দিতে শুনিতে পাওয়া গেল বালিকা "মধুসূদন রক্ষাকর বলিতেছে। তত্ত্ববোধ, "আর ভয় নাই বলিয়া যেমন তার গায়ে হাত দিলেন, অমনি সে কাতরে বলিয়া উঠিল, "আমার ধর্ম্ম নষ্ট করো না, আমাকে মরিতে দেও।

সাহেবের চক্ষে জল আসিল, দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, হা তত্ত্ববোধ! বোধ হয় আমার কপালেও এইরূপ ঘটিয়াছে। আমার সতী-লক্ষ্মী বালিকা-পত্নীও এইরূপে কোন পাষণ্ডের হাতে প্রাণ দিয়াছে। হায়! আমি রেশম-কীট, তুঁত পাতার তিক্ত রসে মজিয়া আপনার লালে আপনি বদ্ধ হয়েছি। কুসুমের সৌরভ-মাহাত্ম্য আমি বুঝিবো কিসে? আমি আজি জানিলাম তোমার কথাই যথার্থ। আজি বুঝিলাম যে, বিলাতী রাঙ্গাফুল, এবং ক্ষুদ্র জুঁইফুলে কত প্রভেদ। হা বিধাতা! তুমি পবিত্র প্রণয় সুধাকে চক্ষুর অগোচর করিয়াই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ। লবণ-জলধির তলদেশ যে পিয়ূষ-পূর্ণ, তা কি আমার মত মূর্খ বুঝিতে পারে? আমি আজি বুঝিলাম যে, স্বর্গীয় দেব-বালারা সুধাভরা হৃদয় ঢাকিবার জন্য এই ভারতের অন্তঃপুরে লুকাইয়া থাকে। কিন্তু আর বুঝিয়া ফল নাই। আর এই পাপভরা অসার দেহভারে জন্মভূমিকে প্রপীড়িতা করিতে সাহস হয় না। কেবল একবার গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বুঝিয়া লইবো, পরকালে নরাধম পাপিষ্ঠেরা যে নরকেই যাউক না কেন, পবিত্রা পতিব্রতার সঙ্গে এক মূহূর্ত্তের জন্য সাক্ষাৎ হইতে পারে কি না? তত্ত্ববোধ! আমি বহুদিন পুর্ব্বে সেই সতীলক্ষ্মীর হস্তলিপি পাইয়াছিলাম, কিন্তু অসভ্য বালা বলিয়া ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিয়াছি। সাহেব অধোবদনে, নয়ন মুদিত করিয়া অশ্রু বরিষণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বালিকা একবার চক্ষু উন্মিলিত করিয়া সাহেবের মুখখানি দেখিতে লাগিলেন। ইহজনমে তিনি পর পুরুষের দিকে চাহিয়া দেখেন না, কিন্তু প্রাণ দাতা সাহেবের সম্বন্ধে সেই পবিত্র নিয়ম রক্ষা করিতে পারিলেন না। বালিকা অনিমিষে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিল। তাহার পরেই

উঠিয়া বসিল, এবং সেই পাপিষ্ঠকে সম্মুখে দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তত্ত্ববোধের মুখ পানে চাহিল। বালিকার স্বন্দর মুখ-মণ্ডলে প্রকৃতী দেবী রক্তাক্ষরে যেন লিখিয়া দিলেন "বাবা রক্ষাকর!" তত্ত্বেোধ তাহা বুঝিয়া বলিলেন, মা! কিছু শঙ্কা নাই আমি সমস্তই দেখিয়াছি এবং সকল কথাই শুনিয়াছি। অতি শীঘ্র পাপিষ্ঠকে সমুচিত প্রতিফল দিব, এই কথা বলিতে বলিতে বালার নিকটে আসিলেন। এদিকে সাহেব এখন পর্য্যন্ত শূন্যে দৃষ্টি করিয়া একমনে কি ভাবিতেছেন, এই অবসরে পাপিষ্ঠ নৌকা হইতে দীর্ঘ লম্ফ দিয়া বেগে ছুটিল। তত্ত্ব-বোধ কিছুদূর পর্য্যন্ত পশ্চাতে গেলেন, আবার কি ভাবিয়া ফিরিলেন এবং সাহেবের কাপড় টুপি আদি নৌকায় আনিলেন। তারপর বালি-কাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! আর কোন শঙ্কা নাই, আমি তোমার সন্তান। এক্ষণে সন্ধ্যা হইল, বলুন কোথায় লইয়া গেলে আপনার স্নুবিধা হইবে। বালিকা বলিল, বাবা! যেপথে স্নুবিধা ছিল, আমি সেই পথেই যাইতেছিলাম, কিন্তু আপনারাই বাধা দিলেন। আমার ত্রিজগতে স্থান নাই। পাপিষ্ঠ যদু, আমার মামা বিধুর সঙ্গে যোগ করিয়া আমাকে গৃহের বাহিরে আনিয়াছে, আর কোন মুখে ফিরিয়া যাইবো। এখন আপনাদের যে স্থানে অভিরুচি হয় সেই স্থানে লইয়া চলুন।

তত্ত্ববোধ বলিল মা! পরিচয় দিতে হবেনা, আমি ঐ কপট-ব্রাহ্ম-দুটীকে ভালরূপে জানি। যেদিন যে প্রকারে আপনাকে ভুলাইয়াছে তাও জানি। তুমি সাধ্বী পতিব্রতা বলিয়াই দেবতারা তোমাকে রক্ষা করিলেন। বালিকা গদ্‌গদ্ স্বরে বলিল. "তোমরাই সেই দেবতা। তত্ত্ববোধ উত্তর দিল, মা! আমরা কীটানুকীট, তবে গুরুদেবের আদেশে আপনার সেবা করিয়া কৃতার্থ হলেম। তত্ত্ববোধ, সাহেবের গা ঠেলিয়া বলিল "এখানে কি সমাধি সাধনে বসিয়াছো. শীঘ্র উঠিয়া হাইল ধর, সন্ধ্যা হইয়াছে। সাহেবের চমক ভাঙ্গিল, এবং উত্তর দিলেন, হাইল ধরিতে জানি না, দাঁড় টানিবো। তত্ত্ববোধ, ত্বরায় নৌকা ফিরাইয়া চলি-লেন। অল্পক্ষণ পরে একটী বাঁধা ঘাটে নৌকা লাগিল। তিন জনেই

উপরে উঠিয়া দেখিলেন, চারিদিকে মাঠ ধূ ধূ করিতেছে কেবল সম্মুখে একটী রমণীয় উদ্যানের মধ্যে একখানি পুরী আছে। সাহেবকে বাহিরে রাখিয়া তত্ত্ববোধ সেই বালিকাকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। দ্বার-বানেরা কিছুই আপত্তি করিল না। অন্তঃপুরে তুলসী-মণ্ডপের নিম্ন-দেশে, পরিণত বয়স্কা একটী বিধবা একাগ্রমনে হরিসাধন করিতেছেন। পরিচারিনীরা চৌদিকে বসিয়া আছে। তত্ত্ববোধ নিকটে যাইয়া বলিল মা! আবার একটী অনাথিনী বালিকা আপনার নিকটে উপস্থিত। গুরুদেবের আজ্ঞায় ইহাকে আশ্রয় দিউন এবং স্বয়ং ইহার পরিচয় লউন। বালিকা মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছে। পাপিষ্ঠদের আক্রমণে এই বালিকা গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছিল। বিধবার নয়ন দুটী অশ্রু জলে ডুবিল। অবগুণ্ঠনবতী বালাকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিতেছেন এমন সময়ে বাহির বাড়ীতে মহা কলরব "না সাহেব! দোহাই সাহেব! হিঁদুকা অন্দর মেয়ে ছেলে হ্যায়, জাত যাতা হ্যায়—আবার খোট্টা কণ্ঠধ্বনি. "আরে ভেইয়া মেজষ্টর সাহেব আয়া, ভাগো ভাগো, জান মারেগা, জেলে দেগা ইত্যাদি ইত্যাদি—

গৃহিনী ঐ দিকে কাণ পাতিয়া আছেন, এমন সময়ে সত্য সত্যই হ্যাট-কোট-ধারী-মূর্ত্তি সম্মুখে উপস্থিত। কেবল ঐ বালিকা ভিন্ন পুরবাসিনীরা সকলেই গৃহিনীকে ফেলিয়া পলাইল। সাহেব 'মা! মা! মা কোথায়? মা আমাকে কি চিনিতে পারিবেন না, আমি এই পাপ-পোষাখ ফেলিয়া দিলাম। এখন একবার চাহিয়া দেখুন, আমি আপনার সেই অকৃতজ্ঞ অবাধ্য সন্তান কি না?

গৃহিনী কি আর পলাইতে পারেন, গোলাপ জল মদের পিপাতে রাখিলেই কি সৌরভ নষ্ট হয়? তিনি কণ্ঠস্বরেই ভুলিয়াছেন। তথাপি "প্রদীপ প্রদীপ বলিয়া ডাক ছাড়িতেছেন। কেহ উত্তর দিল না কিন্তু বালিকা, গৃহ হইতে একটী আলোক আনিল। গৃহিনী সাহেবকে ভাল-রূপে দেখিয়া "বাবা খাঁদু! এতদিন পরে কি মা বলিয়া মনে হইল। বাবা! তুমিতো কখনই এমন নিষ্ঠুর ছিলে না। না না, বাছা! তুমি আমার কাছে না থাকিয়া ভালই করেছো। আমি রাক্ষসী, আমার

কপাল বড় মন্দ, আমি আমার জল বালাকে হারাইয়াছি. সোণার প্রতিমা জলে বিসর্জ্জন দিয়াছি। আমি দুঃখভোগের জন্য সংসারে আসিয়াছি। আমার সুখ দেখিলেই বিধাতার চক্ষু পুড়ে। তুমি পরের হইয়া প্রাণে বাঁচিয়া থাক। কিন্তু বাবা! ননীর পুতলি বউটীর কি দুর্দ্দশা করিলে? আহা! .তার যেমনরূপ, তেমনি গুণ—বাছাকে একবার আনিয়া ছিলাম, তার করুণা পুর্ণ বাক্য শুনিলে বুক ফাটিয়া যায়।

সাহেব কাতর স্বরে বলিলেন মা! ক্ষান্ত হও! আর যাতনা দিওনা, আমি ব্যারিষ্টার হয়েছি, অগাধ টাকাও করেছি, বিপুল মান সম্ভ্রম, কিন্তু ঐ জন্য আমার অন্তঃকরণ দগ্ধ হচ্ছে। পরকালের ভয়ে আকুল হয়েছি। সে যদি অসতী হইত, আমি পরমসুখে থাকিতাম। এখন আর উপায় নাই। আমার মৃত্যুর পর সে যদি বিধবা হইয়া বিবাহ করে, তাহ'লে আমি সমস্ত বিষয় তার নামে উইল করিয়া এই দণ্ডে প্রাণত্যাগ করিতে রাজি আছি। তাহলে পরকালে আমার যাতনার লাঘব হবে। সে, সতী-লক্ষ্মী, আমি চণ্ডাল; সে পবিত্র ব্রাহ্মণ কন্যা, আমি নরকের কীট; কিন্তু তথাপি সে আমাতে অনুরক্তা, আমি তার করুণাপূর্ণ পত্র পাইয়াছি আমার সঙ্গেই আছে, কিন্তু মা! প্রেত পিশাচ আজি কোন সাহসে কমলার মণি-মন্দির অপবিত্র করিবে! তাহাতেই বলিতেছি যে, আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

বাৎসল্য স্নেহের অপার মহিমা! বধূর দুঃখ চিন্তা ঘুরিয়া গেল। গৃহিনী সুর ফিরাইয়া বলিলেন, না—বাছা! এখন তার কপাল পুড়িয়াছে সে একটা ব্রহ্মজ্ঞানীর সঙ্গে বাহির হইয়া গিয়াছে। তার আর জাতিকুল কিছুই নাই। তার জন্য এমন অকল্যাণের কথা মুখে আনিও না। বালাই! তুমি একশত বৎসর বাঁচিয়া থাক।

গৃহিনীর কথা সমাপ্ত হইল না, খাঁদু সাহেব "আঁ—তবে সত্য সত্যই সেই সাধ্বী পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মের হাতে পড়িয়া প্রাণ দিয়াছে? তত্ত্ববোধ আমাকে অনর্থক প্রবোধ দিয়াছে, মা! তোমার খাঁদুকে জন্মের মত বিদায় দেও, আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিলাম না।

এই কথা বলিতে বলিতে সাহেব উঠানে পড়িয়া লুটাইতে লাগিলেন। গৃহিনী ভাবিলেন সত্য সত্যই তাঁর খাঁদু ইচ্ছা মৃত্যু পুরুষের মত প্রাণ-

ত্যাগ করিতেছে। "তবে কি আমি খাঁদুকেও হারালেম। আমাকে মা বলে বলিয়াই কি বিধাতা কেড়ে নিলেন। এইরূপে গৃহিনী হাহাকার করিতেছেন, এমন সময়ে সেই অবগুণ্ঠণবতী বালা, "আমি সঙ্গে যাবো এখানে থাকিব না" এই কথা বলিতে বলিতে দ্রুতবেগে আসিয়া সাহেবের পাদমূলে আছাড় খাইয়া পড়িল। বালিকার মুখে আর কোন কথা শুনিতে পাওয়া গেল না, শরীরে স্পন্দন রহিল না। সাহেব উঠিয়া বসিলেন, সেই সময়ে সকলে স্থিরভাবে দেখিলেন বালিকার মাথায় দারুণ আঘাত লাগিয়াছে, রক্তের স্রোত বহিতেছে, কিন্তু বালিকা সাহেবের পাদুখানি দুই হাতে ধরিয়া আপনার বক্ষে সংলগ্ন করিয়াছে। এমন মূর্চ্ছা অবস্থাতেও হাত দুটী শিথিল হয় নাই। অথচ বদনের আবরণ সরিয়া গিয়াছে তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই।

গৃহিনী দীপের আলোকে মুখখানি দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাছা! খাঁদু! ঐ দেখ তোমার সতী লক্ষ্মী তোমার পায়ে প্রাণ ঢালিয়া স্বর্গে চলিয়া গেল। তোমার কুবুদ্ধিতেই এই দুর্ঘটনা হইল। বউমাকে যদি তুমি, সঙ্গেই আনিয়াছিলে, তবে আমার নিকটে গোপন করিলে কেন?

খাঁদুর কি কথা কহিবার শক্তি আছে যে, একথার উত্তর দিবে! চক্ষে জল নাই, কণ্ঠে কাতর ধ্বনি নাই বলিয়াই গৃহিনী ভাবিয়াছেন, খাঁদু সুস্থ শরীরে শান্তি সুখে আছে। কিন্তু হায়! মরুভূমে আবার বাষ্প কোথায়? সেখানে উত্তাপে শীর্ণ হয় এমন পদার্থই বা কি আছে? খাঁদুর কি বাহ্যলক্ষণ আছে? খাঁদু জগৎশূন্য দেখিতেছে, নিজেও শূন্যে মিশিয়াছে। সে যেন আর জগতের জীব নয়।

তত্ত্ববোধ ইহা বুঝিয়াছিল, এবং গৃহিনীকে বলিল, মা! পুণ্যবতি! খাঁদু তো বধুকে কখন দেখে নাই,—কিপ্রকারে পরিচয় জানিবে! গুরুদেব আমাকে এই বালিকার উদ্ধার করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন কিন্তু তথাপি উহার পরিচয় বলেন নাই। তাঁর লীলা দেবতার অগোচর। যাহাহউক, আমি ঔষধি দিয়া উহার প্রাণ রক্ষা করিতেছি। আপনি এই দুই জনকে আপনার আশ্রয়ে রাখুন। সপ্তাহ পরে গুরুদেব দর্শন দিবেন এবং ইহাদের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা করিবেন। আমি এক্ষণে বিদায় হইব।

তত্ত্ববোধের ঔষধির চমৎকার গুণ, বালিকার চৈতন্য হইল, পরিচারিকারা উহাকে গৃহমধ্যে লইয়া শুশ্রুষা করিতে লাগিল। সাহেব, গুরুদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না, বিশুদ্ধ বাঙ্গালী সাজিয়া নিকটস্থ স্থানে বাস করিয়া রহিলেন।

তত্ত্ববোধ বিদায় হইবার সময় গৃহিনী বলিলেন, আমি গুরুদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি না, কিন্তু এদেশে আসিয়া আমার বড় যাতনা হয়েছে। আমি তীর্থ এবং তপোবনে পরম সুখে ছিলাম, জলবালার জ্বালা অনেক কমিয়াছিল। আমি খাঁদুকেও সন্তানের মত স্নেহ করি, জলবালাও আমার গর্ব্ভে জন্মে নাই, কিন্তু তথাপি আমার কপালে কেমন বিড়ম্বনা যে, খাঁদুকে হারাইয়া অক্লেশে ভুলিয়া ছিলাম, কিন্তু সেই অভাগিনীর মুখখানি একদণ্ড ভুলিতে পারি না। আমি প্রতি রাত্রে স্বপ্নে দেখি যে, তার সেই শীর্ণ মুখখানি যেন আমার বুকের মধ্যে লুকাইবার জন্য ব্যাকুল হচ্ছে, আমি মাথার দিব্য দিলেও কিছু খায় না। আহা বাছা আমার একাদশীর উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে পারনা করিতে পার নাই, মুখে জল দেয় নাই, মনের খেদে প্রাণ দিয়াছে, আঃ আর বলিতে পারি না। খাঁদু চিরজীবী হউক, উহাকে সর্ব্বস্ব দিয়া যাবো, কিন্তু যে দেশে গেলে জলবালাকে ভুলিতে পারি আমি সেই দেশে যাইবো, এদেশে থাকিবো না। খাঁদুকে পাইয়া কোথায় অন্তরের জ্বালা জুড়াইবো —না—দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। গুরুদেব কি এই জন্য আমাকে এদেশে আনিলেন; আমি তাঁর চরণে শত শত অপরাধিনী, তাই কি এত শাস্তি দিতেছেন। তাঁর আজ্ঞায় আমি মহাপ্রভুর মহোৎসবের উদ্যোগ করিয়াছি। এই মহোৎসবের পরেই যেন তিনি আমাকে নিষ্কৃতি করেন, তাঁর চরণে আমার এই ভিক্ষা।

তত্ত্ববোধ গৃহিনীকে আশ্বাস দিয়া বিদায় হলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দু জগতে দেব-দেবী-হীন স্থান নাই। বঙ্গদেশে ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে ভগবান্ শূলপাণীর প্রসিদ্ধ মঠ। বিপুল ভূ-সম্পত্তিতে যথেষ্ট অর্থাগম হয়, এখন আবার সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পসার প্রতিপত্তি বাড়িয়াছে। অসভ্যতার আঁধারে মণি-চুনি গড়াগড়ি যাইতো, এখন একখানা কাচের ছটায় চক্ষু ঝলসিয়া যায়। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, সভ্যতার আগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

বাপা শূলপাণীর বিচিত্র উচ্চ মন্দির, বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে সুন্দর নাট-মন্দির, ভক্ত মণ্ডলীতে পরিপূর্ণ হয়েছে। স্নান যাত্রায় জগন্নাথ দেবের অদৃষ্টে এত লোক জড় হয় না। ভক্তদলের গভীর ভজন কোলাহলে চেৎলা হাটের ঘাড় হেঁট হয়েছে। অসভ্য আমলের গাল-বাদ্য, করতাল, বম্ বম্ রব উঠিয়া গিয়াছে, এখন সুমধুর তান মানের সঙ্গে বীণা বংশি যোগে নৃত্য গীত চলিতেছে। আজি শিব-চতুর্দ্দশীর ব্রত। উদার, উন্নতভাব, সভ্যতার প্রধান অঙ্গ, তাহাই প্রত্যক্ষ দেখাইবার জন্যই যেন ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা আপনাদের গেরুয়া বসন দিয়া বার বিলাসিনী দলকে সন্ন্যাসিনী সাজাইয়াছেন। তাহারা অঙ্গের অলঙ্কার খুলিয়াছে, রুদ্রাক্ষের মালা পরিয়াছে, ভস্মের বদলে গঙ্গা মৃত্তিকা মাখিয়াছে, কবরি খসাইয়া এলো চুলে ধুলা লাগাইয়াছে। ঘট ভরা গঙ্গা জলে সিদ্ধি গুলিয়াছে এবং ভক্তিভরে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছে "উপবাসে মদিরা পান চলে কি না"? সঙ্গী ঠাকুরেরা অনেক তর্ক বিতর্কের পর পাঁজি খুলিয়া দেখিলেন, পাঁজীতে "মদ্য পান নিষেধ" লিখিত নাই। বিশেষতঃ এই পর্ব্ব উপলক্ষে এখানে একদিনের জন্য দুইখানা অতিরিক্ত মদের দোকান খুলিবার পাস হইয়াছে। শাস্ত্রে না থাকিলে সাহেবেরা এরূপ করিবেন

কেন? সন্দেহ দূর হইল, পাপ মিটিয়া গেল। এদিকে পর্ব্বের ধূম লাগিয়াছে, দলে দলে কুলবতীরা, দেব দর্শনে চলিয়াছে। গ্রহ-বিপ্র,—ভট্ট আজি সকলেই ব্রাহ্মণ সাজিয়া, বাম হাতে ফুল বিল্ব-পত্র লইয়া যুবতী-গণের সম্মুখে উপস্থিত; পথ ছাড়িয়া দেয় না, পাশ কাটাইতে গেলে অঞ্চল ধরিয়া টানে, কপালে সিন্দুর লাগাইয়া দেয়। একেই তো ব্রাহ্মণকে কিছু বলিতে নাই তাতে আবার ঘন ঘন মা—মা সম্বোধনে কাণ যুড়াইয়া দেয়, একটী পয়সা না দিলে কি আর নিস্তার আছে?

নাট-মন্দিরে ব্রাহ্মণেরা চণ্ডীপাঠ যুড়িয়াছেন, এঁরা প্রায় সকলেই বেতন-ভূক। যজমান নিকটে থাকিলেই মুখে ফেনা উঠে, নতুবা পরস্পর গল্প যুড়িয়াছেন কাহারও গত রাত্রের ভোজনের দরুণ দগ্ধ-উদ্গার উঠিতেছে, চক্ষু ঢুলু ঢুলু করিতেছে—কেহ বলিতেছে আজি আহার না করিয়া আসিয়াছি, শীঘ্র যাইবো।

একদিকে কথক ঠাকুর রামায়ণ আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রোতৃদলে অধিকাংশই স্ত্রীলোক, ইহাদের হৃদয়ে স্ত্রী স্বাধীনতা রসের ঢেউ খেলিতেছে। কথকের মুখে পতিব্রতার উপাখ্যান শুনিয়া মুখ বাঁকাইল। সীতার অরণ্য-যাত্রা ভাল লাগিল না। ব্রাহ্মণ নাচার হইয়া পুরাণ ছাড়িল, অবশেষে যাত্রা এবং কীর্ত্তনের গান ধরিয়া অন্ন-সমস্থান করিতে লাগিল।

পুরীর বাহিরে কাঁশা পিত্তলের দেবতারা নানা মূর্ত্তিতে ভিক্ষা করিতেছেন। উদাসীন সেবকগণ মুদিত নয়নে ধ্যানে বসিয়াছেন, যেন এদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। ইহারা ভস্ম কৌপীনেই সন্তুষ্ট।

জনকতক দোকানদার এবং কতকগুলি বেশ্যা বাপার নিকট-প্রতিবেশী। বাপার কৃপায় সকলেই সুখে আছে। দোকানদারের দোকানে দুই টাকার সামগ্রী রাখিলে প্রত্যহ পাঁচ টাকা লাভ হয়, অথচ সামগ্রী বাহিরে যায় না। যাঁরা ডালা বিক্রয়ের প্রণালী জানেন, তাঁরা সহজেই বুঝিবেন।

বেশ্যার প্রতি বাপার বেশী করুণা। পুরুষভক্ত ইহাদের চরণ দর্শন না করিয়া বাপারপুরে প্রায় প্রবেশ করে না। বাপার প্রসাদ যোগাইবার

যোগ্যতা নাই; ইহারা ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ দিয়া বাপার মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া থাকে।

এখানে কেহই অসন্তুষ্ট হয় না, কিন্তু আমাদের তত্ত্ববোধের কেমন অদৃষ্ট ইনি এখানে সারাদিন ঘুরিয়া মহা বিরক্ত হলেন। পুরীর উত্তর দিকে বিরল স্থানে বসিয়া ভাবিতেছেন "গুরুদেবের মুখে শুনিয়াছিলাম এখানে দুই একজন সিদ্ধ পুরুষ আছেন, কিন্তু কই! এখানকার আচার ব্যাভার দেখিলে তো হরিভক্তি উড়িয়া যায়। কবর স্থানেও ব্রহ্ম দৈত্য থাকিবে কেন? নিশাচর-পুর্ণ-লঙ্কা দ্বীপে, ঋষি তপস্বীর সম্ভাবনা কোথায়? তত্ত্ববোধ এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে গায়ে জল পড়িল, উর্দ্ধে চাহিয়া দেখেন এই অকালে মেঘের সঞ্চার হয়েছে, বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। দেবপুরে আশ্রয় লইতে প্রবৃত্তি হইল না, নিকটে পুরাতন ভগ্ন-মন্দির ছিল তাহাতে প্রবেশ করিলেন। ভিতরে তিন চারিটী শৃগাল এবং কয়েকটা মর্কট বানর ছিল, তত্ত্ববোধকে দেখিয়া তাহারা ছুটিয়া পলাইল। পেচক এবং কলা বাদুড়গুলা ঝটপট করিতে লাগিল। তত্ত্ববোধ বুঝিলেন, এখানে মনুষ্য প্রবেশ করে না, রাত্রি কাটাইবার উপযুক্ত স্থান বটে। তিনি বাঘছাল বিছাইয়া বসিয়া পড়িলেন। তত্ত্ব-বোধ, দক্ষিণার কথা ভুলেন নাই, তার জন্য গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা নিতান্ত প্রয়োজন, কিন্তু তিনি কখনই খুজিয়া দেখা করেন নাই। মহাপুরুষের এমনি প্রভাব যে, তত্ত্ববোধের প্রয়োজন হইলেই আপনি আসিয়া দর্শন দেন। তত্ত্ববোধ মিছা কাজে ঘুরিতেছেন, দৈবাৎ মনের মত স্থানটা পাইলেন, এই অবসরে একটু নিজের কাজ করিয়া লইবেন ইহাই মনে মনে স্থির করিলেন। কিন্তু হঠাৎ মনুষ্যের পদ-শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিলেন, মন্দিরটী নির্জ্জন স্থান নহে। একটী অদ্ভুত মানব-মূর্ত্তি বাহির হইয়া যাইতেছে। সর্ব্বাঙ্গে গেরুয়া বসন আচ্ছাদিত এবং ভস্ম ভূষণ জটাভার দেখিলে পুরুষ বলিতে হয়, কিন্তু গোঁফ দাড়ি নাই। ভস্মের ভিতর হইতে ঢলঢলে মুখের লাবণ্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে। কবির কলম হইলে এই স্থলে লিখিতে হয় যে, মদনের দেহ ভস্ম হয়েছে, কিন্তু শর-কার্ম্মুক দগ্ধ হয় নাই, এখানে ছাই ঢাকা আছে।

নতুবা মানবের ভ্রূ এবং কটাক্ষ এতদূর সুশ্রী হওয়ার কথা নয়। আরও বোধ হয়, মদনের জীবাত্মা যেন ইহাতেই আশ্রয় লইয়াছে। এদিকে আবার পায়ে খড়ম হাতে ত্রিশূল আছে। এক প্রকার অসাধারণ জ্যোতিও ছিল। কিন্তু শূলপানীর বাড়ীর কাণ্ড দেখিয়া তত্ত্ববোধের মনে ঘৃণা হয়েছে, তিনি ভাবিলেন, এটাও ঐ ভণ্ডতপস্বীদের একজন। তিনি বিদ্রূপ ভঙ্গিতে বলিলেন, "কেন প্রভু, স্থান পরিত্যাগ করিতেছেন কেন? এখানে কি সাধনে বাধা ঘটিল, না স্থানের দোষ আছে?"

সন্ন্যাসী বিদ্রূপ বুঝিলেন, এবং মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিলেন "স্থানের দোষ নয়"।

তত্ত্ববোধ। তবে কি শূলপাণির বাড়ীর মত হট্টগোল, এবং পয়সার ঝন্ ঝন্ শব্দ না হলে যোগে মন লাগে না! নতুবা আর তো কোন কারণ দেখা যায় না!

সন্ন্যাসী। কু-সংশর্গ! লোকে কথায় বলে সঙ্গদোষে গ্রাম নষ্ট।

তত্ত্ববোধ। শূলপাণির পুরীতে শত শত পশু-ভাবাপন্ন মানব জড় হয়, তাই কি সুসঙ্গ! তবে কিনা তারা নির্ব্বোধ, চাতুরি ধরিতে পারে না, এই একটা মহৎ সুবিধা।

সন্ন্যাসী। মানবাকারে পশুর ভাগ পনেরো আনা, ইহাদের যদি সকলের বুদ্ধি থাকিতো, তাহলে ব্রহ্মার সৃষ্টি কয় দিন থাকে। সংসারের কয়টা সাপের পাখা আছে। পশু প্রকৃতির সঙ্গে মনুষ্য বুদ্ধির যোগ বড় ভয়ানক।

তত্ত্ববোধ। নিতান্ত অসঙ্গত কথা। বুদ্ধি না থাকিলেই তো পশু বলে। বুদ্ধিমান আবার কোন্ কালে পশুর আচরণ করিয়া থাকে।

সন্ন্যাসী। তবে যে মনুষ্য প্রণয়ের পবিত্র ভাব ভুলিয়া, প্রথমা পত্নীর সাক্ষাতে বৃষভের মত দ্বিতীয় বালার পাণি গ্রহণ করে, সেই ইন্দ্রিয়-দাস পাষণ্ড কি পশু নয়?

তত্ত্ববোধ। অবশ্য পশু; ইহাই প্রকৃত পশুর লক্ষণ, কিন্তু এমন জানোয়ারের কি বোধ-শক্তি থাকা সম্ভব?

সন্ন্যাসী। বোধ শক্তি না থাকিলে দ্বিতীয় পত্নীর অশ্রদ্ধা সহ্য করিতে পারিল না কেন? প্রাণের জ্বালায় অস্থির হয়ে দেশান্তরে প্রাণ দিতে যায় কেন? পশুর আবার মান অপমান কি?

সন্ন্যাসীর কথায় তত্ত্ববোধের হৃদয় কাঁপিল কিন্তু তর্কের অনুরোধে মুখে বলিলেন "অবোধেই আত্মহত্যা করে। ইহাও পশুর কাজ"। সন্ন্যাসী বলিল, কিন্তু কোন্ পশু কোন্ কালে চক্ষু মুদিয়া শূন্যে উঠে, বালিকা ভুলায় এবং চুরী ডাকাতির দায়ে জেলে যায়। তত্ত্ববোধ গম্ভীর বদনে উত্তর দিল, "মানব-স্বভাব পরিবর্ত্তন-শীল, সাধু-সঙ্গ হইলেই সর্ব্ব দোষ কাটিয়া যায়। সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিল "হা ভগবন! জটা ভস্মধারী প্রবীণ যোগীরাজ যখন স্বয়ং স্ত্রীহত্যা করিতে কুণ্ঠিত হন্ নাই, তখন আবার "সাধু-সঙ্গ হইলে পশুত্ব খণ্ডন হয়" একথা কে, বিশ্বাস করিবে? যোগীরাজ অস্ত্রাঘাতে স্ত্রী বধ করেন নাই বটে, কিন্তু বালিকার কর্ণে মিথ্যা-চাতুরিপূর্ণ তীব্র বিষ ঢালিয়া দিয়াছেন। বালিকা জ্বালায় অস্থির হইয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়াছে।

তত্ত্ববোধ সন্ন্যাসীর মুখ দেখিতে পান নাই। সন্ন্যাসী নীরবে প্রস্থান করিলেন। তত্ত্ববোধ সঙ্গ ছাড়িলেন না পাছে পাছে চলিলেন। কেন যাইতেছেন কোথায় যাইতেছেন একথা জিজ্ঞাসা করিলে তত্ত্ববোধ নিজে ইহার উত্তর দিতে পারিতেন না। পূর্ব্বে বাপার পুরীর প্রাচীরের কথা বলিয়াছি, এক্ষণে দেখা গেল জনপদ বেষ্টিত আর একটী উচ্চ প্রাচীর আছে। প্রাচীর পারে গভীর অথচ পরিসর খাল। বাহিরে যাইতে তিন দিকে তিনটী দ্বার আছে। পূর্ব্বদিকে ভাগীরথী, সে দিকে প্রাচীর কিম্বা দ্বার নাই। এঁরা দুজনে উত্তরের দ্বার দিয়া বাহির হলেন। এদিকে কেবল সাধু সন্ন্যাসীর গমন অধিকার আছে। বাহিরে প্রায় আধ ক্রোশ পর্য্যন্ত নিবীড় বন, ইহার মধ্যে একটী মাত্র সঙ্কীর্ণ রাস্তা। সন্ন্যাসী এবং তত্ত্ববোধের মধ্যে পঞ্চাশ হাত ব্যবধান ছিল। এই সময়ে তত্ত্ববোধ পূর্ব্বদিকে পুরুষ কণ্ঠধ্বনিতে এই কথাগুলি শুনিলেন। "রিপু দমন করিবার জন্যই বনবাসে আসিতে হয়, বৈরি বলবান থাকিলে সংসারে ঘোর বিড়ম্বনা"।

তত্ত্ববোধ চাহিয়া দেখেন বাঁধা ঘাটের চাতালের উপরে তাঁর সেই চির-পরিচিত জীবন ধন আর চারি পাঁচজনকে সঙ্গে লইয়া একাগ্রমনে পরামর্শ করিতেছেন।

তত্ত্ববোধের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তত্ত্ববোধ সুচতুর এবং বুদ্ধিমান না হলে বলিতাম, "গোধন-কসাইকে দূরে দেখিলে যেরূপ আতঙ্কে কাঁপিতে থাকে, তত্ত্ববোধ সেইরূপে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইলেন। মনে হইল পাপিষ্ঠ আবার এখানে কি ষড়যন্ত্র করিতেছে। দক্ষিণা দাসীকে কি আবার বিপদে ফেলিবে। আঃ দুরাত্মা কি আমাকে অল্প দুঃখ দিয়াছে। উহার সঙ্গীরাও ভাল লোক নয়। আমি এখানে আসিয়া ভাল করি নাই। কই, সে ছদ্ম-বেশী সন্ন্যাসীই বা কোথায় গেল। বোধ হয় সেটাও এই পাপিষ্ঠের অনুচর। যদি উহার কৌশল জালে বাঁধা পড়িয়া থাকি, তবে পলাইবার চেষ্টা করা বৃথা।

"রিপু দমন বৈরি বলবান" আদি কথা গুলি শুনিয়া তার মনের সন্দেহ আবার দৃঢ় হইল। বিজন গহনে শরণ লইবার স্থান নাই; কিন্তু পাপিষ্ঠের নিকটে থাকা ভাল নয়, এই ভাবিয়া মধুসূদনের নাম জপ করিতে করিতে দূরে গেলেন। এখান হইতে উত্তর দিকে ধূম দেখিতে পাইয়া ভাবিলেন, ওখানে অবশ্যই মানুষ আছে। অনুমান মিথ্যা নয়, সেই দিকে যাইয়া একটী প্রাচীর বেষ্টিত ক্ষুদ্র পুরী দেখিলেন। কিন্তু পুরীর প্রবেশ দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ করা হইয়াছে। তত্ত্ববোধ দুই তিন বার "দ্বারে অতিথি উপস্থিত বলিয়া চীৎকার করিলেন। কেহই দ্বার খুলিল না। কিন্তু যে কণ্ঠের কুহুকে তিনি ভগ্ন মন্দির হইতে এখানে আসিয়াছেন, পুরমধ্যে সেই কণ্ঠধ্বনি আবার শুনি-লেন, "দিদি ইনিই সেই কপট সন্ন্যাসী ঠাকুর"। এইবারে ফাঁদে পড়িয়া-ছেন। উনি আমাদের এঁর হাতে ধূর্ত্তপনা করিয়া কয়দিন বাঁচিবেন। তিনি এঁরে ধূর্ত্ত চূড়ামণি বলেন। আমি স্বকর্ণে তাঁর প্রতিজ্ঞা শুনিয়াছি। তিনি এই কপট সন্ন্যাসীর এবং দক্ষিণা দাসীর কার্য্য শেষ না করিয়া আর এই বনবাস হইতে বাহির হইবেন না।

তত্ত্ববোধ কাণ পাতিয়া শুনিতেছিলেন একটী কোকিল-কণ্ঠী এই কথায় ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে কি তিনি প্রতিকূল, তাহলে যে, এদের নিষ্কৃতি নাই"?

তত্ত্ববোধ আবার ইহার উত্তর শুনিলেন—

"প্রতিকূল কি অনুকূল কিরূপে বুঝিবো"। তাঁর মনের কথা কে জানে। এই যে তিনি তোমাকে এত ভাল বাসেন, সাপের মাথার মণির মত তোমাকে এই বিজন বনে রাখিয়াছেন. তুমি কি তাঁর মনের কথা পাও? ধূর্ত্ত-রাজ যখন ইহার ভিতরে আসিয়াছেন, তখন কখনই তাঁর হাত এড়াইতে পারিবেন না। এইবারে আর কিছুই ছাপা থাকিবে না।

সাপের মাথার মণি বলাতে কোকিলকণ্ঠী বিরক্ত হইয়া উহার সঙ্গে কথান্তর করিতে লাগিল। তত্ত্ববোধ সেই স্থান ত্যাগ করিয়া বিরলে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই পাপিনীকে আমি চিনিয়াছি। পাপিনী কুলাঙ্গারের ঔরষজাতা কন্যা বটে, অথবা জনকের চেয়ে শত গুণে নিষ্ঠূর। কুলটা আবার প্রাণ নাশেও সহায়তা করিতেছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়দাস মনুষ্য পশুর অধম, না হলে জীবন ধন কোন্ সাহসে এই রাক্ষসীকে বিশ্বাস করিয়াছে। অথবা স্বজাতি বলিয়া উভয়ে সম্প্রীত হয়েছে, নর-প্রেত প্রেতিনীকে পাইয়াছে! জীবন-ধনকে স্বচক্ষে দেখিলাম, তার কু-পরামর্শ শুনিলাম। ইহারা আদানন্দে হারিয়া আমাদের প্রাণ বধের চেষ্টা করিয়াছে। হাঃ গুরুদেব; আপনি এখন কোথায়; আপনি অপকারের প্রতিশোধ লইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন। আজি আমি দুর্দ্দান্ত বৈরীর করাল গ্রাসে পড়িয়াছি। নির্জ্জনে শ্রীহরির চরণ সাধন, তপস্যা সিদ্ধ আদি মনের সাধ আমার মনেই রহিল। আমি পশু কলেবর হারাইয়া আবার পশু জন্ম গ্রহণ করিতে চলিলাম। এজন্মে কিছুই হইল না। কিন্তু এই দস্যু-দল কালি আবার দক্ষিণার প্রাণ সংহার করিবে। আহা! তিনি আপনার পরামর্শে এদেশে আসিয়া নিরাশ্রয় স্থানে মাঠের মধ্যে নিশ্চিন্ত আছেন। একটা বাঙ্গালীর সাহেব বেশ দেখিয়া যে সকল কাপুরুষ ছুটিয়া পলায়, তারা কি তাঁরে রক্ষা করিবে! বিশেষতঃ এ-দস্যুর দলবলও বড় সামান্য নয়। ইহারা হত্যা এবং ডাকাইতি করিবার মানসেই এই বিজন বনে গুপ্তভাবে আছে। একটা বাজ পক্ষীকে মারিলে শত শত কপোত কপোতীর প্রাণ রক্ষা হয়, ইহাতেও কি ন্যায় পরায়ণ নারায়ণ আমাকে নরকে পাঠাইবেন! শাস্ত্রে আততায়ীক বধ করিবার বিধি আছে।

এ পাপিষ্ঠের মত আততায়ী জগতে নাই। পরকালে যা হয় তাই হউক, আমি কাপুরুষের মত প্রাণ দিবো না।

আঃ বিধাতার কি কৌশল! তিনি আজি উদাসীন সন্ন্যাসীর হস্তে কুঠার দিলেন। পরম বৈষ্ণব আজি বিষ্ণু প্রীতি কামনায় পশু বলিদান করিতে চলিল।

তত্ত্ববোধ কুঠার পাইলেন না বটে, কিন্তু একটী বৃহৎ অথচ গুরুভার কাষ্ঠ দণ্ড লইয়া বাহির হইলেন।

সন্ধ্যা হয় হয় এই সময়ে উগ্রমূর্ত্তিতে জীবন ধনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন পাপিষ্ঠ, "আমি তোর রক্ষিতা কুলটার মুখে সকল কথাই শুনেছি, তোর ষড়যন্ত্র ভেদ হয়েছে, তোর সঙ্গীরা আমার অঙ্গ স্পর্শ করিবার অগ্রেই আমি তোর মস্তক চূর্ণ করিব। তত্ত্ববোধ গুপ্ত আঘাত জানে না, তুই শীঘ্র আত্ম রক্ষা কর্।

উপস্থিত ব্যক্তিরা সকলেই অবাক্ হইল। জীবন, সত্বরে উঠিয়া বলিল, ঠাকুর! আমি তোমার চরণে শত শত অপরাধ করিয়াছি। আমার মস্তক চূর্ণ করিলে যদি আমার পাপের লাঘব হয় তবে এই মস্তক পাতিয়া দিলাম। আমি আর অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে পারি না, শীঘ্র নিষ্কৃতি করুন। আমার অসহ্য হয়েছে। জীবন পদানত হইল।

তত্ত্ববোধ। ওরে পাপিষ্ঠ এখনও তোর এত চাতুরী, তোর আবার অনুতাপ কোথায়? কুলটা গরবিনী তোর কণ্ঠে গাথা আছে। তোর পক্ষে নরককুণ্ড চন্দন তুল্য।

সঙ্গীরা নীরব ছিল, এই বারে একজন মধ্য বয়স্ক পুরুষ বলিল, ঠাকুর! এই পবিত্র পুণ্যধামে স্ত্রী-সঙ্গ কোথায়? কুলাঙ্কক-কন্যা গরবিনী, পরমা-সাধ্বী, সে দক্ষিণা দাসীর মত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারিণী। সেই পতিব্রতা বালা বা এখানে আসিবে কেন? সে যেখানে থাকে তাই মহাতীর্থ, তার আবার দেব স্থানে প্রয়োজন কি?

তত্ত্ববোধ। আ মরি মরি! গরবিনী যেমন পতিব্রতা, এটাও তেমনি পুণ্যধাম। তবে আর প্রেতপুরী কোথায়? পেচকেরাই তামসী অমা-নিশীকে দিবস বলে। কোন্ পিশাচ এস্থানটীকে পবিত্র করিয়াছেন।

এই কথায় সকলের চক্ষু রক্ত বর্ণ হইল। জীবন বলিল, ঠাকুর! নিজের অপরাধের শাস্তি লইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু গুরু নিন্দা সহ্য হয় না।

তত্ত্ববোধ উত্তর দিল, "পেচকের গুরু তো রাত্রি-চর বাদুড় দেব।"

এবারে সকলেই মহা বিরক্ত হইল। সঙ্গীরা তত্ত্ববোধকে পাগল স্থির করিয়া বলপূর্ব্বক লাঠি কাড়িয়া লইল। তত্ত্ববোধ হুড়াহুড়ি করিতে ছাড়িল না এবং রাগে অধীর হইয়া উহাদের গুরুদেবকে লক্ষ্য করিয়া অনেক কটু কাটব্য বলিল। উহারা সকলে মিলিয়া তত্ত্ববোধকে বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখিল।

ইহারাও দুর্ব্বাক্য বলিতে ছাড়িল না। কেহ তাঁরে চামুণ্ডা দেবীর নিকটে বলি দিতে চায়, কেহ গঙ্গার স্রোতে ভাসাইতে যায়। তত্ত্ববোধ ভাবিল আসন্নকাল উপস্থিত।

সুতরাং গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া মুদিত চক্ষে সমাধিতে মনোনিবেশ করিলেন। ইহারা সমাধির লক্ষণ জানিত না। মানুষটা মরিয়া গেল ভাবিত ভয়ে আকুল হইল। জীবনের পূর্ব্ব-বুদ্ধি থাকিলে তত্ত্ববোধের গলায় দড়ি দিয়া বৃক্ষ শাখায় ঝুলাইয়া রাখিত, এক্ষণে তাহা না করিয়া ভয়ে পলাইয়া গেল।

সমাধির আশ্চর্য্য মহিমা। তত্ত্ববোধ, বাহ্য জগতে বিদায় লইয়া, অন্তরাজ্যে গুরুদেবের দর্শন পাইলেন, এ অবস্থায় রাগ, দ্বেষ, হিংসা, শঙ্কা, কিছুই নাই, অন্তরাত্মা পূর্ণানন্দ ভোগ করিতেছিল, কিন্তু গুরুদেবের অনুরোধে চক্ষু মিলিতে হইল। দেখিলেন আমাদের সেই ব্রহ্মচারী ঠাকুর সম্মুখে উপস্থিত। অন্তরের ধন বাহিরে আসিয়াছেন। ইহা তাঁর ভাল লাগিবে কেন? পা দুটী ধরিয়া বলিল, গুরুদেব, আর যাতনা সহ্য হয় না—আমি সাধ্য মতে আপনার আজ্ঞা পালন করিয়াছি, আর কোন কার্য্যই বাকী নাই। এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমি পর্ব্বত গুহায় বসিয়া দীর্ঘ সমাধির অনুষ্ঠান করি। পাপিষ্ঠ জীবন এই স্থানেই আছে, দক্ষিণার প্রতি তার জাত ক্রোধ এখনও যায় নাই, কিন্তু দক্ষিণাকে তপোবনে যাইতে দিলেই সকল বিষয় নির্ব্বিঘ্ন হবে। আর পাপিষ্ঠ জীবন ধন প্রভৃতি স্বভাবতঃ নরককীট উহাদিগকে নরক হইতে উদ্ধার করিতে গেলে উহাদের মঙ্গল নাই, এ অধ্যবসায় ত্যাগ

করুন। মহাপুরুষ হাসিয়া বলিলেন, "তবে কি জলবালাকেও ঐ সঙ্গে জলে বিসর্জ্জন দিতে চাও? আহা! সেই নিরপরাধ বালার প্রতি কি তোমার দয়া হয় না!

তত্ত্ববোধ বলিল, "প্রভু! আর সেই পাপিনীর নাম করিবেন না। "নারী চরিত্র" "দেবের অগোচর" এই কথাই প্রকৃত। জলবালা গরবিনী অপেক্ষাও পাপিষ্ঠা।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, এ কথায় তো বিশ্বাস হয় না। অবোধেরাই ইন্দ্র ধনুতে নানা বর্ণ দেখে, কিন্তু বিজ্ঞজনের চক্ষে ইহা বিমল জলবিন্দু বই আর কিছুই নয়। তুমি অবশ্যই ধূর্ত্তের চাতুরিতে ভুলিয়াছো।

তত্ত্ববোধ বলিল, দেব! আপনার চক্ষে সকল পদার্থই নির্ম্মল! কিন্তু সূর্য্যদেব স্বচক্ষে অন্ধকার দেখিতে পান না বলিয়া কি জগতে অন্ধকার নাই? আমি ঐ পাপিনীর অন্বেষণে স্বয়ং পিয়ারা কাননে গিয়াছিলাম।

পাপিনী ভুলু ঠাকুরের বাড়ীতে নাই। ভুলুর কন্যা বিধুমুখীকে সঙ্গে লইয়া ব্যাভিচার নরকে ডুব দিয়াছে, গ্রামের ভদ্র লোকদের মুখে সঠিক সংবাদ শুনিয়াছি। হতভাগিনীরা ভেক লইয়া বৈষ্ণবী হইয়াছে এবং দেশে দেশে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে।

আমি দক্ষিণাকে এ সকল কথা শুনাই নাই। কেবল শ্বেতাম্বরের বধূকে ব্রাহ্ম পাষণ্ডের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া দক্ষিণার হাতে দিয়া আসিয়াছি। ব্রাহ্ম দুইটার যেমন নাম তেম্নি কাজ, একটা বৃষেন্দু আর একটা ষণ্ডেন্দু ইহাতেই বিষু, বিধু এবং ষণ্ডূ বলিয়া লোকে সম্বোধন করে।

কিছু দিন পরে কাটোয়ার বাজারে আসিয়া স্বচক্ষে দেখিলাম, পাপিষ্ঠা জলবালা, একটা নেড়া বাবাজির পাছে পাছে ভিক্ষায় যাইতেছে। পাপিনী নেড়ার অনুরূপ নেড়ী সাজিয়াছে, নেড়ী লজ্জায় পড়িয়া নেড়ার লম্বা দাড়ির আড়ালে মুখ ঢাকিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু আমি দুইটী পয়সার লোভ দেখাইয়া নেড়ার গান শুনিলাম, এবং প্রসঙ্গ ক্রমে নিগূঢ় তত্ত্ব জানিয়া লইলাম। এই তো গেল আপনার জলবালার সংবাদ, তার পর গরবিনীর দশা আপনি স্বচক্ষে দেখিতে পারেন। সে এই গুপ্ত কাননেই জীবনের সঙ্গে আছে। এক্ষণে আর আমার পাপ-সংসর্গ ভাল লাগে না। কৃপা

করিয়া সেই পরা-বিদ্যা মহামন্ত্র দিয়া আমারে কৃতার্থ করুন। আমি নির্জ্জন বনে যাইয়া হরির শ্রীচরণ ধ্যান করি।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, বৎস! তবে আর আমারও বিলম্ব নাই; কিন্তু দক্ষিণাকে ফেলিয়া যাইতে পারি না। তুমি অদ্য রাত্রে দেবালয়ে সন্ন্যাসী বেশে বাস কর। আগামী কল্য তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে। তত্ত্ববোধ, যে আজ্ঞা বলিয়া, দেবপুরীতে গেলেন। এবং শুনিলেন, দক্ষিণা দাসীর ব্যয়ে খুব ধুমধামে পূজা হইতেছে, অথচ দক্ষিণা বা তার লোক জন, কেহ সেখানে নাই। পরে বিশেষ, অনুসন্ধানে জানিলেন, মহান্ত মহারাজ দেশ বিদেশ হইতে বাছিয়া বাছিয়া লোকজন আনিয়াছেন। গুপ্ত কাননে স্থানে স্থানে দশ বারোটী ক্ষুদ্র পুরী আছে। আহুত লোকেরা পৃথক পৃথক দলে দলে ঐ সমস্ত পুরীতে বাসা লইয়াছে। এক দলের সহিত অন্য দলের সাক্ষাৎ হইবার যো নাই। দক্ষিণা দাসীও এই গুপ্ত কাননে আছেন। মহান্তদেব একখানি নাটক রচনা করিয়াছেন, অদ্য রাত্রে অপ্রকাশ্যভাবে অভিনয়ের প্রথম পরীক্ষা হইবে। শ্রোতৃবর্গ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র থাকিয়া অভিনয় দর্শন করিয়া নিরপেক্ষভাবে মত প্রকাশ করিবেন। পুরীর উত্তর দ্বারে কালান্তক কালের মত প্রহরী বসিয়া আছে, গুপ্তকাননে প্রবেশ করিতে দিতেছে না। সন্ধ্যার পরে সাধারণ জনগণকে বাহির করিয়া দেওয়া হইল, এবং পশ্চিম দক্ষিণ দ্বার রুদ্ধ করিয়া উত্তর দ্বার খুলিয়া দিল। গুপ্ত কাননবাসী নিমন্ত্রিতগণ দলে দলে আসিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসন লইলেন। নাট মন্দিরে রঙ্গস্থল দৃষ্ট হইল। পটমণ্ডপে চিত্রকরেরা বিলক্ষণ নৈপুণ্য দেখাইয়াছে, কিন্তু দর্শকগণ প্রশংসার অবকাশ পাইলেন না। চিত্র দেখিয়া হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। কোথাও মুমূর্ষু রোগীর অন্তর্জ্জলি। স্ত্রী পুত্র ভূমে গড়াগড়ি দিতেছে।

মস্তকে তুলসী-শাখা, নিকটে ক্ষণভঙ্গুর খাট খানি বাতাসে হেলিয়াছে। কিছু দূরে প্রজ্বলিত চিতার উপরে অর্দ্ধ দগ্ধ মানব দেহ। ঈষৎ গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া দর্শকবৃন্দকে সঙ্কেতে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে। আশেপাশে কপাল কঙ্কালের ছড়াছড়ি। শৃগাল কুক্কুর হস্তপদাদি লইয়া ছেঁড়া ছিঁড়ি করিতেছে। মাংসাহারী পক্ষীরা উপরে উড়িতেছে। সেই সঙ্গে যেন মানুষে-

রও আশা ভরসা উড়িয়া যাইতেছে। এমন সময়ে পটখানি ঊর্দ্ধে উঠিল, কিন্তু দর্শকের যন্ত্রণা ঘুচিল না। রঙ্গস্থলে আবার ইহার অপেক্ষা ভয়ানক দৃশ্য। গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রাতপের নিম্নভাগে অগ্নিবর্ণ সিংহাসনে, প্রকাণ্ড কৃষ্ণকায় পুরুষ, হস্তে উজ্জ্বল দণ্ড, মস্তকের মুকুট ভেদ করিয়া জ্যোতির ছটা উঠিতেছে। গম্ভীর বদন, চক্ষু দুটী দেখিলে বোধ হয় যেন, দুইটী স্ফটিক-গহ্বর হইতে সূর্য্যদেব দুই মূর্ত্তিতে বাহির হইতেছেন। কেহবা এরূপ ভাবিল যে, মার্ত্তণ্ড ঠাকুর সুদূর গগণে থাকিয়া, পাপিষ্ঠ মানবকে দগ্ধ করিতে পারেন নাই তাই এখানে আসিয়া প্রতিশোধ লইতেছেন। লোকে দেখিয়াই বুঝিল, ইনিই সেই কালান্তক কাল, যমরাজ। এঁর দক্ষিণে ক্ষীণাঙ্গ বৃদ্ধ মন্ত্রী চিত্রগুপ্ত বসিয়া খাতা উল্‌টাইতেছেন। সম্মুখে কিম্ভূৎ কিমাকার মূর্ত্তিগুলা নানাপ্রকার মুখভঙ্গি করিতেছে, অথচ আজ্ঞা পালনের জন্য যোড় হাতে দাঁড়াইয়া আছে। কিছুদূরে রোগগুলা মূর্ত্তিমান হইয়া নিজ নিজ পরাক্রম দেখাইতেছে। জ্বর বিকারের কৃশ কলেবর, থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছে। ক্ষণে শীত, ক্ষণে গাত্রদাহ, মুহু র্মুহু ভ্রমি, উন্তার নয়নে স্পন্দ-হীন, বিসূচিকার চক্ষু গহ্বরে গিয়াছে, স্থূল দেহ লুটাইতেছে। সর্ব্বাঙ্গ বিবর্ণ, দর্শকবৃন্দ চিত্র পুত-লিকার মত দেখিতেছিল, এমন সময়ে অন্য দিকে করুণ শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল, উঃ কি ভয়ানক ব্যাপার! এদিকে অগ্নি পর্ব্বত ধূ ধূ জ্বলিতেছে। বিকটাকার দূতেরা মানবকে ধরিয়া তাহাতে ফেলিতেছে, পলাইতে দেয় না, মাথায় মুগুর মারে; কিন্তু ইহাতেও মানুষের মরণ হয় না। অন্য দিকে দীর্ঘাকার কৃমিগুলা মানুষের মজ্জায় দাঁত ফুটাইতেছে। দর্শকবৃন্দ ভয়ে চক্ষু মুদিল, কিন্তু ইহাতেও নিস্তার নাই, যমরাজের বজ্রগর্জ্জন-স্বরের বক্তৃতা আরম্ভ হইল।

আঃ! কলির প্রভাবে কি ব্রহ্মাণ্ড মথ্যাবাদী হ'লেন। কি পরিতাপ!

বৃদ্ধ মন্ত্রী বিস্ময় স্বরে বলিলেন, "এরূপ অসম্ভব কথা আপনার মুখে শোভা পায় না।" যম বলিলেন, "তবে কি সেই অনুরোধে সত্য বলিব না।" আর পরমার্থে জলাঞ্জলি দিয়া এই নরক রাজ্যে চিরকাল থাকিব? মন্ত্রী বলিল, "ইহাতো পরম সৌভাগ্যের কথা! এতে এত

বিরক্তি কেন? ধর্ম্মরাজ মহাবিরক্তভাবে বলিলেন, হা অবোধ! রাজ্য ধনকেই কি পরমার্থ বলে। সুখ দুঃখ এবং পাপ পুণ্য সমস্তই এক ধাতুতে গঠিত। পাপে লোহার শৃঙ্খল, আর পুণ্যে না হয় স্বর্ণ-শৃঙ্খল হইল, কিন্তু বন্ধন যন্ত্রণা তো দুইদিকেই সমান। যমত্ব সামান্য কথা আমি ব্রহ্মত্বও চাহি না, কেবল গায়ত্রী সাধন চাই, পাপ পুণ্যের বাহির হইয়া শ্রীহরির চরণ চাই, তাহাই পরমার্থ। আমি সেইজন্যই যমত্বে জলাঞ্জলি দিয়া তপস্যা করিতে গিয়াছিলাম। সৃষ্টিকর্ত্তা আমাকে স্তোক দিয়া ফিরাইয়াছেন। তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি সকল কাজ করিবে, আমি নিশ্চিন্তভাবে হরিচরণ ধ্যান করিব। কিন্তু—তা হইল কই! নাহ'লে সাধে কি পিতামহকে মিথ্যাবাদী বলিলাম। চিত্রগুপ্ত বলিল "দাসের কি কোন প্রকার ত্রুটি হয়েছে?

যম বলিলেন "তোমার কি জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা হয় না? বঙ্গে সতীলক্ষ্মীরা আগ্নেয়গিরির মত সকল যন্ত্রণা হৃদয়ে চাপিয়া রাখিয়াছিল, আজি উহাদের বক্ষ ভেদ হইয়া দশদিকে আগুণ ছুটিতেছে। ত্রিভুবন উত্তপ্ত হয়েছে। উহাদের করুণ-কণ্ঠ স্বর্গ ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠনাথের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। চক্ষু থাকেতো উর্দ্ধদিকে চাহিয়া দেখ।

চিত্রগুপ্ত দেখিল, উচ্চ মঞ্চে দেবতারা বসিয়া আছেন। অন্যদিকে শাস্ত্রকার পরাশর আদি ঋষি, এঁদের মস্তকের উপরে খগপতির পৃষ্ঠে স্বয়ং নারায়ণ ধর্ম্মরাজের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাৎ করিতেছেন।

বৃদ্ধ সভয়ে বলিল, ধর্ম্মরাজ! সতী-দাহতো অনেক কাল উঠিয়া গিয়াছে, তবে আবার সতীর যন্ত্রণা কিসে হয়?

যমরাজ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, সতীর যন্ত্রণা ঘুচাইবার জন্যই সহমৃতার ব্যবস্থাছিল। তুমি ঠিক বিপরীত বুঝিয়াছ, তোমার কাণ্ডজ্ঞান নাই।

এই সময়ে দূতেরা একটা স্থূলোদর বৃদ্ধ কায়স্থকে আনিয়া ফেলিল। ইহার গায়ে হরি নামের ছাপ, নাকে তিলক, এবং মুখে হরিবোল রব ধর্ম্মরাজ ইহাকে নরককুণ্ডে ফেলিতে বলিলেন। দেবর্ষি-নারদ, ভাগবতের অপমান দেখিয়া মঞ্চ হইতে নামিয়া আসিয়া বলিলেন,

কিহে বাপু! তোমার আবার কি পাপ! কায়স্থ বলিল প্রভো! কোন অপরাধ নাই। আমি অসংখ্য পুণ্যকার্য্য করিয়াছি। আদ্যরস আমার কৌলীক-ব্রত। তাহাতে স্বপত্নীর করালগ্রাসে কন্যা দিতে হয়, আমি বালিকা ক্রয় করিয়া জামাতার বিবাহ দিয়া পরে সেই বালিকাকে সাগর-সঙ্গম পথে বৈকুণ্ঠে পাঠাইয়াছি। দেবর্ষি কাণে হাত দিয়া বলিলেন বাপু ক্ষান্ত হও। নির্লজ্জ কায়স্থ বলিল, প্রভো! এ কি কথা শুনিতেছি! আমিতো শাস্ত্রের ব্যবস্থা ছাড়া কোন কাজ করি নাই। এই সময়ে নরকবাসী পাপীরা চীৎকার করিয়া বলিল, "ওরে বাপু! এখানে ছল চাতুরী খাটে না। আমি গৌরীদানের ছলে ষাট বৎসরের বৃদ্ধকে অষ্টম বর্ষের কন্যা দিয়াছিলাম। ইনি কুল রক্ষার ছলে অর্দ্ধজ্বলির পূর্ব্বে সাতটী নারীর সর্ব্বনাশ করেন। উনি তন্ত্র-শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বৈরীপুত্রকে নরবলি দিয়াছিলেন। আমাদের এই দুর্দ্দশা দেখ। আর তোমার জন্য ঐ নূতন নরক প্রস্তুত হচ্ছে। বলিতে বলিতে নারকীরা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিল। কায়স্থ অতি কাতরে, দেবর্ষির পায়ে লুটিতে লাগিল। মঞ্চস্থ শাস্ত্রকারগণ এবং দেবর্ষি দয়ার্দ্র মনে বলিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে পাপিষ্ঠগণ শাস্ত্রের বিপরীত ব্যবস্থা দিয়াছে, তাহারাই প্রকৃত অপরাধী, ইহাদিগকে আমাদিগের অনুরোধে মুক্ত কর। নাহ'লে হরিনামের মহিমা থাকে না। যমরাজ উত্তর দিল, প্রভো! অন্য সকলকে ছাড়িলাম, কিন্তু এই কায়স্থ সম্বন্ধে আমার হাত নাই। স্বয়ং শ্রীহরি উহার প্রতি বিরূপ। সেই মৃত বালিকা ভিন্ন আর কেহই ঠাকুরকে প্রসন্ন করিতে পারিবে না। দেবর্ষি বলিলেন, মৃত্যুর পরে বালিকাতো তোমার নিকটে আসিয়াছে, তাহাকে আনিতে বল। যমরাজ বিনীতভাবে বলিল, দেবর্ষি! আমি কোন কীটানুকীট যে, বালিকার সাক্ষাৎ পাইব, সে যেকালে মধুসূদনকে ডাকিয়া- মৃত্যু ছিল, তিনিই তার সন্ধান জানেন। দেবর্ষি মুহূর্ত্তকালের জন্য অন্তর্দ্ধান হইয়া বালিকাসহ পুন প্রবেশ করিলেন। বালিকার অঙ্গ ছটায় অনেকে চক্ষু মুদিল। বালিকার কৃপায় কায়স্থ কৃতার্থ হইল। দেবর্ষি সহর্ষ মনে রঙ্গস্থল ত্যাগ করিতেছেন, এমন সময়ে আমাদের কুলাঙ্কক রায় সভা

হইতে উঠিয়া, মুনিবরের পাদুটী জড়াইয়া ধরিল, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, দেব ! আমিও যে আহারসের কুহকে বালিকা বধ করিয়াছি, আমার গতি কি হবে !

ঋষি ধর্ম্মরাজের দিকে চাহিলেন ধর্ম্মরাজ বলিলেন, "ঠাকুর ! এ পাপিষ্ঠের নিষ্কৃতি নাই। ইহার পুঞ্জ পুঞ্জ পাপ, এ ব্যক্তি নিজে মজিয়াছে, এবং অন্য-কেও মজাইয়াছে।

দর্শক বৃন্দ এরূপ মুগ্ধ হয়েছে যে, তাদের আর অভিনয়ের কথা মনে নাই। পরকালে আসিয়া যেন এই সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখিতেছে। দুই একজন স্থির বুদ্ধি লোকও ছিল, কিন্তু তাহারা এই কুলাঙ্গককে অভিনেতা ভাবিয়াছিল, ইহাতে কোন গোলযোগ হইল না। কুলাঙ্গক বলিল, ধর্ম্মরাজ ! সংসারে এমন কি পাপ আছে যে, ঋষির করুণায় খণ্ডন হয় না ?

বিশেষতঃ আমার অতি লঘু পাপ। আমি বালিকার পিতাকে অপরিমিত অর্থ দিয়া, তার সম্মতিতে তার কন্যাকে বধ করিয়াছি। দেবর্ষি বলিলেন, "মানুষে কি এমন নিষ্ঠুর আছে যে, ধন লোভে কন্যা বধে সম্মতি দেয়। আঃ ! ইহাদের কোন্ গতি হবে। যমরাজ বলিলেন, দেবর্ষি ! এরূপ পাপী এই কলিকালে নূতন আসিতেছে। ইহাদের জন্য অগ্নি কীট সঙ্কুল নূতন নরকের সৃষ্টি হইতেছে।

"হাঁ, তা উপযুক্তই হয়েছে, এই বলিয়া একটী প্রবীণ সন্ন্যাসী সভা হইতে উঠিয়া বলিল, প্রভো ! আমিই সেই বালিকার চণ্ডাল পিতা। আমি ক্ষমা চাহিতে আসি নাই। অনুতাপে আমার অন্তর দগ্ধ হচ্ছে, বোধ হয় নরকের অগ্নি ইহার চেয়ে শত গুণে শীতল। আমি তাহাতে ডুবিয়া জুড়া-ইতে আসিয়াছি। দেবর্ষি, কি বলিবেন তাই ভাবিতেছেন, এ দিকে একটা বুড়ী উঠিয়া চীৎকার স্বরে বলিল. "তোমরা ছেলে মানুষের কথায় অধর্ম্ম করিও না। এ সেই বালিকার বাপ নয়, ওর বউ তার মা-নয়। আর আমিও এমন ছেলে পেটে ধরি নাই যে, মেয়ে বেচিয়া মদ খাবে। সেই মেয়েটী দক্ষিণার গর্ব্ভে জন্মিয়াছিল। তার নাম ছিল সুমতী, ঐ দক্ষিণাও আমার মেয়ে। আমি কাহারও হইয়া মিথ্যা বলিব না।

সন্ন্যাসী বলিল, মা! এখানে স্বয়ং ধর্ম্মরাজ উপস্থিত। দেবতার নিকটে মিথ্যা চাতুরী খাটে না! সাবধান! পুত্র স্নেহে মজিও না। বুড়ী ঝঙ্কার দিয়া বলিল, এরা যদি সত্য কথা জানিতে না পারে, তবে কিসের দেবতা? বউমার পেটেই তো, পুত্র সন্তান হইয়াছিল।

দেবর্ষি বলিলেন, "তবে বাছা তুমি সেই গণৎকারকে গালি দিয়াছিলে কেন"। বুড়ি সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "হাঁ, তবে তোমরা সত্য সত্য দেবতা বটে, তোমাদের খাতায় ঠিক কথা লেখা আছে। দক্ষিণার পেটে মেয়ে হইলে, অতুল ঐশ্বর্য্য উড়িয়া যায়, তাতেইতো ততকাণ্ড করিয়াছিলাম। অন্ধকারে বউমার ছেলেটী তার কোলে দিলাম, সে নিজেও তা জানিতে পারে নাই। কিন্তু পোড়া বিধাতা যে বাদ সাধিল। সন্তানটী মরিয়া গেল, কন্যাটী কুলাঙ্ককের হাতে প্রাণ দিল, আর আমার ছেলেটীর— নষ্টচন্দ্রের কলঙ্ক হইল।

দক্ষিণা দাসীও এই সভাতে আছে। জননীর মুখে কন্যার জন্মবৃত্তান্ত শুনিয়া নীরবে কাঁদিল। এদিকে কুলাঙ্কক সকল কথা চাপা দিয়া বলিল দেব! বুড়ীর মুখে সকলইতো শুনিলেন। সে বালিকা মধুসূদনকে ডাকে নাই, যবনের হাতে মরিয়াছে, ইহাতে সে অবশ্যই নরকে আছে। সে কখনই আমার প্রতি প্রসন্ন হবে না। তবে আমার কি গতি হবে। দেবর্ষি বলিলেন, "পাপিষ্ঠ! পুণ্যবতী দক্ষিণার গর্ভে কি সামান্য কন্যা জন্ম গ্রহণ করে যে, তুই তার প্রাণবধ করিবি। সে বালিকা রাধাকান্তের বিমল মূর্ত্তি হৃদয়ে লইয়া গঙ্গাবক্ষে পড়িয়াছিল। প্রভু তাহার রক্ষার জন্য মত্ত হস্তী প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন। রাজার হস্তী উচ্ছৃঙ্খল হইয়া জলে সাঁতার দিতেছিল। বালিকাকে শুণ্ডে তুলিয়া তীরে ফেলিয়া দেয়। তখন ঘোর অন্ধকার রজনী, সে সময়েও প্রভুর কিঙ্কর তীরে বসিয়া হরিচরণ চিন্তা করিতেছিল। হস্তীনিক্ষিপ্ত অচৈতন্য বালা ইহারই অঙ্কে পতিত হয়। প্রাণ পাইল কিন্তু তার পূর্ব্বস্মৃতি নষ্ট হইল। ইহাও সেই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা। জলে ডুবিলে প্রায় এইরূপ ঘটে, কিন্তু বালিকার পূর্ব্বস্মৃতি থাকিলে মনোবেদনায় আকুল হইতো। ব্রহ্মচারী উহার জলবালা নাম দিয়া দক্ষিণার হস্তেই সমর্পণ করেন।

ঋষির কথা ফুরাইল না। দক্ষিণা উচ্চরবে কাঁদিয়া উঠিল—হা বাছা! জলবালা! তুমি এই অভাগিনীর গর্ভে জন্মিয়াছিলে বলিয়া কি বিধাতা এত দুঃখ দিলেন। কোন্ চণ্ডাল পুত্র তোমাকে বিবাহ করিয়াছিল—আহা—না-না, তার দোষ কি! যার জননীর হৃদয়ে দয়া নাই—সহোদর চণ্ডালের চেয়ে নিষ্ঠুর, ভাইপো পিশাচ—তার ভাগ্যে কি দয়ালু জামাই হয়! জলবালা আমার পিপাসায় প্রাণ দিয়াছে, স্বপ্নে দেখা দিয়া প্রতিদিন জল চায়, আমি এই জামাতার দেখা পাইলে হাতে ধরিয়া বলিয়া যাই "আমার জলবালাকে এক গণ্ডূষ জল দেও"।

তত্ত্ববোধ আমার আড়ালে দাঁড়াইয়াছিল, প্রকাশ হইয়া বলিল মা! আমিই তোমার চণ্ডাল সন্তান, কিন্তু আমার কোন অপরাধ নাই। আমি সুমতীকে বিবাহ করিয়াছিলাম, কুলাঙ্গক তাহার মুখ দেখিতে দেয় নাই। জলবালাকে কি প্রকারে চিনিবো। তবে তারে জল দিবার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিবো না সে জল চায় না,—সে অনন্তকুলে প্রবেশ করিয়াছে,—সতীত্বে জলাঞ্জলি দিয়াছে।

জীবনধন এই সুযোগে বাহির হইয়া বলিল, তত্ত্ববোধ! "তোমার কি লজ্জা নাই। সতী সাবিত্রী না'হলে কি তার মরা পতি বাঁচে"। লুসাই জঙ্গলের প্রান্তসীমায় তোমার মৃতদেহ শ্মশানচিতায় উঠিয়াছিল। তৎকালে ভগবতী মুণ্ড-মালিনী কি স্বপ্নযোগে তোমাকে বলেন নাই, "নরাধম! তুমি ভাগ্যবশে সুমতীর পতি হয়েছো, দক্ষিণার 'সতী বালা বিধবা হইলে সতীত্বের গৌরব থাকিবে না, কিন্তু তোমাকে বার বার মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতে হবে। সামান্য জ্বরে বিষ বটিকা সেবনে তোমার মৃত্যু হয়, জল ঝড়ে বন্ধু বান্ধব শ্মশান ছাড়িয়া পলায়, কিন্তু তুমি সেই বৃষ্টিতে ভিজিয়া প্রাণ পাইলে। অসভ্য বর্ব্বরের হাতে নরবলি হইতেছিলে, মহাপুরুষ তোমাকে উদ্ধার করিলেন। কিন্তু দেশে আসিয়া দক্ষিণাকে নিঃসন্তান দেখিয়া স্বপ্ন বাক্য বাতিকের প্রলাপ ভাবিলে, কিন্তু এখন তো স্পষ্ট জানিলে যে, সুমতীই জলবালা, তবে আবার কোন্ সাহসে সতী নিন্দা করিতেছো। পৃথিবীর পাপ কাশীতে খণ্ডন হয়, কাশীর পাপে নিষ্কৃতি নাই। সন্ন্যাসী হইয়া পূর্ব্বের পাপ কাটা-

-ইয়াছো এখন সন্ন্যাসী অবস্থার পাপে তোমাকে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না।

স্বপ্ন-বৃত্তান্ত সমস্তই সত্য, তত্ত্ববোধ ইহা গুরুর নিকটেও প্রকাশ করে নাই। কিন্তু আজি জীবনের মুখে সেই কথা শুনিয়া বড়ই বিস্ময় হইল। দেবর্ষি ইহা বুঝিয়া বলিলেন তত্ত্ববোধ! জীবনধন, মহান্তের শিষ্য; যোগীর অগোচর কিছুই নাই। জলবালা এবং গরবিনী প্রকৃত সাধ্বী। ইহারা বিরূপ হইলে তোমার মঙ্গলের আশা নাই। তুমি উদ্দেশে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তুমি তিন দিনের যোগী, সতীত্ব মাহাত্ম্য কি বুঝিবে—কুটিল ভ্রমর চম্পকের মর্ম্ম জানে না, কিন্তু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে কর্ণ-ভূষণ করেন।

তত্ত্ববোধের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। এবং বলিল, প্রভু হে! "ক্ষান্ত হউন। ঐ দেখুন আপনার জলবালার সতীত্ব ছটা নেড়া বাবাজির দাড়ি ভেদ করিয়া সভাস্থল আলো করিতেছে। আর গরবিনী যোগিনী হইয়া জীবনের বক্ষে আসন পাতিয়াছে।

মহান্তের সুব্যবস্থার গুণে এখানে সকলেই উপস্থিত ছিল। সভাস্থ সকলে দেখিল সত্য সত্যই একটা নেড়া বাবাজি, একটী যুবতী নেড়ীকে লইয়া অদূরে বসিয়া আছে।

বাবাজি নেড়ীর হাত ধরিয়া দেবর্ষির সম্মুখে উপস্থিত হইল। নেড়ীর দুই চক্ষে জল ঝরিতেছে। দক্ষিণা দাসীকে দেখিয়া ক্ষুদ্র হস্ত দুটী উর্দ্ধে তুলিয়া তাঁর নিকটে যাইতেছিল, কিন্তু দক্ষিণা তিন হাত পিছাইয়া পড়িলেন। দেবর্ষি, বলিলেন বাছা! তুমি কি পাগলের বাক্যে কন্যা ত্যাগ করিবে তুমি কি চিনিতে পার নাই এ যে, তোমার জলবালা এবং এইই তোমার গর্ত্তজাতা সুমতী। দক্ষিণা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, ঠাকুর! আমার ভাগ্যে সন্তান সুখ নাই কন্যার মৃত শরীরে পেত্নী আশ্রয় করিয়াছে। আমি পেত্নীর মা হইতে পারিবো না।

বাবাজি বলিল, জলবালা! তুমি অগ্রে পতিচরণে প্রণাম না করিলে জননী তোমাকে আদর করিবেন কেন? সতীর পতিই সর্ব্বস্ব। পতি চণ্ডাল হলেও তোমার পূজনীয়।

তত্ত্ববোধ রাগে ফুলিয়া বলিল, পাপিষ্ঠ! আমি কি বৈষ্ণব যে, অসতী আমাকে স্পর্শ করিবে!

বাবাজি আবার বলিল,—কেমন বাছা; এইজন্যই তো বলি যে, পতির মন যোগাইতে শিখিতে হয়। ঘেঁটু ঠাকুরকে গোলাপ ফুল দিলে বিপরীত ফল হয়। আজ যদি গরবিনীর মত রাধারাণী সাজিয়া বসিতে, উনি পায়ের তলে লুটাতেন। লাথি মারিলে পা দুটী বুকে তুলিয়া লইতেন। তত্ত্ববোধ বলিল, ওরে পাপিষ্ঠ! আমি কি গরবিনীকে নরকে বিসর্জ্জন দিই নাই। বাবাজি বলিল, "সাধ করিয়া নয়। তুমিও নটবর ব্রজরাজের মত সন্ন্যাসী সাজিয়া জগদম্বার পুরীতে মান ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলে। কপালে ঘটিল না।

তত্ত্ববোধ ইহাতে লজ্জিত হইল। এদিকে জীবনধন বলিতে লাগিল, "তত্ত্ববোধ! "আমার গুরুদেব, ত্রিকালজ্ঞ সিদ্ধপুরুষ। আমি তাঁর মুখেই শুনিয়াছি, জলবালা কমলার অংশ। তোমার দোষেই উহার এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। জলবালা সতীত্ব রক্ষার জন্য জীবনকে তৃণ জ্ঞান করে নাই—বৈধব্য সন্দেহে চির ব্রহ্মচর্য্য করিতেছে, জননীর অন্বেষণে পথে পথে ফিরিতেছে, ইহাকে যন্ত্রণা দিলে তোমার ইহকাল পরকাল নাই। দেবী মুণ্ডমালিনীর স্বপ্নাদেশ স্মরণ হয় না কি? তত্ত্ববোধ বলিল, "তুমি ঐশ্বর্য্যশালী গুরুর শিষ্য, অর্থে সকল কাজই হয়। অর্থে গরবিনী যোগিনী হয়েছে, কালি আবার জলবালাকে ডাকিনী কর। ভিখারী তত্ত্ববোধের সে ক্ষমতা নাই। বিশেষতঃ জলবালা কমলার অংশ; গৌরাঙ্গ দেব গত-বারে ষড় ভুজ দেখাইয়া ভক্তবৃন্দকে ভুলাইয়া ছিলেন। নব-দুর্ব্বাদল-শ্যামল-ভুজে শর-কোদণ্ড, দলিত-কজ্জল-শ্যামলভুজে মোহন মুরলি, আর গৌর ভুজে দণ্ড কমণ্ডলু। সেবারে কিন্তু আসল কাজ ভুলিয়া ছিলেন, কণ্ঠি বদলের পদ্ধতি বলবৎ করিয়া যান নাই এবারে তাই বাবাজিরূপে অব-তীর্ণ হয়েছেন তাই তোমার কমলাও ওর সঙ্গে মিলিয়াছে।

তত্ত্ববোধের এই কথা সকলের হৃদয়ে বাজিল, কিন্তু বাবাজীর ভ্রূক্ষেপ নাই, সে বলিল, "তত্ত্ববোধ! তুমি কি বৈষ্ণবের শিষ্য নহ কণ্ঠি বদলের মাহাত্ম্য জান না? নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণদের মত নারীকুলকে বৈধব্যতাপে দগ্ধ কর। শ্রীভাগ-

্রতে লেখা আছে, পুরুষমাত্র কৃষ্ণ আর সকল নারীই রাধা। নারী যখন যে পুরুষকে পারে, সেই তার কৃষ্ণ, তারে ছাড়িয়া অন্যকে ধরিলে সেও কৃষ্ণ। কৃষ্ণই পতি। অসংখ্য কৃষ্ণ থাকিতে যে নারী একাকিনী থাকিতে চায় সে কিসের পতিব্রতা। নিরাকারবাদি অবোধ যোগী কি যুগল মিলনের স্বাদ জানে? কণ্ঠির প্রভাবে যুগল মিলন, যুগল মিলনেই চতুর্ব্বর্গ—ব্যভিচারিণী-কুলটা কেহই বঞ্চিত হয় না, কণ্ঠি বদলে বেশ্যাও সতী হয়।

দেবর্ষি নারদ, বাবাজীর এই ঘৃণীত বাক্য শুনিয়া, সভাস্থ সকলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হিন্দু সমাজ কি অধঃপাতে গিয়াছে? সম্মার্জ্জনি-তাড়িত সমাজ-জঞ্জালে, যে জাতির উৎপত্তি, ব্যভিচার যাদের অস্থি, মজ্জা, যারা বেশ্যা বৃত্তিতে বর্দ্ধিত, সেই পাপিষ্ঠ পিশাচ সতীকে উপহাস করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, পবিত্র কুলবালাকে কুলটা করিয়াছে, ভেক দিয়া নেড়ী সাজাইয়াছে, তাহাকে কণ্ঠে গাঁথিয়া, সভামধ্যে দম্ভ করিতেছে, তথাপি কাহারও মুখে কথা নাই? পাপিষ্ঠ কি হিন্দু সমাজকে মন্ত্র-মুগ্ধ করিল? যজ্ঞের হবি কুকুরে চাটিতেছে, পবিত্র তাম্রপাত্র ভূমে গড়াইতেছে, সেদিকে লক্ষ্য নাই, কেবল কুকুরের "ঘেউ ঘেউ" রবে মোহিত হয়েছে। ধিক্ আর্য্য নামে ধিক্।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, সভার অধিকাংশ লোক, নাটক অভিনয় ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু যেক্ষণে বুঝিল, এ সমস্তই প্রকৃত ঘটনা, সেইক্ষণে রাগে অধীর হইল। বাবাজীর উপরে সকলেই খড়্গ-হস্ত, কেহ উহাকে জীয়ন্ত পুতিয়া ফেলিতে চায়, কেহ বলিল, তাহাতে উহার সদ্গতি হবে, বৈষ্ণবের সমাজ দেওয়া পদ্ধতি আছে—জীয়ন্ত মুখাগ্নি করিয়া জলে ভাসাইয়া দিতে হইবে।

শ্বেতাম্বর সাহেব দক্ষিণার অনুগ্রহে গেরুয়া বসন পরিধান করিয়া এখানে উপস্থিত ছিল। পাছে সঙ্গদোষে খুন দায়ে পড়িতে হয়, এই ভাবনা হওয়ার, উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "বাবাজিকে পুলিষে দেও স্বহস্তে দণ্ড দেওয়া বড় কঠিন অপরাধ। এই ক্ষুদ্র বাবাজির জন্য মহান্ত মহারাজ পর্য্যন্ত বিপদে ঠেকিবেন।"

এ অঞ্চলের সকল লোকই মহান্তের শিষ্য, তাঁর প্রতি অচলা ভক্তি। তিনি বিপদে ঠেকিবেন শুনিয়া, ইহারা স্তম্ভিত হইল। সভাতে মহান্ত-

দেবের উচ্চ আসন শূন্য পড়িয়াছিল। সকলে সেইদিকে সতৃষ্ণ-দৃষ্টিপাৎ করিতে লাগিল।

দেবর্ষি. ইহাদের মনের ভাব বুঝিয়া, কৃত্রিম মুনিবেশ পরিত্যাগ করিলেন। এবং বলিলেন, বৎসগণ! এই আমি উপস্থিত আছি। সমগ্র হিন্দু সন্তান ঐক্য থাকিলে সাতটা বাবাজি বধেও ভয় নাই। পুলিষ ইহার কোন সন্ধানই পাইবে না। কিন্তু আইনের বিধি উল্লঙ্ঘন করা মহাপাতক। শাস্ত্রের দ্বিতীয় নাম আইন। ইহকালে আইনমতে অতি অল্প শাস্তিই হয়। সে অতি সামান্য কথা, কিন্তু আইন পরকালে মহা উপকার করে। আইন মানিয়া চলিলে যম যন্ত্রণা হয় না।

লোকে বুঝিল মহান্ত দেব স্বয়ং দেবর্ষি সাজিয়া অভিনয় চলে উপদেশ দিতেছিলেন। মনুষ্যের উপকারের জন্য তাঁর অকরণীয় কিছুই নাই। সকলে ভক্তিভাবে প্রণাম করিল। একজন উষ্ণ-শোণিত যুবক বলিল গুরুদেব! ঐ দেখুন, দক্ষিণার দুই চক্ষে শত ধারা, জলবালা নিজে পাগলিনীর মত ধূলায় লুটাচ্ছে উহার প্রাণ আছে কি না সন্দেহ। তত্ত্ববোধ উহাকে তুলিতে গিয়াছিল, কিন্তু স্পর্শ করিল না। চক্ষু মুছিতে মুছিতে ফিরিল। এখানকার সকলেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে। ইহাতো প্রাণে সহ্য হয় না। ফাঁশি কাষ্ঠে প্রাণ দিতে হয় তাহাও স্বীকার, তথাপি ইহার পাপ-দেহ ক্ষত বিক্ষত না করিয়া ছাড়িতে পারিবো না।

বাবাজি অগ্রে আসিয়া বলিল, "আমার জন্য কাহারও প্রাণদণ্ড দিতে হইবে না। জলবালার দুর্গতি দেখিয়া আমার বাঁচিতে ইচ্ছা নাই। তুষানলে দগ্ধ হইতেও প্রস্তুত আছি। নেড়ানেড়ীর কপট ধর্ম্মে আমার দারুণ ঘৃণা হয়েছে। কেবল আমার একমাত্র এই ভিক্ষা যে, মহান্ত মহাপ্রভু আমার কর্ণে মহামন্ত্র দিয়া কৃতার্থ করুন। উনি ব্রহ্মচারীরূপে তত্ত্ববোধকে দীক্ষা দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন, তার অপেক্ষা আমি বেশী পাপী নহি। তত্ত্ববোধ জলবালাকে ডুবাইবার মূল।

তত্ত্ববোধ মহান্তকে দেখিয়া ব্রহ্মচারী বলিয়া চিনিয়াছিল। কিন্তু দারুণ অভিমানে ডুবিয়া নীরবে অশ্রুমার্জনা করিতেছে। সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষা দেন নাই, বিজন বাস হয় নাই, সে সকল ভাব এখন গিয়াছে, কেবল জলবালার জন্য

প্রাণ জলিয়া উঠিতেছে। ব্রহ্মচারী ঠাকুর উহার পরিচয় গোপন রাখায় এই সর্ব্বনাশ হইল, ইহাই তত্ত্ববোধের দৃঢ় বিশ্বাস। তত্ত্ববোধ সেই খেদে বাবাজির দিকে ফিরিয়া বলিল। "তত্ত্ববোধের প্রতি গুরুর কৃপা হয় নাই, কৃপা হইলে, তত্ত্ব বোধের দুকুল যাইত না। ধূর্ত্ত শঠ নাগরে গুরুদেব কৃপা করেননা। তোর মত মহাধূর্ত্ত পৃথিবীতে নাই, কাজেই তোর ভাগ্য সুপ্রসন্ন। তত্ত্ববোধ, এতকাল পাছে পাছে ফিরিতেছে. বার বার মাথা মুড়াইয়া কান পাতিয়া দিয়াছে, তথাপি উনি মন্ত্র দেননাই, আর তোর বেলায় মস্তক মুণ্ডনের অপেক্ষা মাত্র!

বাবাজি, বলিল, "এ-কেমন কথা! মস্তক মুণ্ডন কেন? আমি তা পারিবোনা। এই বেশেই দীক্ষিত হইবো।

তত্ত্ববোধ বলিল, "তাহলে মন্ত্রে কোন ফল হইবেনা। এই কপট বেশ দেখিবামাত্র যমরাজ নরক কুণ্ডে ফেলিয়া দিবেন, বিচারের গৌণ সহিবে না।

বাবাজি বলিল,কাশীধামে যাইয়া অনশনে মরিবো যমালয়ে যাইব কেন?

এইকথায় সকলে হাসিল। যুবকেরা এইবারে সাংঘাতিক আক্রমণে উদ্যত হইল। বিষম বেগতিক বুঝিয়া, মহান্তরাজ বলিলেন, "তত্ত্ববোধ, পাপিষ্ঠের মাথা মুড়াইয়া পুরী হইতে বাহির করিয়া দেও। বাপার পবিত্র পুরি ইহার রক্তে কলঙ্কিত নাহয়। যুবকেরা বুঝিল, মহান্তদেব বাহিরের কার্য্য শেষ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। তত্ত্ববোধের ক্ষুর আনিতে গৌণ সহিল না। দৃঢ় মুষ্টিতে বাবাজির দাড়ি ধরিয়া টান দিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! দাড়ি গোঁফ সহিত মাথার লম্বা চুল উঠিয়া আসিয়া তত্ত্ববোধের হাতে ঝুলিতে লাগিল। বহির্ব্বাস খসিয়া পড়িল। বাবাজীর নারী মূর্ত্তি প্রকাশ হইল। মস্তকে বিনোদ কবরি, বক্ষে কাঁচলি ঢাকা উচ্চকুচযুগ, এবং মনোহর রূপলাবণ্য। তত্ত্ববোধ চিনিল. এযুবতী ভুলুঠাকুরের কন্যা।

সভাস্থ জনগণ আশ্চর্য্য হইয়া মহান্তদেবের মুখপানে চাহিয়া রহিল। তত্ত্ববোধ লজ্জায় অধোবদন হইল। দক্ষিণা নিকটে আসিয়া গদ গদ বাক্যে বলিল. গুরুদেব! আপনাকে জীবন্ত শূলপাণি বলিলেও আমার পূর্ণ তৃপ্তি হয়না। দেব দেব কোন্ কালে আপনার মত উপযাচক হইয়া এরূপে লোকের উপকার করিয়াছেন। আপনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া ব্রহ্ম-

চারী বেশে অসীম কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। আমি অবোধ স্ত্রী জাতি, আপনার মাহাত্ম্য কি বুঝি তবে বিধিলিপি খণ্ডন হয়না বলিয়াই, আমি সর্ব্ব-সুখে বঞ্চিত হইলাম। আমার ইহকালের আশা ভরসা গিয়াছে, এক্ষণে পরকালের উপায় বিধান করুন। আর খাঁদুর স্ত্রীকে আপনার পাদপদ্মে সমর্পণ করিলাম। খাঁদুকেও আনিয়াছি, ইহাদের ইহকাল পরকালের জন্য আমার আহার নিদ্রা নাই।

মহান্তদেব গম্ভীর স্বরে বলিলেন, পুণ্যবতি! দেব শূলপাণি তোমার সকল দিক রক্ষা করিবেন। আমি কেবল কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছি। পদ্মরাগ-মণির আকরে কাচ ঝিনুক হয় না, তোমার পবিত্র গর্ভসম্ভূত, সতী-কৌস্তুভ জলবালা বিপদ সাগরে ডুবিয়াছিল, আজি সে নারায়ণের কণ্ঠভূষণ হইল। জলবালার হাত ধরিয়া তত্ত্ববোধের হস্তে দিয়া বলিলেন, বাছা! সতীর পতিই নারায়ণ। অতি অল্প দিন হইল ব্রহ্মণ্যদেবের আখ্যান সকলেই শুনিয়া থাকিবেন। আমার সম্মতিতেই সে কাজ হইয়াছে। সম্প্রতি যে ভীষণ কাল উপস্থিত, ইহাতে খুঁটি নাটি ধরিতে গেলে হিন্দু সমাজ অধঃপাতে যায়। সমাজে কতকগুলি কপট গোঁড়া সর্ব্বনাশের উপক্রম করিয়াছে। ইহারা সমাজক্ষেত্রে শামা ঘাসের চারাগুলি রাখিয়া, শস্য-সম্ভাবিত ধান্যের অঙ্কুর দূরে ফেলিয়া দিতেছে। উভয়ের দল কাণ্ড এবং পত্র শিশুকালে প্রায় অভিন্নভাব। তাই বলিয়া ইহাকে সুকৃষক বলা যায় না। ইহাতে যেন কেহ এরূপ না বুঝেন যে, আমি ম্লেচ্ছাচারে উৎসাহ দিতেছি। অখাদ্য ভোজন, সুরাপান এবং যবনী গমনে হিন্দুত্বের লোপ হয়। ইহাতে কিছুই সংশয় নাই, তবে ব্রহ্মণ্যদেবের ন্যায় আচার রক্ষা করিলেও তো চলে। ভবিষ্যতে সেইরূপ বিধি ব্যবস্থা করিলে সকল দিক রক্ষা পায়। তবে যে নরাধমের অখাদ্যে লোভ আছে, সে কখন এই দেশ ছাড়িয়া থাকে? খাঁদুর পত্নী স্বামী সেবা করুক। সংপ্রতি রজনী শেষ হইল, ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তকাল উপস্থিত। আমি গঙ্গাতীরে চলিলাম। অন্য অন্য বিষয় অতি সামান্য প্রাতঃকালে সভা আহ্বান করিয়া সকল বিষয়ের মীমাংসা করিব।

সম্পূর্ণ।